পূর্ব্বাপর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
নিকুঞ্জ পত্রী
২০৬, কর্ণওঅলিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া : ১৩৬২

প্রচ্ছদপট :
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম সাড়ে চার টাকা

মুদ্রাকর :
বৃন্দাবনচন্দ্র নাগ
বঙ্গশ্রী প্রেস
১২।২, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাইণ্ডার্স :
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

ব্লক নির্মাণ :
রঞ্জিত প্রসেস্ এণ্ড প্রিণ্টিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ্

বাবাকে—

এই গ্রন্থের সব কিছুই কাল্পনিক

এই লেখকের বই :

তন্দ্রাতুরা ৪॥৹

শমনীর ভ্রূকুটী ২৸৹

পূর্ব্বাপর

…যেন, পঞ্চাশের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে।

তারপর—

বাঙলার সেই বিষবৃক্ষের মূল বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, যথাক্রমে, বাঙলা থেকে বিহারে, লাহোরে, পেশোয়ারে—সারা ভারতে—

লৌহযানের চক্র-গর্জ্জনের তালে তালে আলোড়িত হয় সত্যব্রতর স্মৃতি! সমপদী-বিসমপদীর বিভিন্ন ছন্দে রূপায়িত হয় তার মনের ভাব: তারপর—তারপর—

সাড়ম্বরে সম্পাদিত হয় মাতৃহত্যার যজ্ঞ—পাকিস্থানের ভিত্তিতে!

সত্যব্রতর ভাব-প্রবণ মন অনাগতকে কল্পনা করতে চায় অতীতের ভিত্তিতে! চোখের সাম্‌নে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তার ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্মৃতি! কয়েকটা বছরের বিচিত্র ইতিহাস! তার মতো অসংখ্য মূর্খের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করার সকরুণ স্মৃতি!

কিন্তু আজ?

সে স্মৃতির সাগর মন্থিত ক'রে প্রকট হয়ে ওঠে শুধু নিকষ-কালো অন্ধকার!

পূর্ব্বাপর

বহু দুঃখ পেয়ে, বহুকাল পরে বাড়ী ফিরছিল সে। কিন্তু মনে তার শান্তি ছিল না এতটুকুও। গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের এই মুহূর্ত্তগুলোকে নিয়ে, বন্দী-জীবনের এক-ঘেয়েমীর মধ্যে সে কতভাবেই না কল্পনার জাল বুনতো! স্বপ্ন দেখতো এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের! অথচ শেষ পর্য্যন্ত সেই বহু বাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ যদিও বা এল—দেখা দিল এক অভূতপূর্ব্ব সমস্যার রূপ ধরে!

সমস্যা—

এটা হত্যাযজ্ঞ না আত্মাহুতি!

সত্যই অদ্ভুত সমস্যা! পুরুষাকারের নিরঙ্কুশ প্রকাশকে নিছক নিয়তির অভিশাপ বলে মেনে নিতে পারাটা অদ্ভুত বৈকি! অহিংসা ধর্ম্মের মহান মন্ত্রে দীক্ষিত, স্বাধীনতাকামী বিরাট এই ভারতীয় সৈন্যের দল, অকস্মাৎ একদিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে পাইকারী ভাবে প্রাণদান করল, নগণ্য একদল গুণ্ডা প্রতিবেশীর হাতে! এই ঘটনাটাকে নিছক নিয়তির লীলাখেলা ছাড়া অন্য কিছু মনে করবার বিপদ আছে বৈকি! তাইতো এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির উদ্ভব! না হলে, প্রমানিত হয়ে যায়—

অহিংসা ধর্ম্মের মহান্ মন্ত্রের কল্যাণে শেষ পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছে একটা ছিঁচ-কাঁদুনে ভীরু জাত। এদের শৌর্য্যবীর্য্যের বিক্রমটা দেহে নয়—নিতান্তই জিভে!—ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক রকমের বেয়াড়া সত্য। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে ভারতীয়দের পক্ষে পুরুষাকারের চিন্তা করাটা শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ! তাইতো, মহান্ এই বিরাট জাতিকে কলঙ্কের কবল থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অহিংসা-ধর্ম্মী নেতৃবৃন্দ! তাইতো সেদিনকার সংবাদপত্রগুলোর সুর বদলে গিয়েছিল—মাত্র দিন

দশ-পনেরোর হেরফেরে। বিশুদ্ধ রাজনীতির নিগূঢ়তত্ত্বের সাহায্যে তাইতো বহির্বিশ্ব আজ জানতে পেরেছে—

মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষা-সংগ্রাম ঘোষণাটা নিতান্তই একটা....চাল। ও ছেলেমানুষী চালে কংগ্রেস ঘাবড়ায় না!

আর—পাইকারী হত্যার ব্যাপারটা?

ওটা তাদের নিয়তি! সত্যব্রতর মনে পড়ে, বহরমপুর জেলের বন্দী, একটি অকালবৃদ্ধ অতিখ্যাত দেশ সেবকের মন্তব্য! আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যব্রতকে তিনি বলেছিলেন: নিয়তি কেন বাধ্যতে! দুর্ঘটনা কোথায় আর না ঘটে!

কিন্তু তাই বলে, কংগ্রেসের মতো একটা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান তো আর বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে লড়ে, অ-ধর্ম্ম করতে পারে না! তার কাছে সবাই সমান। তবে—দুর্গতদের চোখের জল? সে সব তো মোছাবার ব্যবস্থা হয়েছে!

হঠাৎ সান্টিং-এর মাথায় একটা ধাক্কা খেয়ে ট্রেণটা গতিবেগ সংবরণ করল। সত্যব্রতও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল শীকারপুর ষ্টেশন সন্নিকট। কিন্তু—

প্ল্যাটফরমের ওপর অত জনতা কিসের?

ত্রিবর্ণ, অর্দ্ধচন্দ্র, কাস্তে-হাতুড়ী প্রভৃতি অনেক রকমের পতাকা আন্দোলিত করে জনতা যেন কাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। সত্যব্রত মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিত হলো; তারপরই, একটা অতি-আকাঙ্ক্ষিত চিত্র যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। সামান্য একটা পোষ্টকার্ড মারফৎ সে তার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের খবরটা

পাঠিয়েছিল বাড়ীতে। এ সব কি সেই চিঠির ফল!....কিন্তু এ যে তার আশারও অতীত! এরা এত ভালবাসে তাকে!....অসম্ভব নয়। সে যে একদিন এ অঞ্চলের নেতা ছিল—একদিন এদেরই জন্যে লড়তে গিয়ে সে যে নাজীমুদ্দীন গবর্ণমেণ্টের বিষ নজরে পড়েছিল—বিনা বিচারে আটক-বন্দী ছিল সুদীর্ঘ চার বৎসর কাল—সে ইতিহাস তো এখনও খুব বেশী পুরোণ হয়ে যায় নি!

গাড়ী এসে প্ল্যাট্‌ফরমে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে জনতা চীৎকার করে উঠল—হিন্দু-মুস্‌লীম ভাই-ভাই—

—দুনিয়ার মজদুর, এক হোক—

—লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ।

—ক্যাপিট্যালিষ্ট-রাজ, মুর্দ্দাবাদ।

—শীকারপুর শান্তি-সম্মেলন, জিন্দাবাদ।

—কম্‌রেড সেন কি, জয়।

—ওই যে, প্রভাতী সেন!—পাশের দর্শকদের মন্তব্যও সত্যব্রতর কানে আসতে লাগল: উঃ কী সুন্দর দেখেছিস! সত্যিই যেন প্রভাতী!

—তেমনি spiritedও....স্বামীটাকে দূর করে দিয়েছে!

সত্যব্রত গাড়ী থেকে নামল। জনতা তার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল একটা প্রথম শ্রেনীর কামরা লক্ষ্য করে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একটি যুবক, যেন ছিট্‌কে এসে সত্যব্রতর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আপনি? যুবক হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করল।

—রমানাথ যে—

—কবে খালাশ পেলেন?

পূর্ব্বাপর

—আমার কথা পরে হবে ; কিন্তু তোমাদের ব্যাপার কী? কেউ আসছেন নাকি ?

—আপনি জানেন না ? রমানাথ ব্যস্ত হয়ে বলল : কম্‌রেড প্রভাতী সেন যে এলেন এই গাড়ীতে,—শান্তি-সম্মেলনে preside করবার জন্যে !

—প্রভাতী সেন ? মানে, বাদল সেনের বোন ?

—এক মিনিট্‌—রমানাথের আর দেরি করবার উপায় ছিল না ; সে ছুটে গিয়ে দলে ভিড়ল।

সত্যব্রত তখন আস্তে আস্তে ওভার-ব্রীজের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু প্রভাতীর ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল তাকে। এ সেই প্রভাতীই তো? অসম্ভব নয়। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে যে ভাবে সে পার্টি-পলিটিক্‌স নিয়ে মেতে উঠেছিল, তাতে নেশাটা তার পেশায় দাঁড়িয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু, তখন তো সে কম্‌রেড-ধর্ম্মী ছিল না! তবে? ব্যাপারটা ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্য সে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে রইল।

নীচের জনতা ইতিমধ্যে রাজোচিত অভ্যর্থনার সঙ্গে প্রভাতীকে নামিয়ে নিয়েছিল! অতঃপর মাল্যদান প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলো সমাধা করতে সময় লাগল আরও মিনিট পনেরো। তারপর আরম্ভ হলো শোভাযাত্রা! সত্যব্রতও নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রীদের সঙ্গে নীচে নামতে আরম্ভ করল। এ সেই প্রভাতীই বটে!

কিন্তু প্রভাতীর কথা ভাববার অবসর পেল না সে। শোভাযাত্রীর জনতা থেকে চোখ ফেরাতেই আর একটা জনতার প্রতি দৃষ্টি পড়ল তার। ব্যাপার কী? এ অঞ্চলে আবার নতুন করে আরম্ভ হলো নাকি····সংগ্রাম!

পূর্ব্বাপর

প্ল্যাট্‌ফরমের সর্ব্বত্রই ছড়িয়েছিল একদল রাইফেলধারী অবাঙ্গালী সৈনিক। প্রত্যাগত যাত্রীদল এগিয়ে চলেছিল তাদেরই ব্যূহভেদ করে, কিন্তু দৃষ্টি যেন তাদের সামনের দিকে নয়। আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা যেন লক্ষ্য করছিল, আশে-পাশে, পিছন দিকে।

সহযাত্রীদের এ সন্ত্রাসের তাৎপর্য্য সত্যব্রতব অজানা নয়। এদের এই উৎকণ্ঠা নিছক জনশ্রুতির ভিত্তিতেই জেগে ওঠেনি, স্মৃতির দংশনও আছে যথেষ্ট। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এদের অনেকের অনুভূতিকেহ করেছে সূক্ষ্মতর। তাই, এরা যেন আর গুপ্তঘাতকের অকস্মাৎ আবির্ভাব আশঙ্কায় আশঙ্কিত নয়—উৎকণ্ঠিত আত্মদানের বিলম্বের জন্যই। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য যুগধর্ম্ম এদেরকে আজ এই জীবন যাত্রাকেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়েছে। বেঁচে থাকার এই অসহ্য বিড়ম্বনা—অপঘাত মৃত্যুর এই অতি স্বাভাবিক পবিবেশ। তবে—

এই জীবন-যাত্রার স্বপক্ষে যুক্তিও আছে। অপঘাত মৃত্যুকে এত সহজভাবে গ্রহণ করবার সংস্কার বাঙ্গালী হঠাৎ একদিনেই অর্জ্জন করেনি। এর পেছনে ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসটাই সান্ত্বনা। রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে পড়ে দিশেহারা বাঙ্গালী, মাত্র পাঁচ-ছ' বছর পূর্ব্বেও একবার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এ জাতির ভরসা সেই পঞ্চাশ সনের ইতিহাস।

ভরসা—মানুষের মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলী দেওয়ার ইতিহাস শুধু দুঃখের স্মৃতিই জাগিয়ে তোলে না, কিঞ্চিৎ আশার বানীও শোনায়। অবশ্য—এ আশার স্বপক্ষে যুক্তি কিছু নেই, আছে বিশ্বাস,—আছে আলো-আঁধারীর দার্শনিক সংস্কার। কিন্তু সংস্কার হলেই যে সেটা কুসংস্কার

হবে, তারই বা প্রমান কী? পরাক্রান্তের উত্থান-পতন তথা ঐতিহাসিক প্রবেশ-প্রস্থানের প্রমাণগুলো তো আর কারুর দার্শনিক-বিলাস নয়! —কিন্তু ছিয়াত্তর যাকে পথ দেখিয়েছিল সু-প্রতিষ্ঠায়,—পঞ্চাশ সত্যই কি তাকে পথ-দেখবার সু-পরামর্শ দিয়েছে!

—একি, সত্যব্রত না?—টিকিট ঘরের সামনে কয়েকজন সঙ্গী পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সত্যব্রতকে দেখতে পেয়েই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: তুমি···হঠাৎ···কোত্থেকে?

সত্যব্রত থমকে দাঁড়াল। দেখল—প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং রায়বাহাদুর হৃদয়-গোপাল মজুমদার,—তাদের জমিদারীর ইজারাদার। পাশে দাঁড়িয়ে কন্যা করুণা!

—দেশের ছেলে দেশে ফিরছি, এর মধ্যে হঠাৎ তো কিছু নেই! —চেষ্টা সত্ত্বেও সত্যব্রতর মুখের হাসিটা ভাল ফুটলনা! দুর্ভাগ্য তার, —দেশের মাটিতে পা দিয়েই প্রথমে অভ্যর্থিত হলো সে এমনই একজন লোকের দ্বারা যিনি রায়বাহাদুর হয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে শের-এ বঙ্গালের খিদ্‌মেদ্ খেটে; ক্রোড়পতি হয়েছিলেন গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে নাজীমুদ্দিনের নেক্-নজরে পড়ে।

—বলো কী হে?—কন্যা ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেও পিতা কিন্তু সত্যব্রতর অভদ্রতায় বিচলিত হলেন না। পূর্ব্বের মতো হাসিমুখেই বললেন: শীকারপুরের গৌরব তুমি,—এতদিন জেল খেটে এলে···আর·· কিন্তু আসবার পূর্ব্বে সত্যিই একটা খবর পাঠানো উচিত ছিল তোমার।

—তাহলে কী করতেন ?—এতক্ষণে সত্যব্রত হাসল।

—কী করতাম ? ওহে, তোমরা সব শোন সতুর কথা···সঙ্গীদের উদ্দেশে দরাজ গলায় হেসে উঠে হৃদয়গোপাল বললেন: না হে, আমরা অত অকৃতজ্ঞ নই! যাক্, তোমার আর সব খবর কী বলো ?

—খবর...আপাততঃ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম! আচ্ছা, আবার দেখা হবে!—সত্যব্রত প্রস্থানোদ্যত হলো।

—আহা, যাচ্ছো কোথায়, দাঁড়াও না! সত্যব্রতকে নিরস্ত করে হৃদয়গোপাল হুঙ্কার ছাড়লেন: ওহে প্রবীর—বিকাশ—

সদ্য-আগত দাঙ্গা-দুর্গতরা বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়ে প্ল্যাটফরমের ওপর বিরাট জনতার সৃষ্টি করেছিল; হৃদয়গোপালের ডাক শুনে, ভিড়ের মধ্যে থেকে দুটি যুবক এগিয়ে এল।

—তুই ?—প্রবীর যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়াল।

—তুমি, সতুদা ?—বিকাশও অবাক হয়ে গেল।

হৃদয়গোপাল হেসে বললেন: সতুকে আমরা অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেলাম না,—সেজন্যে ওর শাস্তি হওয়া উচিত। তোমরা কী বলো ?

—নিশ্চয়ই! বিকাশ অনুযোগ করে বলল: সত্যি, কী রকম লোক বলো তো তুমি,—আসবার আগে একটা খবরও দিতে নেই ?

এই সময়ে একটি সুবেশা বয়স্থা-মহিলাকে আসতে দেখা গেল। হৃদয়গোপাল তাড়াতাড়ি বললেন: কী খবর নীলিমা দেবী ?

নীলিমা বলল: আপনি একবার ওয়েটিংরুমে চলুন—গোটা দুয়েক মেয়েকে সন্দেহ হচ্ছে—

—তাই নাকি ?—স-কন্যা হৃদয়গোপাল ভিড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। নীলিমা ও বিকাশ সঙ্গে গেল !

—তোর ব্যাপার কী বলতো ? প্রবীরের অভিভূত ভাবটা ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছিল : বলল : আজ যে আসবি, সে খবর বাড়ীতে জানাস নি কেন ?

সত্যব্রত আশ্চর্য্য হয়ে বলল : কেন, দিন চারেক পূর্ব্বে আমি চিঠি দিয়েছি বাড়ীতে,—আজ পৌঁছব জানিয়ে !

প্রবীর ঘাড় নেড়ে বলল : দিন পনেরোর মধ্যে তোর কোন চিঠি কেউ পায়নি !

—অসম্ভব।

—কিছুই অসম্ভব নয় ! যা রামরাজত্ব চলছে এখানে—

—তা বটে ! সেদিন কাগজে দেখলাম—

—চুলোয় যাক্ ওসব কথা।—তুই হঠাৎ এই অবেলায় কোত্থেকে এলি ? ঢাকা মেল তো আসে ভোর পাঁচটায় ?

সত্যব্রত বলল : সকালেই এসেছি ! এখানকার ডেপুটী হাই-কমিশনারের অফিসে গোটাকতক ফরম্যালিটি ছিল—তাই সারতে বেলা বারোটা বেজে গেল।

—পা সেরেছে ?

—সেরেছে বলেই তো ছেড়ে দিলে। তবে,—সত্যব্রত মুখ বিকৃত করে বলল : একে পাকিস্থানী হাঁসপাতাল, তার ওপর সদ্য পাশ-করা মুসলমান ডাক্তার—কিছুই বিশ্বাস নেই। কিন্তু তোরা এখানে করছিস কী ? কমরেড্ প্রভাতীকে রিসিভ্ করতে এসেছিলি নাকি ?

প্রবীর একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল : প্রভাতীর কমরেডত্ব প্রাপ্তির কথা, —তুই এর মধ্যে জানলি কী করে ?

—শুধু কম্রেডত্বই নয়—সত্যব্রত মুচকে হেসে বলল : ইতিমধ্যে তার যে একজন স্বামী জুটেছিল এবং সেই স্বামীটাকেও সে যে আবার দূর করে দিয়েছে, তাও জেনে ফেলেছি।

—ও: বাবা!—প্রবীর হাসল। বলল : আর কিছু জানতে পারিস নি ?

—হ্যাঁ। প্রভাতীর গুণমুগ্ধদের কিছু কিছু পরিচয়ও ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি। জানতে বাকি আছে কেবল—তোরাও শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভিড়েছিস কি না!

—না ভাই—কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মুখভঙ্গী করে প্রবীর বলল : আমরা হচ্ছি দৈনিক কাগজের নিরেট সাব-এডিটর। নিটোল মেয়ে-মানুষ দেখলে হয়তো একটু-আধটু চাঞ্চল্য আজও জাগে, কিন্তু নিছক কম্রেডত্ব নিয়ে প্রণয় করবার মতো পুলক আর প্রাণে জাগে না। ওসব উচ্ছ্বাস, আমাদের চাকরী জীবনের মাস তিনেকের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল। আমরা কম্রেডদেরও জানি কংগ্রেসীদেরকেও চিনি।

আলোচনাটা আর এগোতে পেল না, হঠাৎ ঢং ঢং করে ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়ল। শুনে, প্রবীর চঞ্চল হয়ে দু'পা এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেছিয়ে এসে বলল : মোক্ষম সময়ে এসে পড়েছিস তুই—ফিরে এসে সব বলবো'খন!

—কোথাও যাচ্ছিস নাকি তুই ? সাহেব সেজেছিস কেন ?

—হাঁসফল না পরলে, ঢুকতে দেবে না যে! যাচ্ছি, দিল্লী! পণ্ডিত জবাহরলালের প্রেস কন্‌ফারেন্সে—

পূর্ব্বাপর

—একি, আপনি এখনও এখানে?—হঠাৎ করুণা এগিয়ে এসে বলল: ওদিকে ট্রেন এসে পড়ল যে—

—এই যে—বলেই প্রবীর প্রস্থান করল।

সত্যব্রত হেঁকে জিজ্ঞাসা করল: ফিরবি কবে?

উত্তর দিল করুণা: হপ্তাখানেক পরে। চলুন, আপনার ব্যবস্থার ভার আমার ওপর পড়েছে!

দুই

করুণাকে দেখে আজ যেন তার নতুন বলে মনে হচ্ছিল। অবশ্য, সত্যব্রতর বাল্যসঙ্গিনী সে। কিন্তু হঠাৎ একটা বিবাহের প্রস্তাব ওঠার ফলে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ সুবিধাটা তাদের একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে শুনেছিল—কারবারী পিতার সঙ্গে কোলকাতা-বাসিনী হওয়ার ফলে, করুণা বদলে গেছে! কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের রূপটা যে কী, তা সে জানবার সুযোগ পায়নি। কোলকাতায় গিয়ে হৃদয়গোপাল কন্যার শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কিশোরী করুণা শিক্ষিতা তরুণী হয়ে কী পরিমাণ বদলে গেছে,—ইচ্ছে থাকলেও সে কথা জানবার সুযোগ সে পায়নি। হয়তো, পথ চলতি অবস্থায় দু'চারবার তাকে দেখবার সুযোগও সে পেয়েছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত!—সেই বিবাহ-প্রস্তাবের গণ্ডগোলের জন্য, উভয়পক্ষের কেউই বাক্যালাপে সাহসী হয়নি।—পূর্ব্ব-ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি যেন তাদের জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল! কিন্তু আজকের পরিস্থিতিটা তাকে যেন হঠাৎ সচকিত করে তুলল!

আকর্ষণের কারণটা কিন্তু করুণার দেহ-সংক্রান্ত কোন কিছু ছিল না!—গায়ের রঙ কতখানি ফ্যাকাসে হলে বাঙালীর মেয়েকে সুন্দরী বলা যেতে পারে বা কী পরিমাণ মেম-সাহেবীয়ানা রপ্ত করলে তবে তাদেরকে শিক্ষিতার পর্য্যায়ে ফেলা উচিত—করুণাকে দেখে, এ ধরণের কোনরকম কথাই আজ সত্যব্রতর মনে এলনা! স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা দীক্ষার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গিয়ে, যেটা সত্যব্রতর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিল, সেটা

হচ্ছে করুণার চোখের দৃষ্টি! কী রাজনীতি ক্ষেত্রে—কী সামাজিক সম্মেলনে, অসংখ্য শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ-সুবিধা তার ঘটেছে। তাদের অধিকাংশেরই চোখের দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করেছে হয় অল্প শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী উগ্রতা—নয় দেউলে-জীবনের ধার-করা জৌলুষ। অথচ, জীবন-যাপনের দিক দিয়ে তাদের সমগোত্রীয়া হওয়া সত্ত্বেও করুণাকে আজ যেন তার দল ছাড়া, গোত্র ছাড়া বলে মনে হলো! আজও যেন এ সেই ছোটবেলাকার করুণাই আছে। ছোটবেলার মতো আজও এর চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ—সরল—হাস্যোজ্জ্বল—

—কী ভাবছেন? চলুন—করুণা তাগাদা দিল!

এতক্ষণে সত্যব্রতর মনে মেঘ দেখা দিল!—করুণা বদলে গিয়েছে বৈকি, নাহলে, এমন নির্ব্বিকারভাবে তাকে আপনি বলে সম্বোধন করতে পারলে! কিংবা—

সত্যব্রতর সন্দেহ হলো—দীর্ঘ অদর্শন-জনিত কোন কিছু রহস্যময় ব্যাপার নয়তো! করুণা আবার যে রকম অভিমানী মেয়ে—বিদ্‌ঘুটে রকমের কিছু করে ফেলাটা বিচিত্র নয় তার পক্ষে!—বয়সে বাড়লে কী হবে—ছোটবেলাকার স্বভাব কি শিক্ষার পালিস দিয়ে মুছে ফেলা যায়? —মনে মনে সান্ত্বনালাভ করে সত্যব্রত বলল: ভরসা পাচ্ছি না যে।

—সে কি! কেন—করুণা সত্যই বিস্মিত হয়!

চোখে-মুখে একটা কৃত্রিম ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে সত্যব্রত বলল: তুমি আমার ব্যবস্থা করবে শুনে!

—তার মানে?

—আমাদের জেল-শাস্ত্রে ওই "ব্যবস্থা" কথাটার অর্থ বড় মারাত্মক ছিল!

করুণা প্রথমটা বিমূঢ় ভাবে চেয়ে রইল; তারপরই রহস্যটা বুঝতে পেরে হেসে উঠলো। বলল: উঃ আপনি তো খুব বীর পুরুষ! এত ভয় আপনার?···আমাদেরকেও?

আশ্চর্য্য! হাসলে করুণার গালে ভারি সুন্দর একটা টোল পড়ে। কই—এটা তো কখনও সে লক্ষ্য করেনি! আগে কি ছিল না? মুগ্ধ বিস্ময়ে সত্যব্রত বলল: সেই জন্যেই তো বেশী ভয়! শাস্ত্রে বলেছে নারী স্বয়ং শক্তিরূপিনী! শক্তির পরিচয়টা যদি একটু বেশী মাত্রায় দিয়ে ফেল!

সত্যব্রতর কথার ভঙ্গিতে করুণা এবার আরও জোরে হেসে উঠল। বলল: আচ্ছা মাভৈঃ, মারব না আপনাকে, ভাল ছেলের মতো চলুন তো!

—তোমার ওপর তাহলে···ভরসা রাখতে পারি?

করুণার আর জবাব পাওয়া গেল না। তখন, তাকে হঠাৎ নীরব দেখে সত্যব্রত আশ্চয্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। দেখল, মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেছে—সে চেয়ে আছে অদূরে—প্রশান্ত মুকুজ্জের দিকে তাকিয়ে!

প্রশান্তও আশ্চর্য্য হয়ে চেয়েছিল! সত্যব্রতকে দেখে নয়; তার আসবার খবর সে ইতিপূর্ব্বেই রমানাথের কাছে পেয়েছিল। প্রশান্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল করুণাব হাসি শুনে। হৃদয়গোপালের অফিসে চাকরী হবার পর থেকে করুণাকে সে ঘনিষ্ঠ ভাবেই দেখবার সুযোগ পাচ্ছে; কিন্তু হাসি তো দূরের কথা, মেয়েটা কখন তার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বলে নি। আর আজ—প্রশান্তর উর্ব্বর মস্তিষ্ক তৎপর হয়ে ওঠে —সত্যব্রতকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্য-প্রেম জেগে উঠল নাকি? খেলোয়াড় মেয়ে বলতে হবে! খবরটা দীপক চৌধুরীকে জানিয়ে দিলে

কেমন হয়? ছোকরা নিশ্চিন্ত মনে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়ছে; কিন্তু বাগদত্তাটি যে এদিকে ভরাডুবির···

—আরে কমরেড প্রশান্ত যে? পিছন থেকে বিকাশের আওয়াজ এল: আপনি এখানে?

প্রশান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করল। তার শত্রুর সংখ্যা অসংখ্য; তার মধ্যে সব চাইতে বড় শত্রু বোধহয় হৃদয়গোপালের এই ভাগ্নেটা! লোকটা তার গাম্ভীর্য্যের ধার ধারে না; ব্যক্তিত্বের মূল্য দেয় না; পরন্তু তাকে দেখলেই এমন একটা ভাব করে যেন, সে একটা কিস্যু নয়।

—আপনার তো এখন লরী চড়ে ঘুরে বেড়াবার কথা! বিকাশ এগিয়ে এসে বলল: আপনি এখানে? ব্যাপার কী?

—ব্যাপার আবার কী! ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রশান্ত বলল: প্যাক্টের মর্য্যাদা রক্ষা করতে এসেছি!

—প্যাক্ট? করুণার দিকে এগোতে এগোতে বিকাশ বলল: সে আবার কী? খুলেই বলুন না মশাই—

—ন্যাকামী করেন কেন! —প্রশান্ত বিরক্ত হ'য়ে বলল: আপনি জানেন না, আপনার মামার সঙ্গে আমার প্যাক্ট হয়েছে: আমি তাঁর রিলিফের কাজে Co-operate করবো আর তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, যাতে আমার শ্রমিক-সঙ্ঘের শান্তি-সম্মেলন successful হয়।

—ওঃ বাবা, Pact between Stalin and Truman! এঁকে চেনেন তো? বিকাশ ইঙ্গিতে সত্যব্রতকে দেখিয়ে দিল!

—না। প্রশান্ত বেশ সহজ ভাবে বলল: কে বলুন তো? খুব known face বলে মনে হচ্ছে!

—হচ্ছে নাকি? বিকাশ হেসে উঠল। তারপর করুণার উদ্দেশে বলল: একটা টাকা দে, কাগজ ফুরিয়ে গেছে!

করুণা তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে টাকা বার করে দিল।

—সতুদা, কাল থেকেই কিন্তু ঘাড়ে জোয়াল চাপবে! আজকের দিনটা প্রাণখুলে বিশ্রাম করে নাও!—বিকাশ প্রস্থানোদ্যত হয়ে বলল: এই করুণা, সতুদাকে পৌঁছে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু—এখানে গাড়ীর দরকার হতে পারে!

বিকাশ চলে গেল; কিন্তু মুস্কিলে পড়ল প্রশান্ত! করুণা মুখ বেঁকিয়ে আছে; বিকাশ পাত্তা দিলনা; সত্যব্রতরও চোখ মুখের অবস্থা এমন যে এখন উপযাচক হয়ে কথা কইলে আত্মসম্মান বজায় থাকবে কি না সন্দেহ! অথচ--

মিনিট খানেক বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকবার পর হঠাৎ তার মাথায় একটা মৎলব এল!—যেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছে এমনি একটা ভঙ্গি করে বলল: সতুদা..........

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে গেল: I see; আপনি সতুদা! উঃ এতদিন আপনি ছিলেন কোথায়? আপনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন তো ফরটি-সিক্স-এর পনরই আগষ্ট—আর আজ ফরটি-সেভেন-এর তেসরা সেপ্টেম্বর! এতদিন ছিলেন কোথায় বলুন তো!

সত্যব্রত কথা কইলনা। কিন্তু প্রশান্তও থামলনা। বলে চলল: উঃ এই এক বছর ধরে কত কথাই যে শুনছি আপনার সম্বন্ধে। কেউ বলে, আপনাকে ঢাকা জেলে আটকে রেখেছে Anti Pakistan Propaganda করার জন্যে! কেউ বলে তা নয়, আপনি সেখানে পা৷

ভেঙ্গে পড়ে আছেন! আবার কেউ বলে, আপনি নাকি স্রেফ খুন হয়ে গেছেন ফরটি-সিক্স-এর রায়টে! আসলে ব্যাপারটা কী বলুন তো?—উৎকণ্ঠিত আত্মীয়র মতো প্রশান্ত ঘেঁসে দাঁড়াল।

সত্যব্রত এবারও কোন কথা কইল না। ফলে, প্রশান্ত অপ্রস্তুত ভাবে তাকাল করুণার দিকে। করুণার মুখের ভাব পূর্ব্ববৎ; শেষে তার মুখ রক্ষা করল বিকাশ। এক দিস্তে কাগজ হাতে করে সে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছিল, প্রশান্তকে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল: কী, চিনতে পারলেন নাকি ভদ্রলোকটিকে?

—By jove বিকাশবাবু—প্রশান্ত যেন অকূলে কূল পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: সতুদাকে যখন পাওয়া গেছে, তখন, ভাবছি,—আমাদের আজকের মীটিংএ ওঁকে চিফ গেষ্ট করলে কেমন হয়···?

—সে সব পরে হবে'খন; আপাততঃ ওঁকে বাড়ী যেতে দিন!···· ওঁর বিশ্রাম দরকার, ট্রেন-জার্ণি করে এসেছেন। আপনি বরং co-operate করবেন চলুন আমাদের সঙ্গে।

—Exactly! আচ্ছা, সতুদা, এখন চলি···অনেক কাজ!

—করুণা, তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু!—প্রশান্তকে নিয়ে বিকাশ চলে গেল!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে করুণাও সঙ্গে সঙ্গে বলল: চলুন এবার!

—ছোঁড়াটার ব্যাপার কি বলতো? সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল: পাগল হয়ে গেছে নাকি?

—পাগল নয় বদমাইস!—করুণা মন্তব্য করল!

—কী সব মীটিং ফিটিং-এর কথা বলল যেন—

—ও একটা দল গড়েছে—শীকারপুর শ্রমিক-সঙ্ঘ। এই দাঙ্গার অজুহাতে, শান্তি-সম্মেলন করে, নাম কিনতে চায় আর কি!

—শ্রমিক-সঙ্ঘ? কম্যুনিষ্ট নাকি?

—কম্যুনিষ্ট তো বটেই; কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির শত্রু ওরা।

—সেটা কী রকম হলো?

—এখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বার ভাঙ্গিয়েই নতুন দল গড়েছে ও!

—দল ভাঙ্গবার কারণ?

—কম্যুনিষ্টরা বোমা, পিস্তল য়্যাসিড-বাল্ব নিয়ে মাতামাতি করে ইদানীং বড্ড বদনাম কিনে ফেলেছিল যে! ও সেই সুযোগটা নিলে। দল ভেঙ্গে নতুন দল গড়ে প্রচার করে দিলে: শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্য-পদ্ধতি একেবারে অহিংস!

—বাঃ, বুদ্ধি আছে তো!

—হ্যাঁ, ও সব বুদ্ধি খুব আছে!—করুণা হঠাৎ যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বলল: কিন্তু, সত্যি, চলুন শীগগীর, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার!

—তোমার আবার কি কাজ?

—বাঃ মেয়েদেরকে জিগ্যেস্-পড়া করতে হবেনা?—অনেকের সঙ্গেই তো ব্যাটাছেলে নেই! তাছাড়া—করুণা হঠাৎ থেমে গেল!

—ব্যাপার কী বলতো? তোমরা এখানে করছো কী?

—আমরা যে এখানে ছোট-খাট একটা রিলিফ-কেন্দ্র খুলেছি!

—কিন্তু তোমার বাবা?

—উনিই তো রিলিফ্ কমিটির প্রেসিডেণ্ট—আমাদের লীডার।

লীডার!—সত্যব্রতর মাথায় হঠাৎ যেন রক্ত চড়ে গেল। বেয়াল্লিশের কালো-বাজারী সাতচল্লিসের গন-নেতা! মনের ভাব চেপে সে আবার জিজ্ঞাসা করল: তোমাদের রিলিফ্ কমিটির অফিসটা কি এই রেল-ষ্টেশনে নাকি?

—বাঃ তা কেন, অফিস তো আমাদের বাড়ীতে!

—বাড়ীতে মানে? কোলকাতায়?

—আরেঃ তা কেন! আমাদের কোলকাতার বাড়ী তো পুড়ে গেছে দাঙ্গার সময়! আমরা তো এখন এখানেই থাকি। কিন্তু আমার যে বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে! আসুন—আর কথা না বাড়িয়ে করুণা অগ্রসর হলো!

ষ্টেশনের বাইরে হৃদয়গোপালের ড্রাইভার বেবী-অষ্টিন নিয়ে অপেক্ষা করছিল। করুণা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল: আসুন—

করুণার সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত এগিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে মনস্থিরও করে ফেলেছিল। বলল: কোথায় যাব?

—বাড়ী যাবেন না?

—তাই তো যাচ্ছি।

—তবে গাড়ীতে উঠুন?

—গাড়ী করে গেলে—সত্যব্রত একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল: তোমাকেও যে সঙ্গে যেতে হবে।

—তাতে কী হয়েছে?

—থাক্, আমার জন্যে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে…তুমি কাজের মানুষ কাজে যাও!—সত্যব্রত এগোল!

—আহা শুনুন না—

—আর শোনবার কিছু নেই! আমার জন্যে তুমি কেন সময় নষ্ট করবে? কাজে যাও!

—আঃ শুনুন না—বাবা যে বললেন……

—তোমার বাবাকে আমার ধন্যবাদ দিও। সত্যব্রত চলে গেল!

মুহূর্ত্তের ঘনিষ্ঠতা যেন নিমেষে রূপান্তরিত হলো নিদারুণ শত্রুতায়! অতি স্বাভাবিক ভাবেই করুণার মনে পড়ল বছর দশ-বার পূর্ব্বেকার কথা! তখনকার দিনে এমন কাণ্ড দু'বেলা ঘটত! কিন্তু……

চাক্ষুস্ দেখা সাক্ষাৎ না থাকলেও, সত্যব্রত সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসতো তার! সে নাকি পাঁচ জনের একজন হয়েছে! দেশকর্মী হিসাবে সে নাকি অনেকেরই শ্রদ্ধার পাত্র; অনেকেই শুনতে চায় তার কথা! এমন কি—দৈনিক পত্রিকার খবরাখবরের মধ্যেও মাঝে মাঝে নাকি তার নাম থাকে! কিন্তু……

সব বোধহয় বাজে কথা!—করুণা তো আজ নিজেই দেখল: লোকটা শুধু বয়সেই বেড়েছে, নাহলে, ছোটবেলার সব অভ্যাসগুলিই বজায় আছে ষোল আনার ওপর আঠার আনা!—বাবুর আজও কথায় কথায় রাগ… অভিমান!—কে ওর অভিমানের ধার ধারে?—করুণা মুখ কালী করে ফিরে গেল! ওদিকে—

বিরক্তিকর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও, মেয়ের শুখনো মুখের কারণ বুঝতেও বিলম্ব হলো না হৃদয়গোপালের। কিন্তু একটুও আশ্চর্য্য না হয়ে তিনি বললেন: কী হলো? সতু গাড়ী নিলে না?

—তুমি তাহলে জানতে? ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে অনুযোগ করল করুণা: তবে, জেনে-শুনেও কেন আমাকে পাঠালে? একটা অভদ্র…ইয়ে….

—ইয়ে—সঙ্গীদের দিকে একবার আড়-চোখে চেয়ে নিয়েহ হৃদয়-গোপাল বললেন : ও একটু অদ্ভুত বটে ; কিন্তু অভদ্র নয় ! তুমি ভুল করোনা ! কিন্তু···ওহে প্রশান্ত—

—আজ্ঞে ?

—সতু যদি হেঁটে বাড়ী যাবার চেষ্টা করে—হৃদয়গোপালের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। বললেন : তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। হাঙ্গামার জন্যে বাস বন্ধ। সাইকেল রিকসাও চলছে না। সুতরাং সর্ট-কাটে পটো-পাড়া টিকে-পাড়ার ভেতর দিয়েই ও যাবে নিশ্চয়ই !··· বুঝতে পারছো ?

—হু

হৃদয়গোপাল বললেন : সকলেই তো দেখছি কাজে ব্যস্ত !—তা তুমিই না হয় একবার যাও গাড়ীটা নিয়ে।—দেখ যদি বোঝাতে পারো !

—আমি ? প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে বলল : আমাকে যে আবার ওঁর ব্যবস্থা করতে হবে !

—কার ব্যবস্থা ?

—প্রভাতী দেবীর ! মানে···এখন তো উনি আমারই গেষ্ট কি না····

—সে আবার কী ? —বিকাশ বলল : মাস দুয়েক হিল্লী-দিল্লী ঘুরে দেশের মেয়ে আজ দেশে ফিরে এসেছে—আপনার গেষ্ট হলো কী করে ?

প্রশান্ত মিনিট খানেক বিকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর সক্রোধে বলল : প্রভাতী দেবী শীকারপুরের মেয়ে কি না সেটা বড় কথা নয় ! দুনিয়ার মেহন্নতী মানুষের তিনি একজন দরদী বন্ধু। তিনি এখানে

এসেছেন তাদেরই কল্যাণের জন্য!—আপনারা দেশটাকে কী করে তুলেছেন, সেটা তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে।—আর সকলের চাইতে বড় কথা হচ্ছে, তিনি এসেছেন আমারই ডাকে! বুঝেছেন?

—বুঝিছি বৈকি!—বিকাশ ব্যস্ত ছিল; তাই প্রশান্তকে ছেড়ে দিয়ে হৃদয়গোপালকে বলল: সতুদা যে রকম গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, সাবধান না করে দিলে বিপদ ঘটতে পারে। আমি যাব?

হৃদয়গোপাল বললেন: তুই গেলে report লিখবে কে? ওটা এক হাতে থাকাই উচিত।

—যাক্ গে, কারুকে যেতে হবেনা,—আমিই যাচ্ছি!—করুণা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু আর সহ্য করতে পারল না।—সামান্য একটা ব্যাপারকে কত বড় করেই না তুল্তে পারে এই লোকগুলো!—সে অগ্রসর হলো!

—আহা আপনি কেন—প্রশান্ত এবার বিচলিত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বলল: আমিই যাচ্ছি! কিন্তু সতুবাবু কি আমার কথা—I mean—

—তাঁর কথা তিনিই জানেন—করুণা বিরক্ত হয়ে বলল: আপনি আপনার কর্ত্তব্য করে আসুন না!

—তাহলে আপনাদের ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিন!

—আসুন বলে দিচ্ছি!—বিকাশ অগ্রসর হলো।

হৃদয়গোপাল হেঁকে বললেন: সতু গাড়ী নিতে আপত্তি করলে, তাকে টিকেপাড়া আর পটোপাড়া সম্বন্ধে সাবধান করে দিও। বুঝলে—ঘণ্টাখানেক আগেও দু'টো খুন হয়ে গেছে।

পূৰ্ব্বাপর

প্রশান্ত ঘাড় নেড়ে বিকাশের সঙ্গ নিল !

—অর্জ্জুন সিং, এই বাবুকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো তো ! ফিরতে দেরি না হয়···বিকাশ ড্রাইভারকে বলে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। প্রশান্ত গাড়ীতে উঠে বসে হুকুম করল : চলো, নিউ মার্কেট্ ।

তিন

নিউ মার্কেট,—কোলকাতার হগ্‌ মার্কেটের অনুকরণে তৈরি একটা বাজার ; তবে আয়তনে অনেক ছোট। পূর্ব্বে এ অঞ্চলের মিলগুলো যখন ইংরেজদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হতো, সেই সময়ে গড়ে উঠেছিল এই নিউ মার্কেট, উক্ত বিদেশীদের সুবিধার জন্য। বর্ত্তমানে, এই মিল পরিচালকদের মধ্যে শতকরা একজন সাদা চামড়ার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ ; কিন্তু স্বদেশী সাহেবের সংখ্যা বেড়ে গেছে ইংরেজদের তুলনায় অন্ততঃপক্ষে ত্রিশগুণ। ফলে, নিউ মার্কেটের জৌলুষ ক্ষীণ না হয়ে বেড়েই চলেছিল দিনের পর দিন। অবশ্য, পরিবর্ত্তন যে কিছুই হয় নি, তা নয়। বইয়ের দোকানগুলি প্রায় সবই উঠে গিয়েছিল। ফুলের ষ্টলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। কন্‌ফেকসনারদের সাইনবোর্ডগুলো, সবই প্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল—রেস্তঁারায়। অধিকন্তু, অনেক সাইনবোর্ডে আবার রেস্তঁারার সঙ্গে 'বার' কথাটাও যুক্ত হয়েছিল।

এমনই একটা রেস্তঁারা এণ্ড বার-এ এসে ঢুকল প্রশান্ত ঠিক দুপুর বেলায়। নিজের নির্জ্জন কক্ষটিতে বসে মালিক ফ্র্যাম্‌জী সোরাবজী খবরের কাগজ নিয়ে আলস্য উপভোগ করছিলেন, হঠাৎ প্রশান্তকে দেখে বিস্মিত হলেন। বললেন : এই অসময়ে কী মৎলবে ?

—খাবার দিতে পারো কিছু ?

—কাকে খাওয়াবে হে ?

—ছেলেগুলো দুপুর রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—তাই ভাবছি, একটু জলযোগ করিয়ে দি···

—ওহো, তোমার সেই শান্তি-সম্মেলন—মানে—প্রভাতী সেন ? তাকে আর রাস্তার মাঝখানে খাইয়ে কী লাভ ? রাত্তিরে এখানে নিয়ে এসো না !—ভদ্র-মহিলা স্বামী ত্যাগ করেছেন শুনলুম,—এ সব ব্যাপারে নিশ্চয়ই প্রেজুডিস্ নেই !

—আঃ কী বাজে বকছো ? বললাম্ না ছেলেগুলো····

—ওঃ ছেলেগুলো ! দু-চার আনার ঝুড়ি ভাজা খাইয়ে দাও গে যাও না।

—নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না ! প্রশান্ত বিরক্ত হয়ে বলল : স্যাণ্ডুইচ্ তৈরি আছে ?

—নিশ্চয়ই। কত চাই ?

—ডজন ছয়েক হতে পারে ?

—নিশ্চয়ই হতে পারে।

—বেশ, ভাল করে প্যাক্ করে দাও। আর, তোমাদের সেই স্পেশাল চা, থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক ভর্ত্তি করে দিয়ে দিতে বলো।

—ফ্ল্যাস্ক কই ?

—আনিয়ে নাও একটা, তোমার বয়-কে দিয়ে।

—সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে ?

—এক কপর্দ্দকও নয়।

—বেশ বেশ ! সোরাবজী ঘণ্টা বাজিয়ে খিদ্মদ্গারকে ডাকলেন।

—কিন্তু, দেরি হলে চলবে না ! প্রশান্ত ব্যস্তভাবে বলল : আমাদের মীটিং আরম্ভ হবে বেলা পাঁচটায় ;—এখন বাজছে প্রায় দুটো। এর মধ্যে ওদেরকে খাইয়ে আসতে হবে আমাকে।

—ঘাব্ড়াচ্ছো কেন ! খিদ্‌মদ্‌গারকে যথাকর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে সোরাবজী একখানা ভাউচার লিখে ফেললেন। তারপর সেটা প্রশান্তকে দিয়ে বললেন : না'ও, সই করো !

প্রশান্ত সই করে দিল,—একবার পড়েও দেখল না কী লেখা আছে কাগজটাতে। তারপর বলল : সত্যব্রত রায়কে মনে আছে ?

—রাজবাড়ীর বড় সরীক ?

—হ্যাঁ !

—কী হয়েছে তাঁর ? মারা গেছেন নাকি ?

—না, সশরীরে এসে হাজির হয়েছে আজ !

—বল কী হে ! সোরাবজী আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলেন। মিনিট্‌খানেক পরে বললেন : তাহলে তো তোমার পক্ষে বড় বিপদের কথা !

—আরে ছোঃ—প্রশান্ত কাঁধ উঁচিয়ে বলল : ও ব্যাটা আমার কী করবে ?

—ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারে। মনে আছে তো—সুভাষবাবু কংগ্রেস ছাড়বার পর, উনি কী ভাবে ফরোয়ার্ড ব্লক গড়ে তুলেছিলেন এ অঞ্চলে !

—তুমি ভুল করছো ! প্রশান্ত অবজ্ঞাভরে বলে উঠল : দেশের অবস্থা এখন অনেক বদলে গেছে !

—তা হয় তো গেছে ; কিন্তু যাদের নিয়ে তুমি কারবারে নেমেছো, তারা তো আর বদলায় নি ! আজ তুমি তাদের স্যাণ্ডুইচ্ খাওয়াচ্ছো ; কিন্তু, কাল যদি তারা অন্য কারুর কাছে আরও কিছু বেশী পায় !

—তুমি কি বলতে চাও—প্রশান্ত উগ্রস্বরে বলল: ওরা শুধু খাবার লোভে······

—নয়তো কী? —সোরাবজী বেশ নিশ্চিন্তভাবেই মন্তব্য করলেন: ওরা সব দেশ-হিতৈষী? ওই সব দুগ্ধপোষ্য আকাটের দল—পলিটিসিয়ান? তাই বুঝি গতবারের মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সানে রাজকুমারবাবু হেরে মরলেন সিঙাড়া খাইয়ে, আর লোচ্চা দেবনাথ ভৌমিক জিতে গেল কাটুলেট্ বিলিয়ে?

—তুমি ভুল করছো! প্রশান্ত নরম হয়ে বলল: তুমি কি মনে করো, আমার ভরসা শুধু ওই ছোঁড়ার দল? তা নয়। At present আমার strength কতো জান? সতের শ'। ভগীরথ জুট্ মিলটাকে বাগাতে পারলে, হবে তেইশশ'। তা ছাড়া বাস ইউনিয়ানটাকেও বোধ হয় বাগাতে পারবো······

—ও সব তো আরও ভয়ের কথা! ওই অশিক্ষিত কুলী-মজুরগুলো আজ তোমাকে লীডার বানিয়েছে কেন? তোমার মুখ থেকে তারা মনের মতো কথা শুন্‌তে পায় বলেই তো? কিন্তু, তোমার চাইতেও মৎলব-বাজ কেউ যদি ওদেরকে আরও ভাল ভাল আশা ভরসার কথা শোনায়—তাহলে?

—তোমার যত সব বিদ্‌ঘুটে কথা!—প্রশান্ত এবার বিরক্ত হয়ে বলল: মন্দ ছাড়া তুমি আর কিছুই দেখতে পাও না!

—বেয়াড়া ব্যাপারের লক্ষণ দেখলে—বিদ্‌ঘুটে কথাই যে আগে মনে আসে হে! বয়সটা তো আর কম হলো না! —সোরাবজী বেশ একটু চিন্তিত হয়েই বললেন: আমাদের মধ্যে লুকোচুরী তো আর কিছু নেই। সুতরাং সাবধান হওয়া দরকার! তোমাদের দেশের জেনারেল্

ইলেক্‌সান যে কবে হবে, তা খুদায় মালুম। গদ্দী-নশীন সকলেরই তো মৎলব দেখছি ইলেক্‌সান পেছিয়ে দেবার। তারপর ইলেকসানে নামলে, তোমার মতো লোকের অবস্থাটাও যে কী হবে, তাও বেশ বুঝতে পারছি! তোমার ধারণা তুমি বড্ড বেশী বুদ্ধিমান; অথচ কারবারে নেমেছো যত সব পেট-আল্‌গা মাতাল নিয়ে—

—তার মানে? সোরাবজীর কথা-বার্ত্তার মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে প্রশান্ত একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল। বলল: আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!

—পলিটিক্‌স্‌-এর সব চাইতে বড় কথা হ'চ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। —সোরাবজী গম্ভীরভাবে বললেন: কিন্তু আমি তো দেখছি,—কোন মৎলব তোমার মাথায় আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে ছড়িয়ে পড়ে!

—কে ছড়ায়?

—তোমারই চ্যালা-চামুণ্ডারা!

—কী রকম?

—এই তো কাল সন্ধ্যায়, তোমারই এক সাকরেদ, মাত্র এক পেগ্‌ টেনেই বেসামাল হয়ে পড়ল। খালি হো হো করে হাসে আর তোমার মৎলব-বাজীর বাহাদুরী দেয়।

—আমার মৎলব-বাজী? কী রকম?

—তুমি নাকি প্রভাতী সেনকে আনাচ্ছো স্রেফ্‌ নিজের চাক্‌রী বজায় রাখবার জন্যে! অর্থাৎ প্রভাতীকে দিয়ে তুমি হৃদয়গোপালের কারখানায় ধর্ম্মঘট করাবে, অথচ মালিকের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সেজে নিজে থাকবে নিরাপদে!

—কী সর্ব্বনেশে কথা! প্রশান্ত উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল: কে রটাচ্ছে এ সব কথা? কে সে?

—তা আমি বলবো কেন?

—বলবে না? আমাকেও বলবে না?

—তুমি তো জান, এ রকম প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে নেই! আমরা গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স্ দিয়ে বৈধভাবেই ব্যবসা করি—অবৈধ কোন কিছু করি না!

—তার মানে? প্রশান্ত আবার উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল।

—আমার দোকানটা একটা বৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—চুক্লী কাটবার অবৈধ আড্ডা নয়।

—বটে? নিদারুণ উৎকণ্ঠায় প্রশান্ত আত্মবিস্মৃত হ'লো। হঠাৎ বলে বসল: আর শাইলকের ব্যবসাটা?

—তার জন্যেও ট্যাক্স দিয়ে থাকি গবর্ণমেণ্টেকে। সোরাবজী বেশ শান্তভাবেই বললেন: Money Lending Business-এর লাইসেন্স না থাকলে, তোমার বাড়ী বাঁধা রেখে টাকা দিতে ভরসা করতাম না নিশ্চয়ই!

—ওঃ,—প্রশান্তর নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল। তারপর আস্তে আস্তে বলল: তুমি নাম না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি লোকটা কে! এ নিশ্চয়ই সেই রমনদাস হারামজাদা!

—মিষ্টার মুকার্জ্জী! সোরাবজী এবার বেশ উগ্রভাবেই বললেন: আড়ালে বসে, অকারণ একজন ভদ্রলোকের নামে বদনাম দেওয়াটা ভদ্রলোকের পরিচয় নয় নিশ্চয়ই। আমি তোমাকে একজন মাতালের কথাই বলেছি! রমনদাস মদ খায় কি না তুমি জান না?

কথাটা সত্যি। রমনদাস এখানে আসে বটে ; কিন্তু মদ মারতে নয়—মাতালের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে চাটু খেতে।

—এত অল্প বুদ্ধি নিয়ে এ ব্যবসায় নামা তোমার উচিৎ হয় নি। সোরাবজী বললেন : যাক্ গে, তোমার মাল্ তৈরি হয়ে গেছে ; এবার তুমি যেতে পারো।

দোকানের খিদ্‌মদ্‌গার ইতিমধ্যে মালগুলি গাড়ীতে তুলে দিয়েছিল। অগত্যা উঠতে হ'লো প্রশান্তকে। কিন্তু তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল : সোরাবজীর সঙ্গে পরিচয় তার অল্প দিনের নয়। অর্থনৈতিক ব্যাপারে গোটাকতক স্থযোগ-স্থবিধা পাওয়ার ফলে, পরিচয়টা তাদের ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল ; ঘনিষ্ঠতার জন্যই, নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থা সম্বন্ধে অনেক গোপন কথা তাকে বলেছিল প্রশান্ত। আর আজ—সোরাবজী তাকে ধমক দিতে ভরসা করল! অপমান করতে সাহস করল! এত বড় স্পর্দ্ধা এই ব্যাটা ক্যাপিট্যালিষ্ট স্থদখোরটার! আচ্ছা···

—এবার কোন দিকে যাব? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

প্রশান্ত চমকে উঠল। তারপর ধাতস্থ হ'য়ে বলল : ষ্টেশন রোড ধরে পশ্চিম দিকে চল।

প্রশান্ত সোরাবজীর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, আর একটা সমস্যার সমাধান খুঁজতে লাগল। অবশ্য, শোনা কথার ওপর নির্ভর করে উৎকণ্ঠা পোষণ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ ; কিন্তু আজ সে সত্যই উৎকন্ঠিত হয়ে উঠল! সোরাবজী লোকটা সাংঘাতিক রকমের ফিচেল নিঃসন্দেহ ; কিন্তু প্রভাতীকে ডেকে আনার গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকটা যা বলল সেটা তার উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার নয়, নির্জ্জলা সত্য। কিন্তু

কথাটা প্রকাশ পেল কী করে? কে প্রকাশ করতে পারে? রমনদাস? বোধ হয় না! লোকটা স্পষ্টবাদী; প্রশান্তর খুঁত ধরতে পারলে কখনও ছেড়ে কথা কয় না।....হয়তো তাকে প্রশান্তর ব্যক্তিগত শত্রু বলা যেতে পারে। কিন্তু ঘর-শত্রু বিভীষণ বোধহয় সে নয়। এখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বানচাল করে দিয়ে যারা শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল,—তাদের মধ্যে পালের গোদা হচ্ছে, প্রশান্ত নয়,—রমনদাস! আজ অবশ্য চাকা ঘুরে গেছে। পার্টির লীডার বলতে সকলে প্রশান্তর নামই করে থাকে। কিন্তু মনের অগোচরে তো আর পাপ নেই। কিসের জোরে প্রশান্ত আজ শ্রমিক-সঙ্ঘের সর্ব্বে-সর্ব্বা,—সে কথাটা আর সকলে ভুলে গেলেও, সে নিজে তো আর ভুলতে পারে না! দুত্তোর......

আর ভাবতে না পেরে প্রশান্ত স্থির করে ফেলল—পার্টির গত মীটিংএর রেসোলিউসন্ নাকচ্ ক'রে দেবার জন্য আজই আর একটা মীটিং ডাকবে সে। এ মীটিংএর রেসোলিউসন হ'বে ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম-পদ্ধতির বিপক্ষে এবং তাতে সর্ব্বপ্রথম নাম সই থাকবে প্রভাতীর।....কিন্তু এরা গেল কোথায়?

—অর্জ্জুন সিং, একটু আস্তে চালাও তো!

ড্রাইভার হুকুম তামিল করল।

—মশাই বলতে পারেন—পথ-চলতি একটি ভদ্রলোককে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল: প্রসেশানটা এতক্ষণে কতদূর গেছে?

—কিসের প্রসেশান?

—শ্রমিক-সঙ্ঘের শান্তি-সম্মেলনের প্রসেশান!

—শ্রমিক-সঙ্ঘ? সে আবার কবে হ'লো?

কী রকম ভদ্রলোক রে বাবা—শ্রমিক-সঙ্ঘের নাম শোনে নি! প্রশান্ত অন্য লোকের আশায় এগিয়ে চলল।

কিন্তু এও আর এক সমস্যা! প্রায় মাস ছয়েক পূর্ব্বে, স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের ডিক্‌টেটারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই সে, রমনদাস প্রমুখ আরও কয়েকজনের সঙ্গে—পরিত্যাগ করেছিল পুরোন পার্টি, গড়ে তুলেছিল নতুন শ্রমিক সঙ্ঘ। কিন্তু সঙ্ঘের অস্তিত্ব এতদিনকার হওয়া সত্ত্বেও—সারা বাঙলা তো দূরের কথা, নগণ্য শীকারপুরের কাছেও যথোচিত স্বীকৃতি পেল না; আজও এ সহরের প্রৌঢ়-বৃদ্ধরা, বামপন্থী প্রগ্রেসিভ পার্টি বলতে বোঝে কম্যুনিষ্টদের। এমন কি অনেক যুবকও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে: কবে তৈরি হ'লো পার্টি?

কথাটা ভাবলেই একটা অদ্ভুত আক্রোশে বুকের ভেতরটা তার জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে হয়—এদের গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে সচেতন ক'রে দিতে, যাতে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্রও না থাকে। কিন্তু এরা গেল কোথায়?

হঠাৎ চোখে পড়ে একটা ইম্‌পিরিয়্যাল গ্রীল। খোলার চালের তলায় আমকাঠের বেঞ্চিতে বসে কয়েকটি যুবক প্রাণ খুলে আড্ডা জমিয়েছিল; প্রশান্ত গাড়ী থামিয়ে তাদেরই শরণাপন্ন হ'লো।

শুধু উত্তরই মিলল না, স্বীকৃতিও মিলল! শ্রমিক-সঙ্ঘের সর্ব্বেসর্ব্বাকে দেখে যুবকবৃন্দ সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: প্রসেশানটা এতক্ষণে বোধহয় ফিরিঙ্গীবাগান ছাড়িয়ে মনসাতলায় পৌঁছে গেছে!

—ধন্যবাদ! পাঁচটায় মীটিং, আপনারা সব আসছেন তো?

—নিশ্চয়ই!

আরও এগিয়ে চলল প্রশান্ত এবং সত্যিই মনসাতলায় পৌঁছে দেখা মিলল প্রভাতীর!

চার

মনসাতলা জায়গাটা কোলকাতার চীৎপুর চোরবাগান অঞ্চলের মতো একটা ঘিঞ্জি পল্লী ; মাত্র আধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মুসলমান প্রধান পটোপাড়া বস্তি ! দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে, এলাকাটা কোলকাতার কলাবাগানের মতো গুরুত্ব অর্জ্জন করেছিল। শুধু তফাৎ এই যে পটোপাড়াতে কোন মস্‌জিদ্ নেই—আছে, ওলাবিবি শেতলাবিবির মতো গোটাকতক "থান" ; যেখানে, এতাবৎকাল হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে মানৎ মেনে এসেছে। এ ছাড়া জায়গাটার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিও কিছু আছে। ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে জায়গাটা সেই শাহী আমল থেকেই বিখ্যাত। প্রথমে ছিল ডাচ্ পর্ত্তুগীজদের আস্তানা ; তারপর হয় ফরাসীদের রেশম-কুঠী ; অতঃপর আসে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ; অধুনা জায়গাটাকে ছেয়ে ফেলেছে সিন্ধী, শিখ, বেহারী, মাড়োয়ারী, গুজ্‌রাটী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

রাস্তা অত্যন্ত নোংরা ; উপরন্তু দু'পাশের সুউচ্চ বাড়ী গুলোর চাপে যেমনি অন্ধকার তেমনি সংকীর্ণ। বাড়ীগুলো আদিতে সম্ভবতঃ নীচুই ছিল ; উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েছে মালিকজনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমে ক্রমে। সেই জন্য জায়গাটা অপঘাত আশঙ্কায় ভয়াবহও বটে !—এমনি একটা গলির মধ্যে ঢুকেছিল শ্রমিক-সঙ্ঘের লরী !

লরী ছাড়া গত্যন্তর ছিল না শোভাযাত্রীদের। গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রিতে, মহাত্মাজীর বেলেঘাটা শিবির আক্রান্ত হবার পর থেকে,

পূর্ব্বাপর

নবোদ্যমে যে নরমেধযজ্ঞ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল কোলকাতার সর্ব্বত্র, তার কিছুটা জের যথারীতি শীকারপুরে এসেও পৌছেছিল! ফলে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কারফিউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারাও জারী করে দিয়েছিলেন শহরের সর্ব্বত্র। সুতরাং লরী ছাড়া গতি ছিল না প্রশান্তর। তবে, সান্ত্বনা এই যে, এর জন্যে বাড়তি খরচ লাগেনি তার। প্রস্তাব মাত্রেই পেট্রোল সমেত লরী ছেড়ে দিয়ে উপকার করেছিল, মনসাতলা ময়দামিলের মালিক ভগবানদাস আগারওয়াল।

লরীর ওপর দাঁড়িয়েছিল প্রভাতী—যেন স্তূপীকৃত কচুরীর মধ্যে একটিমাত্র স্থলপদ্ম! দিগন্তের প্রখরতা অবলুপ্ত হয়েছিল, ঘন-সন্নিবদ্ধ অট্টালিকাগুলির অস্বাভাবিক উচ্চতার জন্য! পরিবেশের বৈচিত্র্যে, —ব্যাহত সূর্য্যালোককে অস্তরাগের রক্তরশ্মি বলে ভ্রম হচ্ছিল প্রশান্তর! নির্জ্জন গলিপথের মধ্যে স্তিমিত আলোকে অপরূপ দেখাচ্ছিল প্রভাতীর মুখখানি। যেন, সত্যই একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম নিজের আবির্ভাবের কথা বিস্মৃত হ'য়ে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছিল খেয়ালী প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি! দেখে আত্মবিস্মৃত হলো প্রশান্ত! ভুলে গেল সে শ্রমিক-সঙ্ঘের অস্তিত্ব, তার নিজের কর্তব্য-কর্ম্ম; পার্টির প্রতিজ্ঞা পত্রের খসড়া! মেনিফেষ্টোর জটিল জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে যে সত্যটা প্রকটিত হলো তার মনের গহনে, তার সরল অর্থ হচ্ছে:

একে এখানে মানায় না! এর স্থান এখানে নয়! এক ঝাঁক ঝোড়ো কাকের মধ্যে একটিমাত্র কাকাতুয়ার অস্তিত্ব অস্বাভাবিক—অসম্ভব—কল্পনাতীত—

—আরে, আপনি?

পূর্ব্বাপর

লরী-বিহারীরা কল্পনাও করতে পারেনি,—মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রশান্ত আবার এসে হাজির হবে। কিন্তু প্রশান্তর সৌভাগ্য, সেলুন গাড়ীর কাঁচ্ ভেদ্ করে তার প্রতি প্রথম নজর পড়ল প্রভাতীরই। সে-ই প্রথম বলে উঠল : বেশ লোক যা হোক! এদিকে সৈন্য সামন্তরা যুদ্ধ করে করে গলা ভেঙ্গে ফেলল, অথচ, আসল সেনাপতির দেখা নেই!

—আজকালকার যুদ্ধ-জয়ে সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্বটা গৌণ! —গাড়ী থেকে নামতে নামতে প্রশান্ত বলল : প্রতিবেশী শত্রু-মিত্রের সঙ্গে সন্ধি-বিগ্রহ আর চুক্তির প্যাঁচ্ কষাকষিটাই হ'চ্ছে আসল কৃতিত্ব। লক্ষ লক্ষ সেনার বাহুবলের চাইতেও একটি মাত্র মস্তিষ্কের মূল্য ঢের বেশী!

—গান্ধীজীর গীতার মতো আর কি—সোৎসাহে মন্তব্য করল কম্‌রেড্ মণ্টু!

—গীতা নয় রে গাধা!—সস্নেহে সংশোধন করে দিল প্রশান্ত : গীতার কেষ্ট চন্দরের মতো!

—কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলো কম্‌রেড—প্রভাতীর পায়ের কাছে কুঁকড়ে বসেছিল অসুস্থ রমনদাস ; প্রশান্তর উদ্দেশে সে সহাস্যে বলল : আপাততঃ তুমি কোন ভূমিকায় অভিনয় করছো? গীতার শ্রীকৃষ্ণ না মহাভারতের চক্রীর?

—গীতা...আর মহাভারত?—প্রশান্ত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল : ও দুটো কি আলাদা বস্তু নাকি?

—হায় কম্‌রেড্! —রমনদাস রসিকতার চেষ্টা করল : তাও জান না?

—আজ্ঞে না!—প্রশান্ত রসিকতার ধার দিয়েও গেল না; বরং বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলল : আমি অন্তর্যামী নই! আপনার অভাবনায় আবিষ্কারের কথা আমার জানবার কোন প্রয়োজন নেই।

—অকারণ চটছো কেন বন্ধু! —রমনদাস এবার সামলে নিয়ে বলল : আবিষ্কারটা আমার নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই বলে থাকেন : গীতাটা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ।

—যত্তো সব রাবিস্!—প্রশান্ত এবার প্রভাতীর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল : তারপর, আপনাদের খবর কী বলুন! এত রাস্তা থাকতে এই গলির ভেতর ঢুকলেন কেন?

দুই কমরেডের বাক্-যুদ্ধের সময়ে প্রভাতী নীরবে অন্যদিকে তাকিয়েছিল, প্রশান্তর প্রশ্ন শুনে, ভদ্রভাবে একটু হেসে বলল : সাধে আর কি ঢুকেছি—ভগবান ঢুকিয়েছেন।

—ভগবান!

—হ্যাঁ। প্রভাতী বলল : তাঁর মিলের ময়দাগুলো যে কী পরিমাণ বিশুদ্ধ, সেটা আমাদেরকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিতে চান!

—ওঃ ভগবানবাবু।—প্রশান্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল : কিন্তু, আমি যে আপনাদের জন্যে খাবার নিয়ে এলাম সোরাবজীর দোকান থেকে—

—বেশ তো, ও গুলোর ব্যবস্থা মীটিংয়ের পরে হবে'খন। আপাততঃ ভগবানবাবুর আতিথ্যটা গ্রহণ করা যাক্। ডাক্ পড়ল বলে!

—কিন্তু—প্রশান্ত আশা করেছিল, অযাচিত ভাবে খাবার বয়ে নিয়ে আসবার জন্য তাকে, তার নেতাজনোচিত কর্ত্তব্যবোধের জন্য

বিশেষভাবেই অভিনন্দন জানাবে প্রভাতী। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সামান্য একটা ধন্যবাদও যখন মিললনা, তখন সে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল : কী দরকার ও লোকটার obligation নিয়ে? খাবার তো আমি এনেছি--

—বাঃ ওঁর গাড়ী নিতে দোষ হ'লোনা, আর একটু খাবার খেলেই obligation-এ পড়া হ'বে!—প্রভাতী তাচ্ছিল্যভরে বলল।

—সে যাই হোক—প্রশান্ত একটু উগ্রস্বরেই বলে ফেলল : ও ব্যাটা ক্যাপিট্যালিষ্ট-এর নেমন্তন্ন নেওয়া যেতে পারেনা!

—Can't help—প্রভাতীও দৃঢ়স্বরে বলল : It is already accepted.

—By whom?—কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে প্রশান্ত বলল : জানতে পারি কী?

—পারেন, by me—প্রভাতী বিরক্ত হ'য়ে বলল : বাজে কথা যাক্, একটা কাজ করতে পারবেন? রমনদাসবাবুর হঠাৎ জ্বর এসেছে, ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারবেন আপনার গাড়ী করে?

প্রশান্ত কী উত্তর দেবে ভেবে পেলনা।

প্রভাতী বলল : আপনি তো জানেন ওঁর ম্যালেরিয়া আছে। ষ্টেশনে হঠাৎ জ্বর এসে গেছে—পারবেন পৌঁছে দিতে?

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বলল : গাড়ী আমার নয়।

—তা জানি।

—আঃ—প্রভাতীকে বাধা দিয়ে রমনদাস এবার বলল : আপনি কেন এত ব্যস্ত হ'চ্ছেন? আমার কিস্যু হয়নি....

পূর্ব্বাপর

ঠিক এই সময়ে, দেখা দিল ভগবানদাস আগারওয়াল। ভদ্রলোক বয়সে যুবক এবং অত্যন্ত রূপবান। তার ওপর তার অতি বিনীত ভদ্র-ভঙ্গীর মধ্যে এমনই একটা আভিজাত্যের ছাপ প্রচ্ছন্ন ছিল, যা দেখে প্রশান্তর মাথায় রক্ত চড়ে গেল!

—টেবিল তৈরি ভগবান সবিনয়ে অনুরোধ জানাল : আপনারা দয়া করে একবার আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দিন!

প্রস্তাব মাত্রই কম্‌রেডরা সব হৈ হৈ করে লাফিয়ে পড়ল লরী থেকে—শুধু প্রভাতী আর রমনদাস ছাড়া।

—মিঃ আগারওয়াল—প্রভাতী বলল : আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—

—আমার এই বন্ধুটি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন,—এদিকে বাস্, রিক্‌স সবই বন্ধ—

—ওঃ, আমি এক্ষুণি গাড়ী বার করতে বলছি, আপনি সাবধানে নামিয়ে আনুন ওঁকে!

প্রশান্ত ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, আর তার সামনে দিয়ে, অতি সন্তর্পণে প্রভাতী নামিয়ে নিল রমনদাসকে! তারপর, রুগ্ন কম্‌রেডের বাহু ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল ভগবানদাসের অফিস ঘরের দিকে!

—আপনি আসবেন না মিষ্টার মুকার্জ্জী? ভগবান সবিনয়ে দাঁত বের করল!

প্রত্যুত্তরে প্রশান্ত মুচকে হাসল। বলল : আপনারা বড্ড বুদ্ধিমান, নয়?

—বুদ্ধি তো কিছু রাখতেই হয় বাবুজী!—ভগবান এবার বেশ ভাল করেই হাসল। বলল: জানেন-ই তো, বাপ্-ঠাকুর্দ্দারা সব বাঙলায় এসেছিল লোটা-কম্বল সম্বল করে! আচ্ছা নোমোস্কার, আবার দেখা হ'বে।

ভগবানদাস চলে যাবার পরও মিনিটখানেক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল প্রশান্ত। তারপর উঠে বসল গাড়ীতে! দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল সে। ঘুরে-ফিরে কেবল এই কথাই তার মনে হচ্ছিল: এরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে, নাহলে এত সাহস হয়? কিন্তু এর প্রতিবিধান কী......?

খেয়াল হ'লো গাড়ী যখন ষ্টেশনে এসে থামল।—কোন রকম হুকুম না পেয়ে শোফার নিজের বুদ্ধিতে সটান ষ্টেশনেই চলে এসেছিল। অগত্যা প্রশান্তকে নামতেই হ'লো।

—দেখা পেলেন সতুদার?—বিকাশ প্রশ্ন করল!

—এ কি!—প্রশান্তকে দেখে করুণা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল; হঠাৎ থমকে দাঁড়াল! তখন, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আর সকলে দেখল: কাঁধে ষ্ট্র্যাপে বাঁধা থার্ম্মোফ্লাস্ক ঝুলিয়ে এবং দু'হাত ভরে আরও কী সব জিনিষ নিয়ে শোফারও প্রশান্তর পিছন পিছন এসে হাজির হয়েছে।

—এ সব কী? করুণা ভ্রূকুঞ্চিত করল।

—নিয়ে এলাম আপনাদের জন্যে!—প্রশান্তর মুখ শুখিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ঘাবড়ে গেল না। বলল: গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন্...

—কিন্তু জিনিষগুলো কী?

—স্যাণ্ডুইচ! সোরাবজীর ওখান থেকে তৈরী করিয়ে আনলাম! ভাল জিনিষ...

—আপনাকে তো পাঠানো হয়েছিল সতুদার খোঁজে···আর···নিদারুণ বিরক্তিতে করুণার গলা দিয়ে যেন কথা বেরুচ্ছিল না। বলল: আর আপনি এতক্ষণ মদের দোকানে বসে স্যাণ্ডুইচ তৈরি করাচ্ছিলেন?

—যাক্ যাক্—হৃদয়গোপাল সামাল দিয়ে বললেন: সতুর খোঁজ পেয়েছো নাকি প্রশান্ত?

—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন—প্রশান্ত নির্ব্বিকারভাবেই বলল: এতক্ষণে হাঁটাপথে তিনি বাড়ী পৌঁছে গেছেন!

—না—করুণা যেন ধমক দিয়ে উঠল। তারপর পিতার উদ্দেশে বলল: ওই তো তিনি—

দেখা গেল সত্যই সত্যব্রত, আরও অনেকের সঙ্গে ষ্টেশনের দিকেই আসছে!

বস্তুতঃ সত্যব্রতর না এসে উপায় ছিল না! করুণার গাড়ী প্রত্যাখ্যান করে সে ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাস্-এর অপেক্ষায়—আর হাবু-ডুবু খাচ্ছিল সমস্যার সমুদ্রে। তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল হৃদয়গোপালের কন্যাও নয়—তাঁর খদ্দর পরে ভদ্দর সাজবার অভিনবত্বটাও নয়! এ সব তাঁর পূর্ব্বেও ছিল, আজও আছে। কিন্তু লোকটা হঠাৎ প্রকাশ্যভাবে গণ-দেবতার সেবায় লেগে গেল কী উদ্দেশ্যে! বিনা মৎলবে ব্যাগার খাটা তো হৃদয়গোপালের স্বভাব নয়!

মৎলব-বাজ হৃদয়গোপালের কথা ভাবতে ভাবতে সে ক্রমাগত পা বদলাচ্ছিল। কিন্তু বাস্ কই? রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত যতদূর দেখা যায়, সে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল; কিন্তু পথে জনতার অভাব না থাকলেও কোন রকম যাত্রীবাহী যান-বাহনের চিহ্নমাত্রও দেখা

গেল না। ব্যাপার কী? সে চঞ্চল হয়ে উঠল: বিপনে শুঁড়ির বাস সার্ভিস্ ইতিমধ্যে উঠে গেছে নাকি?

ষ্টেশন রোড রাস্তাটা শীকারপুর সহরের প্রধান রাজপথ। মিউনিসিপ্যালিটির কৃপায় কত বছর পূর্ব্বে ম্যাকাডামাইজ্ড হয়েছিল, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন; বর্ত্তমানে দুরবস্থার সীমা নেই! অবশ্য, রাস্তাঘাটের এ অবস্থা সারা দেশব্যাপী! করদাতারা নিয়মিতভাবেই পথ-কর জোগাতে বাধ্য হন। কিন্তু রাস্তা মেরামতীর কথা উঠলেই চেয়ারম্যান-কমিশনার প্রমুখ মিউনিসিপ্যাল-বিধাতাগণ দোহাই পাড়েন মহত্তর যুদ্ধের; গালাগালি দেন মিলিটারী লরীর ড্রাইভারগুলোকে। এবং বলাই বাহুল্য স্বয়ং হৃষিকেশের কৃপায় টাকাটা যে কোথায় যায়, সে প্রশ্ন আর কেউ করে না। তবুও, এই রাস্তার ওপর ভরসা করেই, বিপিন সা একদিন খান-ছয়েক বাস্ নিয়ে সার্ভিস খুলেছিল। সে সার্ভিস অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল বছর না ঘুরতেই। ব্যাপার দেখে শুঁড়ির-পো কারবার ফ্যালাও করেছিল বাস্ ও রুটের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে। তার পুষ্পক-রথ, বায়ুযান-মার্কা বাস্গুলো ক্রমে হাওড়া-রামরাজতলা থেকে শীকারপুর ছাড়িয়ে আরও তিন মাইল দূরবর্ত্তী সেলিমগঞ্জ পর্য্যন্ত রুট বিস্তার করেছিল। কিন্তু—

সামনের প্রকাণ্ড গর্ত্তটার দিকে চেয়ে সত্যব্রত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল: ক্রমাগত গাড়ী নষ্ট হওয়ার ভয়ে বিপিন সা সার্ভিস বন্ধ করে দেয়নি তো! সঠিক খবরটা জানবার আশায় সে একবার এদিক-ওদিক তাকাল! রাস্তায় রিফিউজীর সংখ্যাই বেশী। অপরিচিত আগন্তুকদের তদ্বিরকারী হিসাবে যাও বা দু-চারজন স্বেচ্ছাসেবকের দেখা মিলছিল—পরিচিত হলেও, তারা

বোধহয় তাদের লীডারদের সন্তুষ্টির জন্য গলদঘর্ম্ম !—তাদের কাউকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্তি হলোনা তার ! একদিন যারা তাকে বিদায় দিয়েছিল সসম্মানে, আজ তাদের কাছে রবাহুতের মতো আত্মপ্রকাশ করবে সে কোন লজ্জায় ?

বিগতদিনের ঘটনাগুলো আবার যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে তার চোখের সামনে। পুলিশের হেফাজতে যে দিন সে দেশত্যাগ করেছিল, এরা হরতাল করেছিল সেদিন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিল এরা মিছিল করে, তাকে জানিয়েছিল সশ্রদ্ধ বিদায়-অভিনন্দন। আর আজ ?

সেদিনকার সেই অভিনন্দনের কথা ভুলতে পারেনি বলেই তো আজ তার এই লজ্জা। ষ্টেশন-প্লাটফরমে জনতার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আজও তার মনে পড়ে গিয়েছিল অতীতের সেই স্মরণীয় দিনটির কথাই—, শুধু ভাবতে পারেনি, দেশের লোক ইতিমধ্যে এমন কিছু একটা চটকদার ব্যাপারের সন্ধান পেয়ে গেছে যার তুলনায়, নগন্য রাজবন্দীদের অভ্যর্থনা করার প্রথাটা নিতান্তই পুরান !

—হিন্দু-মুসলীম ভাই ভাই—

—লাল ঝাণ্ডা কী—

—মজদুর-রাজ কায়েম হোক—

—কম্যুনিষ্ট-পার্টি মুর্দ্দাবাদ্—

—শ্রমিক-সঙ্ঘ জিন্দাবাদ—

সত্যব্রত আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দেখল—প্রোসেশানিষ্টদের নিয়ে একটা লরী পূর্ব্বদিক থেকে গুম্‌টি পার হয়ে পশ্চিমদিকে চলেছে !

দেখেই সে তাড়াতাড়ি উল্টোদিকে অগ্রসর হলো। লরী-বিহারীদের অধিকাংশই তার পরিচিত। এমন কি ওদের নেত্রী কম্‌রেড প্রভাতীটি পর্য্যন্ত!—তাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যদি ওদের পূর্ব্ব-প্রীতি উথ্‌লে ওঠে! হঠাৎ যদি জিজ্ঞাসা করে বসে: সতুদা যে,—হঠাৎ এখানে?—হঠাৎ প্রশ্নের আশঙ্কায় সত্যব্রত আরও তাড়াতাড়ি পা চালাল।

বাস্‌-ষ্ট্যাণ্ডের অপরদিকে ছিল একটা ছ্যাক্‌রা গাড়ীর আড্ডা; কিন্তু সেখানে গাড়ী ছিল মাত্র একটি। সত্যব্রত সটান সেই গাড়ীটাতেই উঠে বসল আত্মগোপনের জন্য।

—আরে—রে—ক্যা?—গাড়ীর গাড়োয়ান অদূরে একটা পান-ওয়ালীর পাশে উবুড় হয়ে বসে গল্প করছিল। সেইখান থেকেই হেঁকে বলল: ক্যা?

সত্যব্রত কথা কইতে ভরসা করল না কারণ, জনতার সন্ধান পেয়ে লরীর গতি মন্থর হয়ে গিয়েছিল।

—ওঃ ইসে···সত্যব্রত মুহূর্ত্তের জন্য লরী-বিহারী প্রভাতীর দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ "ইসে" শুনে ফিরে দেখল, গাড়ীর অপর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি বৃদ্ধ—সঙ্গে একটি বয়স্থা মেয়ে!

—কী করা যায়! সাইকেল রিক্‌সাও নেই, গাড়ীও আর পাওয়া যাবে না—বৃদ্ধ সঙ্গিনীর উদ্দেশে বললেন; কথায় তাঁর পূর্ব্ববঙ্গীয় টান্‌।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে সত্যব্রতর দেরি হ'লো না। জিজ্ঞাসা করল: কোথায় যাবেন আপনারা।

—যাবো একটু দূরেই, মনসাতলায়। কিন্তু...

—কিন্তু হবার দরকার নেই, আপনারা উঠে বসুন। অবশ্য, আপনার সঙ্গিনী'র যদি আপত্তি না থাকে—

—নাঃ আপত্তি কিসের! শেয়ার গাড়ী হ'লে তো আমাদেরই সুবিধে! ভদ্রলোক আর কথা না বাড়িয়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

—আরে-রে ক্যা মাঙ্গতা? —ব্যাপার দেখে গাড়োয়ানটা আবার চীৎকার করে উঠল; কিন্তু পানওয়ালীর সঙ্গ ত্যাগ করল না। অগত্যা সত্যব্রত তাকে হাত নেড়ে ডাকল। প্রত্যুত্তরে গাড়োয়ানটাও তাকে ডাকল হাত নেড়ে। দেখে, সত্যব্রত একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল: এদের এ স্পর্দ্ধা হ'লো কবে থেকে?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গাড়োয়ানটাকেই এগিয়ে আসতে হ'লো। পচ্ করে পিক্ ফেলে প্রশ্ন করল সে হিন্দীতে: যাবে কোথায়?

প্রশ্নের ভঙ্গী দেখে সত্যব্রতর চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠল। কিন্তু তার কথা কইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ বললেন: মনসাতলায়—

—ভাড়া পড়বে পাঁচ টাকা!

—পাঁচ টাকা? একটু কম্-সম্ করো বাবা—

—নেহি তো উতার যাও। সোয়ারী হামি লিবো না—

হঠাৎ সত্যব্রত গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। মনের অবস্থা তখন তার কল্পনাতীত। বহুকাল দেশ ছাড়া হ'লেও তার স্মরণ ছিল—ষ্টেশন থেকে মনসাতলার গাড়ী ভাড়া যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল আট আনা; বোমার হিড়িকে হ'য়েছিল দেড় টাকা থেকে দু'টাকা। আর আজ দেশ স্বাধীন হ'তেই··

পূর্ব্বাপর

—সোয়ারী তুমি নেবে না—কেমন ? সত্যব্রত বলল।

—নেহি।

—ষ্ট্যাণ্ডে তাহলে গাড়ী রেখেছ কেন ?

—হামার খোশী !

—বটে ? আচ্ছা, আ'ার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবে চলো দেখি ! বলেই গাড়োয়ানের হাত থেকে ছিপ্‌টিটা কেড়ে নিল সত্যব্রত।

—ক্যা বলিস ? গাড়োয়ানটাও রুখে দাঁড়াল।

—ও মশাই—ব্যাপার দেখে বৃদ্ধ ভড়কে গিয়েছিলেন, বললেন : কোথায় নিয়ে যাবেন ওকে ?

—আপাততঃ থানায় !

—অ্যাঁ !—চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন পথচারী এগিয়ে এসেছিল ; তাদের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ যেন আরও মুষ্‌ড়ে পড়লেন। বললেন : থানায় ?—কেন মশাই ?

—ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, দেশে এখনও মজদুর-রাজ কায়েম হয়নি।

—কিন্তু, আমাদের যে বড্ড দরকার।

—ওই পাঁচ টাকাই দেবেন নাকি আপনি ?—সত্যব্রত যেন অবাক হ'য়ে গেল।

—তা আর কী করা যাবে ! বাস্ বন্ধ, রিক্সাও বন্ধ, অন্য গাড়ীও দেখতে পাচ্ছি না, হেঁটে যাওয়াও বিপদ্‌........

সত্যব্রত আর কথা কইল না ! চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সে উল্টোমুখে হাঁটতে আরম্ভ করল। রাগ করবে সে কার ওপর !

ওজুহাতটা সেখানে আত্মপ্রকাশ করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মুখোশ পরে, সেখানে মৌখিক যুক্তি আর কতটুকু কল্যাণ আনতে পারে! ভদ্রলোক বাস্তুত্যাগী! আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ত্যাগ করে এসেছেন সাত-পুরুষের ভিটে! আত্মরক্ষার জন্যই যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে এসেছেন জলের দামে! আর, বর্ত্তমানে সেই প্রয়োজনীয় মূলধনেরই মূলোচ্ছেদ করছেন অনুরূপ আর একটা প্রয়োজনের তাগিদে!

অভিশপ্ত আশাবাদীর দল! ভবিষ্যতের আশায় এরা শুধু অতীতকেই ভুলতে চায় না; বাস্তবিক সত্যকেও এড়িয়ে চলতে চায় সুযোগ সুবিধার মাপকাঠিতে—যুক্তি-তর্কের গোঁজামিল দিয়ে। নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে এরাই সব চাইতে বেশী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত অহিংস সংগ্রামের। কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারের সম্মুখীন হবার প্রশ্ন উঠলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে সংজ্ঞা বিশ্লেষণে: অহিংসা কথাটার আসল অর্থ কী?

তারপর রসগ্রাহী রসনা ব্যবসায়ীদের অহিংস আস্ফালন রূপান্তরিত হয় নিদারুণ আর্ত্তনাদে;—তাঁদের অহিংস সংজ্ঞা বিশ্লেষণের ব্যাঞ্জন যখন বক্তৃতার বীর্য্যে উত্তপ্ত হ'য়ে শৌর্য্যের বাষ্পে বিলীন হ'য়ে যাবার উপক্রম করে, তখন হাড়-ভাঙ্গা শীত অগ্রাহ্য ক'রে বৃদ্ধ মহাত্মাজীকেই আবার ছুটতে হয় নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

অপরাধ তাঁর, দুরাশা—দুর্ব্বুদ্ধি।

পার্টি নয়, পলিটিকস্ নয়, হিন্দু নয়, মুসলমান নয়—তাঁর অপরাধ মানুষকে ভালবাসতে যাওয়ার দুরাশা;—তাদেরকে সুবুদ্ধি দেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি।

পূর্ব্বাপর

এই সব মানুষ! এরা নিশ্চিন্ত পরিবেশের মধ্যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে ভালবাসে! তখন এরা পরিচিত হয়, শত শত বৎসরের পরপদলেহী পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী আদর্শ সৈনিক হিসাবে! এরাই মাইক্ মারফৎ সেনাপতির নির্দ্দেশ গ্রহণ করে—সংগ্রামের! যুদ্ধ এদের, এ্যাটম বোমার অধিকারী, অর্দ্ধ পৃথিবীর মালিক ইঙ্গ-মার্কিনের বিরুদ্ধে। অস্ত্র এদের অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, অহিংস-পন্থায় আইন অমান্য করা। স্বদেশী কাগজওয়ালাদের মতে—এই সব অহিংস অস্ত্রের শক্তি নাকি লক্ষ্য এ্যাটম বোমের সমতুল্য; ঝনৎকারে তার, শত সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী শত্রুপক্ষ নাকি সদাই সন্ত্রস্ত। অপরপক্ষে—

বিশ্ববাসীও চমৎকৃত!

এ্যাটম বোমের অধিকারী দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের শায়েস্তা করতে চায় যারা অহিংস মন্ত্রের মহান অস্ত্রে, তারাই আবার আঁতকে ওঠে প্রতিবেশীর হাতে পাঁউরুটি কাটা ছুরি দেখে। সারা জগৎকে পরিচালিত করতে চায় যারা শান্তির পথে—নিজেদের শান্তি রক্ষা করে তারা মা মেয়েদের ধর্ষিতা হ'তে দিয়ে—পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ করে দেশ দেশান্তরে পালিয়ে বেড়িয়ে! যারা বিশ্বের কাছে বিখ্যাত হ'তে চায় বীর্য্যবান বিপ্লবীরূপে—নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তারাই সাজে দাঙ্গা-দুর্গত!

—সত্যব্রতর বিষণ্ণ মন উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে,—বিরক্তিতে নয়, অভিমানে! এই অভিশপ্ত দাঙ্গা-দুর্গতর দল, আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তায় এমনি অন্যমনস্ক যে, ভুলে গেছে, হাতে কাঁচা পয়সা থাকাটাও আর এক রকমের অভিশাপ! অভিমান করবে সে কার ওপর! কে শুনতে চায় তার কথা!

এরাই হ'চ্ছে হিন্দুস্থানের সেই সনাতন হিন্দুজাতি। সনাতন পদ্ধতিতেই রক্ষা করে চলেছে জাতীয় জীবনের সনাতন বৈশিষ্ট্য। হাজার বছরের ইতিহাস কলঙ্কিত করেও সন্তুষ্ট নয় এরা। আরও—ক্রমাগত এগিয়ে যেতে চায় এরা অনাগত দুর্গতির পথে।—দোষ দেবে সে কাকে ?

—দোষ আপনার! আপনার দোষেই এঁদের এই দুরবস্থা। শুনছেন মশাই....সত্যব্রতকে সচকিত করে গর্জ্জন করে উঠল জনতা—ব্যূহমুখে তাদের সেই দাঙ্গা-দুর্গত বৃদ্ধ সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে!

—ব্যাপার কী? সত্যব্রত সত্যই ভড়কে গেল!

ব্যাপার গুরুতর! চাবুক উঁচিয়ে থানা-পুলিশ দেখানোর ফলে, সেই বেহারী গাড়োয়ানটা একেবারে বেঁকে বসেছে! আগে সে পাঁচ টাকায় সোয়ারী নিতে রাজী ছিল; কিন্তু এখন পাঁচ হাজার টাকা দিলেও সে এই ঝনঝটিয়া বৃদ্ধের সঙ্গে কারবার করবে না। বৃদ্ধের অপরাধ—সত্যব্রত তাঁরই হ'য়ে অপমান করেছে তাকে। সে দেখতে চায়, মছ্‌লী-খোর বাঙ্গালী স্বশুরাদের বীরত্বের দৌড়। নেবেনা সে যাত্রী, কে কী করতে পারে তার!

বক্তব্যর বিষয় বস্তুর চাইতেও বক্তাদের আর একটা ব্যাপার সত্যব্রতকে বেশী আকৃষ্ট করছিল! সংখ্যায় এরা ছিল মাত্র জন ছয়েক। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সত্যব্রতর-ই উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হ'য়ে একে একে জমায়েৎ হ'য়েছিল এরা ঘোড়ার গাড়ীর আশে পাশে! পথচারী নিষ্কর্ম্মার দল তখন অবশ্য মজা দেখবার জন্যই এদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মজা মারার উপলক্ষ্যটা এদের সত্যব্রতও নয়, গাড়োয়ানটাও নয়—এমন কি দাঙ্গা-দুর্গত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও নন্; লক্ষ্যটা এদের বৃদ্ধের সঙ্গিনীর ওপর!

মেয়েটি নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়েছিল বৃদ্ধের পাশে! কিন্তু তার অচঞ্চল দেহযষ্টীটাই যেন চঞ্চল করে তুলেছিল জনতাকে। সকলেই বিচলিত। অধিকন্তু অতি-তরুণদের উত্তেজনাটা যেন আর একটু বেশী। তাদের কণ্ঠস্বর যত না চড়ছিল, তার চাইতেও বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল মেয়েটির গা ঘেঁষে দাঁড়াবার স্পৃহাটা।

—কী মশাই, হাঁ করে রইলেন যে? বক্তার মুখে সবেমাত্র গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে; কিন্তু চোখে যেন প্রলয়ের আগুন! চীৎকার করে সে বলল: ও সব চলবে না, বুঝলেন?

ছেলেটির মূর্ত্তি দেখে সত্যব্রতর হাসি পাচ্ছিল। এই শ্রেণীর জীব-গুলোকে সে ভাল করেই চেনে। এদের ক্ষুধাটা যে কী তাও তার অজানা নয় এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাবটা যে এদের কত রকমে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাও সে জানে! সে হাসিমুখেই বলল: কী চলবে না?

—ইয়ার্কী!—মুষ্টিবদ্ধ একটি হাত আন্দোলিত করে ছেলেটি বলল: এই অসহায়া নারী আর···ওই বুড়ো ভদ্দরলোক—এঁদের এই বিপদের জন্যে দায়ি কে? আপনি! শুধু তড়্পালেই হবে না বুঝলেন?—আপনাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। না হ'লে—

—না হ'লে কী করবে?

—করবে নয়—করবেন!—সত্যব্রতর মুখে অবজ্ঞার হাসি দেখে ছেলেটির রক্ত যেন বিষিয়ে উঠল;—যেন ফেটে পড়ল সে: ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে শিখুন—বুঝলেন! না হলে, ওই হাসি মুখ আমরা নর্দ্দামা বানিয়ে দোব—বুঝলেন?

সত্যব্রত এবার একটু এগিয়ে এসে হঠাৎ ছেলেটির কাঁধের ওপর হাত রাখল। তারপর হাসিমুখেই বলল : একলা পারবে কী? তার চেয়ে বরং তোমার আত্মীয় স্বজনদের ডেকে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি যাও—আমি এইখানেই আছি!—সত্যব্রত কী যে অন্তর্টিপুনী দিল বোঝা গেল না; কিন্তু ছেলেটির সব লম্ফ ঝম্ফ তৎক্ষনাৎ থেমে গেল।

—কী ব্যাপার বলুন তো?—সত্যব্রত অতঃপর বৃদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করল।

বৃদ্ধ এতক্ষণ অভিভূতের মতোই দাঁড়িয়েছিলেন; সত্যব্রতর প্রশ্নের উত্তরে অসংলগ্নভাবে যা বললেন, তার ভাবার্থ হ'চ্ছে—এই উপচীকীর্ষু তরুণদের গলাবাজীতে বিরক্ত হ'য়েই গাড়োয়ানটা তাঁকে সাফ্ জবাব দিয়েছে।

—এই, চলে আয় তোরা সব—নেতৃস্থানীয় ছেলেটি হঠাৎ হুকুম দিয়েই পিছন ফিরল। কিন্তু, জন দুই সমবয়সী ছাড়া আর কেউই হুকুম তামিল করল না!

—চলুন তো দেখি, ব্যাটা গাড়োয়ান কী বলে!—বৃদ্ধকে এগোবার ইঙ্গিত করে সত্যব্রত বাকি চারজন যুবকের দিকে তাকাল। তারপর মুচ্‌কে হেসে বলল : ব্যাপার কী, এঁ্যা? আপনারাই হ'চ্ছেন এদেশের হবু শাসনকর্ত্তা আর আপনাদেরই নাকের ওপর এই কাণ্ড! একটিমাত্র বদমাইসের জন্যে এতগুলো লোকের মীটিং?

সত্যব্রতর কটাক্ষ্যটা দুর্ব্বোধ্য নয়; কিন্তু তা নিয়ে এবার কেউ আপত্তি তো করলই না বরং কেমন যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। তারপরই গুঞ্জন শোনা গেল : ঠিক বলেছেন...চলুন....

পূর্ব্বাপর

কিন্তু বাধা দিলেন স্বয়ং বৃদ্ধ। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে আপত্তি জানালেন তিনি : লোকটা একে গাড়োয়ান, তার ওপর বদমাইস! আপনাদের ভয়ে আপাততঃ ভাড়াটে নিতে রাজী হ'লেও, পথের মাঝখানে যে বিপদে ফেলবে না, তার নিশ্চয়তা কী? সঙ্গে আবার আমার···কথাটা শেষ না করে বৃদ্ধ মেয়েটির দিকে তাকালেন।

কথাটা সত্যব্রত বুঝল। মেয়েটি রূপবতী না হ'লেও স্বাস্থ্যবতী এবং বয়সটাও বড্ড বেশী খারাপ। সুতরাং বিপদের আশঙ্কা আছে বৈকি! কিন্তু সেও যে এ ক্ষেত্রে এঁদের কী উপকার করতে পারে, চট করে ভেবে পেলনা। বলল : হাঁটতে পারবেন?

—কিন্তু, মুস্কিল হ'চ্ছে, পথে যে আবার টিকেপাড়া আর পটোপাড়া পড়ে যাবে!—একটি যুবক বলল।

—তাতে কী হ'য়েছে?

—এই বাজারে হিন্দু হ'য়ে পটোপাড়ায় ঢুকবেন? —যুবক অবাক হ'য়ে গেল!

—তার মানে?—ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সত্যব্রতও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। বলল : পটুয়াদের তো এতদিন আমি হিন্দু ব'লেই জানতাম।

—আমরাও তো তাই জানতাম!—আলোচনাটাকে গুরুত্বপূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে যুবক যথোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই বলল : শুধু আমরা কেন,—পটুয়াদের নিজেদেরও বোধ হয় ধারণা ছিল, তারা হিন্দু! অন্ততঃ প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তারা হিন্দুই ছিল!

—হঠাৎ অ-হিন্দু হ'য়ে গেল কী করে?

—মারের চোটে—রাতারাতি! Great Calcutta kill ng-এর

পরে, একদিন গভীর রাত্রে, গোটাকতক বে-পাড়ার গুণ্ডা এসে ওদের পাড়ায় ঢোকে। তারপর ডজন দু'য়েক সাফ্ হ'য়ে যাবার পর পটুয়ারা জানতে পারলে, ওরা হিন্দু নয়, জিন্না সাহেবেরই জাত ভাই। এখন ওরাও চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে······

—বাঃ।

পটুয়াদের ধর্ম্মোপলব্ধির রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম করবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও মনে পড়ে গেল সত্যব্রতর। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকবার সময়ে নিকটস্থ একটা মেথর বস্তীর সংবাদ রাখবার সুযোগ পেয়েছিল সে। তারা যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব প্রভৃতি করতো, ঠিক তেমনি নিষ্ঠাভরেই বার করতো মহরমের তাজিয়া। জিন্না সাহেবের কৃপায় তাদের অবস্থাটা কী হ'য়েছে কে জানে!

এই প্রসঙ্গে বেদিয়া সম্প্রদায়ের সংস্কার-বৈচিত্র্যও চিহ্নিত করে তুলল তাকে! সামাজিক জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে প্রকাশ পায় তাদের হিন্দুর আচার-বিচারের নিষ্ঠা! পটুয়াদের মতো নামকরণও করে তারা হিন্দু দেব-দেবীর নামানুসারে। শুধু ভগবানের নামটুকু তাদের আলাদা। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বেড়াজালে পড়ে তারা আজ কী করছে, কে জানে!

—অবশ্য—পূর্ব্বকথার জের টেনে যুবকটি বলল : মাইল তিনেক ঘুরে. হিন্দুপাড়ার ভেতর দিয়েও মনসাতলায় যাওয়া যায়। কিন্তু—বলে, যুবকটি প্রথমে চাইল মেয়েটির দিকে, তারপর তাকাল ঊর্দ্ধ মুখে!

—হুম্! সত্যব্রতও আকাশের দিকে তাকাল : রৌদ্রটা সত্যিই বড় প্রচণ্ড। তারপরই হঠাৎ কী ভেবে প্রশ্ন করল বৃদ্ধকে : আপনারা দাঙ্গা

দুর্গত তো? কবে এসেছেন এখানে? আছেন কোথায়? কোন ক্যাম্পে না বাসা ভাড়া করেছেন!

বৃদ্ধের চোখ দুটো এবার চক্ চক্ করে উঠল। স্খলিত স্বরে বললেন তিনি: গত কালীপূজার রাত্রে ভগবান নোয়াখালী-নাথ তাদের ত্যাগ করেছেন! তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে, হাঁটা পথে, বহু কষ্ট পেয়ে পশ্চিম বাঙ্গলায় পৌঁছেছেন তাঁরা গত শীতকালে। কিছুদিন যাবৎ মনসাতলাতেই আছেন তাঁরা, স্বগ্রামের একজনের আশ্রয়ে—

—ওঃ আচ্ছা, তা হোক্—আপনারা আসুন আমার সঙ্গে!—বলেই সত্যব্রত ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'লো!

—ভদ্রলোক কে বলতো, অবন?—সত্যব্রত একটু এগিয়ে যেতেই আর একটি যুবক প্রশ্ন করল: তুই যে রকম সমীহ করে কথা কইছিলি·······

—তুই কী রে? অবন অর্থাৎ অবনীও আশ্চর্য্য হয়ে প্রতি প্রশ্ন করল: এখনও চিনতে পারিস্ নি?

—তবে যে শুনেছিলাম·· ···যুবকটি অভিভূতের মতো বলল:····ওঁর বাড়ীর লোকেরাই তো কথাটা রটিয়েছিল······

—সেইটেই তো আশ্চর্য্য! অবনী চিন্তিতমুখে বলল: হয়তো মতলব করেই রটিয়েছিল! সরীকানী ব্যাপার তো!

—উনি কে মুশয়? সত্যব্রতর বিরাট চেহারা ও বিচিত্র মেজাজ বৃদ্ধকেও কৌতূহলী করে তুলেছিল।

—উনি হচ্ছেন শীকারপুর রাজবাড়ীর বড় সরীক। রায় রাজা শুভব্রত চৌধুরীর নাম শুনেছেন তো?—উনি তাঁরই ছেলে, সত্যব্রত রায়!

পূর্ব্বাপর

—বলেন কী মুশয় !

—হ্যাঁ, দেশের কল্যাণের জন্যে জেলে গিয়েছিলেন উনি গত তেতাল্লিশ সালে ; আজ ফিরলেন !

—রাজার ছেলে !—Ism-অধ্যুসিত মাটির বুকে যেন বজ্রাঘাত হ'লো ! অভিভূতের মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ !—বগল-দাবায় পোঁটলা-ধরা, ময়লা জামা কাপড় পরা ওই লোকটা রাজার ছেলে !

রাজপুত্র !—বিস্মৃতির সাগর মন্থিত হয়ে আবার যেন রূপ পরিগ্রহ করে বহু যুগের ভুলে যাওয়া রূপকথা ! বর্ত্তমানের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় তেইশ বছর পূর্ব্বেকার স্মৃতি !—পিতামহীর কোলে শুয়ে সন্ত্রস্তভাবে স্বপ্ন দেখার কথা ! কিন্তু রূপকথার রাজপুত্র কি আবার যাত্রা করবে সোনার-কাঠির সন্ধানে ! যাদু-স্পর্শে তার, আবার কি জেগে উঠবে দানব-কবলিতারা—দানব-দলনীরূপে ! সে রূপের আগুন আবার কি পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারবে শতাব্দীর ঘুণ ধরা এই ক্লীবত্বের ধর্ম্ম ! উত্তাপে তার আবার কি স্পন্দিত হবে পাথরের প্রাণ !—এতক্ষণ পরে মুখ তোলে নতমুখী মেয়েটি। তার সুদীর্ঘ নীরবতা যেন ভাষা পায় চোখের দৃষ্টিতে : এও কি সম্ভব—

পাথরও আবার কেঁপে উঠেছে তার জড়ত্ব ভুলে ! প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার শক্তিমানের মন্ত্রশক্তিতে !

মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয় আশা-বাদীর স্বপ্ন ! সে স্বপ্নকে যেন সার্থক করে তোলে তার আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিকতা ! সে যেন স্পষ্ট অনুভব করে : শত যুগের ক্লীবত্ব ভুলে জাতি আবার জেগে উঠেছে ! নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে তার কল্পকালের কলঙ্ক !—সে কালী

নিশ্চিহ্ন হয়েছে মহাকালীর কাল-নৃত্যে! উন্মাদিনী মহাশক্তির ছিন্নমস্তারূপ দেখে আবার সন্ত্রস্ত হয়েছে নরক রাজ্যের দানব-সমাজ! …আবার বেঁচে উঠেছে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ…কল্যাণ এসেছে প্রলয়ের মধ্য দিয়েই……

—একি হলো? —মেয়েটির চোখ মুখের অবস্থা দেখে অবনী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

বৃদ্ধও উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত ধরে তিনি ডাকলেন: মা—

মেয়েটি অর্থহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকাল।

—লক্ষ্মী মা আমার! ভয় কী? বৃদ্ধ সস্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

সম্ভবতঃ স্পর্শ গুণেই মেয়েটি আবার সচেতন হলো। পূর্ব্বের মত আবার সে সঙ্কুচিত হ'য়ে দাঁড়াল নতমুখে। বৃদ্ধও তখন ভরসা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন: মেয়েটা এখনও একেবারে পাগল হয়ে যায়নি।

ওদিকে ষ্টেশন যত নিকটবর্ত্তী হচ্ছিল, সত্যব্রতও বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছিল তত! সে চলেছিল পরের জন্য অপরের কাছে; ব্যাপারটার মধ্যে ব্যক্তিগত কোন কিছুর সম্পর্কমাত্রও ছিল না। কিন্তু, তবুও, কী যেন কী একটা অস্বস্তিকর কারণে ক্রমশই সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছিল। মনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চলার বেগও শিথিল হয়ে আসছিল তার। অথচ হাতের তীর যখন একবার ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে, তখন প্রতিবিধানই

বা আর সে কী করতে পারে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হৃদয়গোপালের গাড়ী প্রত্যাখ্যান করেছিল সে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার অজুহাতেই। তখন তার যুক্তি ছিল : যে কারণে সে হৃদয়গোপালকে অপছন্দ করে, ঠিক সেই কারণেই যে তাঁর গাড়ী চড়তেও পছন্দ করে না! অর্থাৎ তার কাছে কালোবাজারী ঘৃণ্য ; কিন্তু তার চাইতেও ঘৃণ্য সে, যে, সময় বিশেষে সেই কালোবাজারীর অর্থ-সম্পদের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না!

কিন্তু, কোন কিছু একটা অজুহাত থাকলেই যে সেটাকে অভদ্রভাবে প্রকাশ করতে হবে, এইটাই বা কোন দেশী ভদ্রতা! ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। হৃদয়গোপালের সঙ্গে রুচির মিল তার না থাকাই স্বাভাবিক! কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা কি শুধু নিজের সভ্যতা-ভব্যতা বিসর্জ্জন দেওয়া! যে কারণেই হোক হৃদয়গোপাল উপযাচক হ'য়ে তাকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন! তার তরফে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার যুক্তিও ছিল যথেষ্ট! কিন্তু সেই অজুহাতে করুণাকে অপমান করবার অধিকার তার জন্মায় কী করে! করুণার অপরাধ, কার্য্যান্তরে ব্যস্ত পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিল সে!

করুণার সেই সময়কার মুখখানা মনে পড়ছিল তার।—অকস্মাৎ আঘাত পেয়ে মুখটি যেন তার রক্তশূন্য হ'য়ে গিয়েছিল ; দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল...

কী ফুটেছিল? বিস্ময়...সন্ত্রাস কিংবা ঘৃণা?

ঘৃণা সম্ভবতঃ নয়!—বড় নরম মন করুণার—ছোট্ট বেলা থেকেই জানে তো সে! ওসব ঘৃণার ধার সে ধারে না; তবে, অত্যন্ত তুচ্ছ

কারণেও রেগে উঠত সে সতুদার ওপর! সে-ই করুণা যে,—হ'লেও হতে পারতো তার বিবাহিতা স্ত্রী......

—ব্যাপার কী সতুদা?—বিকাশের হাসিতে চমক ভাঙ্গল তার—এর মধ্যেই দল জোগাড় করে ফেললে? সদলবলে এদিকে চলেছ কোথায়?

সকন্যা হৃদয়গোপালও তাকিয়েছিলেন তার দিকে। কন্যার ভাব দুর্ব্বোধ্য! কিন্তু পিতা পূর্ব্বের মতো হাসিমুখেই বললেন: আমরা ভেবেছিলাম, তুমি এতক্ষণে বাড়ী পৌঁছে গেছো—

—না, ফিরে এলাম একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে: আপনারা তো দাঙ্গা দুর্গতদেরই সাহায্য করছেন? তা—

—তা কী?

—মানে, দাঙ্গা-দুর্গতরা যদি সদ্য দুর্গত না হয়, মানে, বছর খানেক আগেকার দুর্গত হয়···মানে, তাহলে····

—আঃ সতুদা!—বিকাশ এবার হেসে ফেলল। বলল: তোমার formality রেখে, আসল কথাটা বলেই ফেল না।

—মানে—অসংলগ্ন ভাষার সঙ্গে সলজ্জ হাসি মিশিয়ে সত্যব্রত এমন অদ্ভুতভাবে গাড়োয়ান বিভ্রাটের কথাটা নিবেদন করল যে, করুণার গাম্ভীর্য্যও স্খলিত হ'য়ে পড়বার উপক্রম করল।

মানুষের স্বভাব যায় না মলে! দীর্ঘকাল পরে বাড়ী ফিরছে সত্যব্রত। দেহ তার ক্লান্ত; মনের অবস্থাও ভাল নয় নিশ্চয়ই। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানুষ বিশ্রামের জন্যই লালায়িত হয়ে ওঠে সর্ব্বাগ্রে; অন্ততঃপক্ষে অশান্তিকর কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়িত করবার বাসনা তার না হওয়াই স্বাভাবিক! কিন্তু কী অদ্ভুত এই সত্যব্রত! দেশের মাটিতে

পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই টনক নড়েছে তার :—কোথায় কে গাড়োয়ান করছে কালোবাজারী এবং তার ফলে, কোথায় কোন দাঙ্গা-দুর্গত, দুর্গতির সম্মুখীন হ'য়েছে। আশ্চর্য্য!—করুণা সকৌতুকে লক্ষ্য করতে লাগল সত্যব্রতকে!

—তুমি কী হে?—হৃদয়গোপালও সজোরে হেসে উঠে বললেন: এতক্ষণ ধরে এই সব কাণ্ড করছিলে?

—উপায় কী? সত্যব্রত সহজভাবেই বলল : এই সব অন্যায় সহ্য করা যায় কখনও?

—সহ্য করবার দরকারই বা কী?—হৃদয়গোপাল দরাজ গলায় ব্যবস্থা দিলেন : ছোট গাড়ীটা ক'রে ওঁদের পৌছে দিলেই তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়! ক'জন তাঁরা?

—দু'জন। ওই যে—

কিন্তু, বৃদ্ধকে দেখেই, হৃদয়গোপালের হাসি মুখ কেমন যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল। বিশেষতঃ মেয়েটির আপাদমস্তক বার কতক নিরীক্ষণ করে, তিনি স্পষ্টই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর বললেন : আপনারা তো প্রায়ই এদিকে আসেন, না?

—আজ্ঞে—বৃদ্ধ সভয়ে একটা ঢোক গিললেন!

—কবে এসেছিলেন এদিকে?—বাস্-টাস্ তো সব গত কাল বিকেল থেকে বন্ধ হ'য়ে গেছে—

—আজ্ঞে—বৃদ্ধের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন পালাতে পারলেই বাঁচেন। আরও কয়েকটা ঢোক গিলে, ঠোঁটের ওপর বারকতক জিভ বুলিয়ে নিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি নীরবই রয়ে গেলেন।

—এই মেয়েটি আপনার কে হয়? মেয়ে নিশ্চয়ই নয়?

—আজ্ঞে না!

—তবে?

—আজ্ঞে, ভাইপো-বৌ···মানে···ভাইপোর বৌ হয়, সম্পর্কে!

—হুম্!—মেয়েটির সিন্দুর শূন্য সীমন্তের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে হৃদয়গোপাল কী যেন একটু ভাবলেন; তারপর বিকাশকে ডেকে বললেন: তুই এদের পৌছে দিয়ে আয়!

বিকাশ সম্মতি জানিয়ে অগ্রসর হলো; হৃদয়গোপালও ফিরে এসে আবার বসে পড়লেন নিজের কেদারায়। তারপর আলস্যভরে একটা হাই তুলে সত্যব্রতকে বললেন: তোমরা তাহলে এগিয়ে পড়, আর দেরী ক'রো না—

সত্যব্রত সাড়া দিল না। হৃদয়গোপালের কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখে মেজাজ তার আবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রিলিফ কমিটির প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে নিজেকে ভেবেছেন কী উনি? দুর্গতরা কমিটির শরণাপন্ন হয় কিসের আশায়! সাহায্য-সান্ত্বনা লাভের আশায়, না, এই ধরণের বেয়াড়া প্রশ্ন শোনবার উদ্দেশ্যে! ব্যাপার দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল সে। অপরপক্ষে, বৃদ্ধের অতি-কুণ্ঠিত ভাবটাও আবার বিমর্ষ করে তুলছিল তাকে! ক্রমাগত কত ঘা খেলে তবে মানুষ ভুলে যেতে পারে—একদিন সেও মানুষ ছিল, ভদ্রলোক ছিল। একাধারে অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে আসার আঘাত শুধু এদের মনুষ্যত্বই অপহরণ করেনি—স্বাভাবিক সংস্কারের স্মৃতিটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে দিয়েছে! ফলে, বৃদ্ধের আজ এই অবস্থা।

পূর্ব্বাপর

সত্যব্রতর ইচ্ছা হচ্ছিল, হৃদয়গোপালের ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে ভরসাও পাচ্ছিল না সে। এ ক্ষেত্রে গাড়ী প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম, বৃদ্ধকে আরও বিপদে ফেলা। অগত্যা—

প্ল্যাট্ফরমের বাইরে এসে সত্যব্রতকে আবার থামতে হ'লো—ঠিক সেই জায়গায়, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে যেখানে দাঁড়িয়ে করুণা তাকে অনুরোধ করেছিল·······

ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল করুণা। কিন্তু এবার সে সত্যব্রতর দিকে ফিরেও চাইল না; বরং তার উপস্থিতি অনুভব ক'রে মুখখানা তার যেন আরও গম্ভীর হ'য়ে গেল। অথচ, এ সমস্যা সমাধানেরই বা উপায় কী? হৃদয়গোপালের গাড়ী তো দূরের কথা—তাঁর সংস্পর্শে আসার চিন্তাও সত্যব্রতর পক্ষে অসহ্য।

—সতুদা, আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন!—বিকাশ ইতিমধ্যে গাড়ীর পিছনের সীটে স-সঙ্গিনী বৃদ্ধকে বসিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ সত্যব্রতকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল: আবার কী হ'লো?—এ্যাঁ—

প্রত্যুত্তরে সত্যব্রত চাইল করুণার দিকে!

করুণা পূর্ব্বেই তাকিয়েছিল!

মুহূর্ত্তকাল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। তারপর—

সত্যব্রত চমকে উঠল। ভগবানদাসের সেই লরীটা শান্তি সেনার দলকে বহন করে সগর্জ্জনে এসে থামল ওদের অদূরে। মণ্টু লরীর ওপর থেকেই চীৎকার করে উঠল: আরে সতুদা আপনি এখানে?

—সতুদা, এ্যাদ্দিন পরে...এক্...

শান্তি-সেনার দল টপাটপ লরী থেকে নেমে পড়ে ঘিরে দাঁড়াল সত্যব্রতকে। তারপর আরম্ভ হ'লো—

—কোথায় ছিলেন এ্যাদ্দিন, এ্যাঁ?

—আমরা তো শুনেছিলাম·······

—যাক্, বেঁচে আছেন, তাহলে······

—ভাল ছিলেন তো—

বলা বাহুল্য, খাতিরের ঘটা দেখে সত্যব্রত সত্যিই ভড়কে গেল! ঘণ্টাদুয়েক পূর্ব্বে এদের সকলেরই সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল তার; কিন্তু তখন একটি মাত্র ছেলে ছাড়া আর কেউই চিনতে পারেনি তাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ এমন কী কারণ ঘটল, যার জন্যে—

—ওঃ আপনি বুঝি শোনেন নি—করুণাকে উদ্দেশ করে শুয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল: আমাদের কম্‌রেড সেন যে সতুদাকে ভীষণ চেনেন। এক সময়ে নাকি দারুণ বন্ধুত্ব ছিল ওঁদের—

—তবে আর কী! বিরক্তি চেপে করুণা বলল: আপনার সতুদা তাহলে জাতে উঠে গেছেন।

—এবার কিন্তু আর পালালে চলবে না সতুদা—

—এবার এখানে থেকেই কাজ করতে হবে—

—হ্যাঁ, প্রভাতীদি বলছিলো,—সতুদাকে দিয়ে ভাল করে পার্টি গড়তে হবে—

—সত্যি, লোক্যাল লীডার আরও চাই আমাদের—

বিভিন্ন কণ্ঠের বিচিত্র কলরবের মধ্যে থেকে দু' একটা বে-ফাঁস কথার অস্ফুট:টুকরোও ভেসে এল:

—এ সব ব্যাপারে, আবার জমীদার-নন্দন কেন বাবা?

— জমীদার-নন্দন কী বলছিস্। কুমার বাহাদুর বল্—

—কুমার বাহাদুরই বা কেন? Why not রাজা বাহাদুর? বাপ্ তো বহুকাল আগেই টে঳সে গেছে—

—Exactly! রায় রাজা সত্যব্রত—son of শুভব্রত—

—এই আস্তে, ব্যাটা শুনতে পাবে—

—হয়েছে? —হঠাৎ তীব্রস্বরে প্রশ্ন করল করুণা: না আরও চাই?

—এ্যা? সত্যব্রতর যেন চমক ভাঙ্গল, বলল: কী বলছো?

—বলছি, করুণা বেশ উত্তেজিত হয়েই বলল: বাড়ী-টাড়ী যেতে হবে, না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই সব শুনলেই পেট ভরবে?

—ওঃ হ্যাঁ,—চল—

করুণা অগ্রসর হলো; সত্যব্রতও নিরীহ বালকের মতো তার পিছন পিছন গিয়ে উঠে বসল গাড়ীতে!

—ওঃ! দরদ দেখেছিস্!—আবার ভেসে আসে ছেলেদের মন্তব্য: একেই বলে প্রেম···

—আরে, আসল কাজটাই যে হ'লো না। প্রশান্তদা কই—

—চল্ খুঁজে দেখি—

পাঁচ

রাজপুত্র! সত্যব্রত ছেলেমানুষ নয়, তবুও যুক্তিবাদী মন তার ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। সঠিক অর্থে, রাজপুত্র না হলেও এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ-বংশের সন্তান সে নিঃসন্দেহ। কিন্তু, এ ছাড়া কি তার আর কোন পরিচয় নেই? দেশের লোকে তাকে দেখে আজ সেই পুরণো ইতিহাস স্মরণ করছে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের ফ্যাসান রক্ষার নিষ্ঠাটুকু আরোপ করছে তারই ওপর! কবে সে কোন অতীতে, তার পূর্ব্বপুরুষ, তদানীন্তন পাঠান নবাবকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই রাজ-বংশের, শুধু এই অপরাধেই আজ সে অবজ্ঞাত! অতীতের সেই ঐতিহাসিক সত্যের মূল্য আজ কানা-কড়িও নেই; তবুও তাকে শুনতে হবে—সে রাজপুত্র! আজ তাদের ভূমি নেই, খেতাব নেই, এমন কি গ্রামস্থ তহশীলটুকুর জন্যও তারা ইজারাদার হৃদয়গোপালের মুখাপেক্ষী—তবুও এরা উপহাস করবে তার অতীত নিয়ে? কিন্তু অতীতটা যদি বর্ত্তমান হতো?

—ওমা, দেবতা যে গো—

সত্যব্রত চমকে উঠল। আস্‌স্যাওড়ার জঙ্গল ভেদ করে একটা পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছিল তাদের বাড়ীর দিকে; বড় রাস্তায় মোটর ত্যাগ করে সে এই পরিত্যক্ত পথ ধরেছিল পথ-সংক্ষেপের জন্য! আপন মনে ভাবতে ভাবতে পথ চলেছিল সে হন হন করে; হঠাৎ মানুষের গলা শুনে চমকে উঠল।

পাশেই ছিল বাঁশিনী বাঁশের একটা ঘন-সন্নিবদ্ধ ঝাড় ; সেখান থেকে আবার আওয়াজ এল : ওমা আমার কী হবে···দাঁড়াও গো বাবা, চলে যেও না·· ····

সত্যব্রত এবার লক্ষ্য করল, বাঁশ ঝাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করে রয়েছে একটা ডোবা ! ডোবাটাতে জল সে দেখতে পেল না ; হল্‌-কল্‌মী আর কচুরী-পানা বংশ বিস্তার করে চমৎকার একটি সবুজ আস্তরণের সৃষ্টি করেছিল সেখানে ! তারই মধ্যে থেকে উঠে এল দুটি নারী। একটি যুবতী, অপরা প্রৌঢ়া। দু'জনের হাতেই ছিল দুটি ছাঁকনি জাল !

—আমাকে চিনতে পারছ না বাবা ? এক গাল হেসে প্রৌঢ়া বলল : আমি যে সেই নিথর ঠাকরুণ গো ! সেই যে—যাদেরকে সেবার তুমি যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে ! তাই তো বলি, তোমার মতো মানসের কখনও কি ভাল-মন্দ হতে পারে ? ও সব সরীকানি ষড়যন্ত্র···আ মর ! পোড়ারমুখী পেন্নাম কর না...

মেয়েটি মায়ের পিছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার এক হাতে ছাঁকনি জাল,—অপর হাত দিয়ে সে কাপড় সামলাচ্ছিল। স্বল্প বহরের সিক্ত শাড়ীতে তার অবশ্য তখন সামাল দেবার মতো তেমন কিছুই ছিল না ; তাই, মায়ের অনুযোগ শুনে সে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল !

সত্যব্রত এতক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ বলল : এটি কে ?

—ওমা এ যে আমার ভানুমতী গো ! আ মর ! নজ্জাবতীর নজ্জা দেখনা ! সেবার ওলাউঠোর সময়, এ নজ্জা তোর কোথায়

ছিল রে হারামজাদী! দেবতা যে নিজের হাতে তোর...নিথর ঠাকরুণ হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে মেয়েকে ফেলে দিল সত্যব্রতর পায়ের ওপর!

—থাক্ থাক্—সত্যব্রত দু'পা পেছিয়ে গেল। সম্ভবত মেয়েটিকে আশীর্ব্বাদও করল সে গুন গুন করে। কিন্তু তার দিকে ভাল করে চাইতে পারল না।

ব্রাহ্মণ এরা। সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্তর ছিল এদের নিম্ন মধ্যবিত্ত। গত পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়ে এরাও সপরিবারে কলেরা কবলিত হয়েছিল। সত্যব্রত অনেক চেষ্টা করে বাঁচাতে পেরেছিল মাত্র এদের দু'জনকে— মা ও মেয়েকে। কিন্তু সেদিনকার সেই কঙ্কালসার দেহটার সঙ্গে আজকের এই তরুণীর পার্থক্যটা....সত্যব্রত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সেদিনকার সেই নিঃশেষিত প্রাণশক্তি কী উদগ্র হয়ে উঠেছে আজ! সেই ক্ষয়িষ্ণু দেহটা যেন আজ সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করে উদ্দাম হয়ে উঠেছে যৌবনশ্রীতে।

সত্যব্রতর ভদ্র মন হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এ সব কী ভাবছে সে! কয়েক বছর পূর্ব্বে এই মেয়েটারই সুশ্রূষা করেছিল সে! তার তখনকার সেই আবরণহীন দেহ—তাকে নিরন্তর একলা পাওয়ার অধিকার —অসহায়া তরুণীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অসংলগ্ন ভাষা—সেদিন তো মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল করেনি তাকে! অথচ ..হঠাৎ একি হলো তার! সেদিনকার বাস্তব যার মনে এতটুকুও আঁচড় কাটতে পারেনি, আজ তাই কল্পনা করেই সে আত্মবিস্মৃত!

—আচ্ছা, আবার দেখা হবে! বলেই, সত্যব্রত তাড়াতাড়ি প্রস্থানোদ্যত হলো!

পূর্ব্বাপর

—আমাদের ভুলো না বাবা! পিছন থেকে ভেসে আসতে লাগল নিথর ঠাকরুণের সকাতর অনুনয়: কেউ নেই আমাদের...আবার দেখা দিও...

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর সত্যব্রত বাড়ী পৌছল! ফটকে, ইজারাদারের তরফ থেকে একজন করে পাহারাদার থাকবার কথা; কিন্তু তখন কেউ ছিল-না সেখানে! ব্যাপারটা সত্যব্রতরও নজরে পড়ল না; অন্যমনস্কর মতো এগিয়ে গিয়ে সে বাড়ীর সামনে আর একবার দাঁড়াল।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিরাট বাড়ীটাকে দেখাচ্ছিল, যেন একটা বিপ্লব-অধ্যুসিত রাজ্যের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের মতো। হঠাৎ বুকের মধ্যে যেন তার মোচড় দিয়ে উঠল—

সাবেকী আমলের গড়বন্দী বাড়ী তাদের—তল্লাটের লোকে বলে, রায়-রাজার গড়। সাতটি মহলে বিভক্ত প্রকাণ্ড এই অট্টালিকাটার এক সময়ে জৌলুষের অন্ত ছিল না! পিতামহ দেবব্রতর আমল পর্য্যন্ত বারো মাসে তেরো পার্ব্বন হতো এ বাড়ীতে। স্বর্গীয় রায়-কর্ত্তাকে ঘিরে এ অঞ্চলের প্রজা-সাধারণ তখন নিত্য মেতে উঠত উৎসব আনন্দে। সত্যব্রত তখন শিশু ছিল; সে সব দিনের কথা মনে করে রাখবার মতো বয়স হয়তো তখন তার ছিল না; কিন্তু গ্রামস্থ প্রবীন-প্রবীনাদের কল্যাণে শৈশব স্মৃতি তার আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন, এ বাড়ীতে মাকাল ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে ঘেঁটু-পূজোটি পর্য্যন্ত বাদ পড়ত না। সদর ফটকের মাথার ওপর সকাল সাঁঝে বাজত রৌশনচৌকি। বাদ্য-ভাণ্ড উত্তপ্ত

করতে করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত পচা কাওরা। হরে খানসামার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল তামাক সেজে সেজে। গড়-বাড়ীতে সানাই বাজাত তখন তিন-চারজন বিদেশী মুসলমান। কাশীর নাম-করা সঙ্গীতজ্ঞ ছিল তারা। রায়-কর্ত্তা তাদের মোটা বেতন দিতেন; তাছাড়া ইনামও পেত তারা নিয়মিত ভাবে প্রতি উৎসব উপলক্ষে! তখনকার দিনে যাত্রা, কবি, পুতুল-নাচ, বাঈ-নাচ প্রভৃতি ছিল উৎসব আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ! বাড়ীর উস্তাদ ছিলেন রামনগরের খলিফা বসিরুদ্দীন খাঁ সাহেব ও তাঁর পুত্র—তখনকার দিনের উদীয়মান স্বরোদ নেয়াজী মনিরুদ্দীন খাঁ এ ছাড়াও উত্তর ভারতের অনেক স্বনামধন্য ধ্রুপদী, বীণকারও নিয়মিত-ভাবে এসে সন্তুষ্ট করে যেতেন রায়-কর্ত্তাকে। স্বর্গীয় রায়-কর্ত্তা ছিলেন তদানীন্তন বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী; অধিকন্তু ক্রীয়াসিদ্ধ ও ঔপপত্তিক সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরূপে বাঙ্গলার বাইরেও নাম-ডাক ছিল তাঁর।

তারপর বিসর্জ্জনের বাজনা বাজল। ভাঙ্গন ধরল গড়-বাড়ীতে!

রায় পরিবারে নতুন আমল আরম্ভ হয়, কর্ত্তার মৃত্যুর দ্বিতীয় বৎসর থেকে। বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারটা হঠাৎ যেন একদিন ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। পৈত্রিক আমলের পূজো-পার্ব্বনগুলো হলো বন্ধ; সাবেক কালের রান্না-মহল ভেঙ্গে তৈরি হলো ছোট ছোট ছয়টি রান্নাঘর!

পরিবর্ত্তনটা রায়-বাড়ীতে ঢুকেছিল সংস্কারের মুখোশ পরে। সত্যব্রতর পিতা, রায় শুভব্রত ছিলেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্সীর ছাত্র! পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সর্ব্ব প্রথম এ বাড়ীতে আমদানী করেন সহুরে সাহেবীয়ানা। জ্যেষ্ঠর আদর্শের অভিনবত্ব দেখে কনিষ্ঠ পাঁচজনও ক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে

পড়লেন। ফলে, অচিরেই বৈঠকখানা ঘুচে গিয়ে সৃষ্টি হলো ল্যাণ্ডস্কেপ সজ্জিত ড্রইং-রুমের। ফরাসকে নির্ব্বাসিত করে আমদানী করা হলো বহুমূল্য কাউচের। কোঁচানো শান্তিপুরীর সেকেলে আভিজাত্যে হতশ্রদ্ধ হয়ে রায় বাড়ীর ছয়টি রত্ন sleeping-গাউন পরে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলেন বাড়ীময়!

তবুও—স্বেচ্ছাচারী গুরুজনদের বিরুদ্ধে সত্যব্রতর মন বিষিয়ে ওঠে—তবুও যদি তাঁরা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, তাহলে আজ বোধহয় গড়-বাড়ীর এ অবস্থা হতো না ; তাকে বাড়ী ফিরতে হতো না এমন অপরিচিত অবজ্ঞাতর মতো, শুনতে হতো না সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রায় পরিবারের ছেলে হিসাবে! রায়-কর্ত্তার মৃত্যুর পর ছেলেরা তাঁর চেপে বসেছিলেন কোলকাতার বাড়ীতে! ডিনার খেতেন, ড্যান্স করতেন, আর মাঝে মাঝে হাল্-চাল্ দেখতে যেতেন কণ্টিনেণ্টের! গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁদের শুধু উপরি উপার্জ্জনের। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা-পত্র আদায়ের ভার ছিল যথারীতি নায়েব গোমস্তার ওপরই ; জমীদারেরা মাঝে মাঝে দেশে আসতেন শুধু প্রজাদের কাছ থেকে উপরি নজরানা আদায়ের উদ্দেশ্যে। ফলে, যা ঘটবার তা ঘটল।

মাত্র কয়েকটা বছরের হেরফেরে তুনিয়ার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। রায় পরিবারের রত্নরা আবার যখন দেশে এসে বাস করতে বাধ্য হলেন, পরিবর্ত্তনটা তখন শুধু পরিলক্ষিতই হচ্ছিল না—প্রকট হয়ে উঠেছিল। কোলকাতার প্রাসাদতুল্য "শীকারপুর হাউসে" ইতিমধ্যেই মাড়োয়াড়ীর চট ঝুলতে আরম্ভ করেছিল ; এষ্টেটের সব চাইতে আদায়ী পরগণা সেলিমগঞ্জের স্বত্বও চলে গিয়েছিল অপরের হাতে ; সর্ব্বপরি গ্রামের প্রজারা পূর্ব্বের

মতো নিরক্ষর অসহায় থাকলেও, নিরীহ আর তারা ছিল না। জমীদারকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করবার মতো সাহস ইতিমধ্যেই তাদের দেখা দিয়েছিল।

তবুও, তখনও আশা ছিল। প্রজারা সেদিনও সমালোচনাই করতো জমীদারের। অর্থাৎ বর্ত্তমানীদের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তীদের গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করতো। কিন্তু জমীদার মাত্রেই যে খারাপ, সম্ভবত, এমন চিন্তা তখনও তাদের মাথায় আসেনি। অশিক্ষিত পল্লীবাসীর দল সেদিন এই অদ্ভুত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গুমরে উঠেছিল নিঃসন্দেহ! কিন্তু সত্যকার বিদ্রোহী হবার মতো যুক্তি তখনও তাদের মাথায় কেউ ঢুকিয়ে দেয়নি! ধর্ম্মের মুখোশ পরে, সংস্কারের যে বীজ বংশ-পরম্পরাক্রমে তাদের অস্থি-মজ্জার মধ্যে গিয়ে শিকড় বিস্তার করেছিল, বর্ত্তমানের নিরন্তর আঘাতে, তার বিষক্রিয়াটা তাদের মধ্যে হয়তো কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল; কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করবার মতো বুদ্ধি তখনও তাদের হয়নি। —এই অশিক্ষিত অতীত-বিলাসীর দলকে সংস্কার মুক্ত হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো মন্ত্র দেনে-ওয়ালারাও তখন সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য! তাই, তখনও তারা একালের নগ্ন-নোংরামীগুলোকে সেকালের স্মৃতি দিয়ে ঢাকা দেবারই চেষ্টা করতো!

কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত তাদের সেকেলে স্মৃতিও মুছে গেল আর একটা ঘটনার প্রভাবে! রায়-বাড়ীর রত্নরা সাহেবীয়ানার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বস্তু এনেছিলেন সহর থেকে—বিভিন্ন সর্ব্বনাশা-প্রসূ প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম ভ্রূণ, বৈপ্লবিক সাম্যবাদের হিড়িক!—ফ্যাসানটা তখন ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই দেখা দিয়েছিল। তাই রায়রত্নরাও, ছোট-বড়র ভেদাভেদ

ভুলে গিয়ে, এক সঙ্গে বসে চর্চ্চা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন "মকারান্তের"! অধিকন্তু, সাম্যবাদের নিষ্ঠাটুকু যে তাঁদের কৃত্রিম নয়, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক রকম ঔদার্য্যের প্রমাণও দিয়েছিলেন তাঁরা। তার মধ্যে, কয়েকজন গ্রামস্থ প্রজার আসরে স্থান পাওয়া অন্যতম!

অদ্ভুত! সত্যব্রত আজও এ রহস্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারেনা: যে ক'জন ভদ্রবংশীয় ইতরলোক জমীদারের পয়সায় স্ফূর্ত্তি লুটতো— জমীদারের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের মন বিষিয়ে তোলবার মূলেও ছিল তারাই। মদ্যপায়ী জমীদারেরা হয়তো সেদিন সত্যই গৌরব বোধ করেছিলেন ছোটকে একাসনে বসিয়ে—তাদেরকে বন্ধুর মর্য্যাদা দিয়ে। কিন্তু নেশার প্রভাবে তাঁরা আত্মবিস্মৃত হলেও, তাঁদের সেই তথাকথিত বন্ধুদের চেতনা এতটুকুও বিকৃত হয়নি। ইতরের দল যেটুকু সময় প্রভুদের পদলেহন করতো, তার চতুর্গুণ সময় অতিবাহিত করতো প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বাহাদুরী নেবার প্রত্যাশায়! গাঁয়ের লোকে আমল না দিলেও তারা যে মোটেই তুচ্ছ নয়, সত্যই জমীদারের বন্ধু—প্রতিবেশীদের মনে শুধু এই কথাটি গেঁথে দেবার প্রলোভনে তারা যেন নিত্য নতুন মহাভারত রচনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। তাদেরই মুখ থেকে প্রজারা জানতে পারতো, যে বিলিতী মদ তারা খায়, তার দাম কত! যে নারীরা তাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে, তারা নাকি সব ভদ্রঘরের....

পাড়াগেঁয়ে লোকেরা প্রথমটা সত্যিই বিস্মিত হতো: এক পাঁট মদের দাম এত টাকা?

—তবে?—বাবুরা তো আগে "ধেনো" খেতেন—আমরাই তো বলে-কয়ে "হোয়াইট লেবেল" ধরিয়েছি!

—ভদ্রঘরের মেয়েরা এত সস্তা আজকাল ?

—সস্তা মানে ?—প্রত্যুত্তরে নিত্য-নতুন নারী হরণের রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করে বাহাদুরেরা বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করতো ; অধিকন্তু খরচেরও একটা কাল্পনিক হিসাব দিয়ে দিত।

শুনে, প্রজারা প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে যেত ! তারপর চেষ্টা করত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে। শেষে, সেই বীভৎস কার্য্যকলাপের কাহিনী-গুলো কল্পনা করে, শুধু যে বিতৃষ্ণার বিষই সঞ্চিত হলো তাদের অন্তরে, তাই নয়, সেই পুঞ্জীভূত ঘৃণার মধ্য থেকে যেন অগ্নিশুদ্ধ হয়েই আত্মপ্রকাশ করল আর একটি সত্য :

এই নরকোৎসবের ইন্ধন জোগাচ্ছে আসলে কারা ? মাত্র কয়েকটি লোকের ব্যাভিচার-বিলাসের খরচ জোগাবার জন্যে সপরিবারে উপবাস করে মরবে হাজার হাজার লোক ? এ কেমন ব্যবস্থা ! কেন এ ব্যবস্থা ! কেন—কেন—কেন ? কে করলে এ ব্যবস্থা ?···ভগবান !

ঈশ্বরবাদীরা বলেন : ডাকার মতো ডাকতে পারলে তিনি শোনেন ! জানার মতো জানতে চাইলে তিনি জানিয়ে দেন !

কথাটা যে কী পরিমাণ সত্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনের এই অট্টালিকাটা !

সিং-দরজা পেরিয়েই বিরাট এক অলিন্দ ! তারপর আরম্ভ হয়েছে গড়বাড়ীর সদর মহল ! এ মহলের বর্ত্তমান মালিক ন' তরফ। সত্যব্রতর

অংশ বাড়ীর একেবারে শেষ প্রান্তে! সে সর্ব্বাগ্রে সেইদিকেই অগ্রসর হলো!

কিন্তু নিজের মহলের সুমুখে এসে আবার বাধা পেল সে। আবার চোখে জল এল তার! মাত্র কয়েকটা বছর বাড়ী আসতে পারেনি সে; —কিন্তু এরই মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে? তার দেউড়ীর খিলানটা অবশ্য আজও অটুট রয়েছে; কিন্তু পথ কোথায়? পিতামহর আমলে এই খিলান থেকে ঝুলতো বত্রিশ-ডালের ঝাড়। পিতার আমলে ঝুলতো একটা বড় সাইজের চতুষ্কোণ আলো! তার আমলেও জায়গাটাকে অন্ধকার করে রাখা হতো না—হ্যারিকেন লণ্ঠনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজ সেখানে বিরাজ করছে নিকষ-কালো অন্ধকারের রাজত্ব! তার দেউড়ীর দু'পাশের ঘরগুলো অবশ্য বহুপূর্ব্বেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পিতামহের আমলের নাচ-ঘরটা তো সেদিনও অটুট ছিল! তারই একাংশে ছিল তার পিতার ড্রইংরুম। সেটাও ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে!

প্রকাণ্ড অট্টালিকাটার আরও কয়েকটা মহল আজও খাড়া রয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন মানুষের সাড়া নেই! পৃথক অন্ন হলেও বংশ তাদের বিরাট! তাদের ছয় সরিকের দু'টি সংসার আজও বাস করে এই বিরাট বাড়ীটারই কোন কোন অংশে। কিন্তু ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কোন কক্ষ থেকে, মৃৎ-প্রদীপের একটা নিস্তেজ শিখাও আজ তাকে পথ দেখাতে সাহায্য করল না!

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুপুরীর মতো নিস্তব্ধ বাড়ীটা হঠাৎ সত্যব্রতর মনে বিভীষিকা জাগিয়ে তুলল। যে আশঙ্কাটাকে এতদিন সে জোর করে

মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল, হঠাৎ সেটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল : মুস্‌লীম্ লীগের প্রত্যক্ষ্য-সংগ্রামের জের এখানেও সংক্রামিত হয়েছে নাকি !

কিন্তু, তাই বা কী করে হতে পারে ! মুসলমানেরা এ অঞ্চলে যে নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ট !

অকস্মাৎ চমকে উঠল সে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা চামচিকি তার মাথায় ঠোক্কর মেরে, দেউড়ীর খিলানে গিয়ে আশ্রয় নিল। সত্যব্রত সন্ত্রস্তভাবে প্রবেশ করল দেউড়ীর মধ্যে।

গড়ের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে, মেজ সরীকের পরিত্যক্ত মহলটার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল বড তরফের এলাকা। সত্যব্রত সেই ধ্বংসস্তূপ অতিক্রম করে নিজের অন্দরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা তার হিম্ হয়ে আসছিল। অথচ তার মহলের অবস্থা পাশের পতনোন্মুখ গৃহগুলির মতো নয়,—গৃহিনীশূন্যও নয় ! কিন্তু, তবুও —সত্যব্রত বিরক্তিবোধ করে—কেন তার এমন আতঙ্ক হচ্ছে নিজের বাড়ীতে ঢুকতে। হঠাৎ দুই মহলের মধ্যবর্ত্তী ছোট একটা গলিপথের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে প্রাচীরে গা ঘষে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গেই আর্ত্তনাদ করে উঠল সে :'রাঙাবৌ—

কেউ সাড়া দিল না।

অতীতের চুনকাম করা দেওয়ালটার গায়ে লম্বা লম্বা শ্যাওলার প্রলেপ পড়েছিল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সেগুলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারলনা সে। কিন্তু, জোনাকীর ক্ষীণ ঝিলিকে সে যেন স্পষ্ট অনুভব করল,

কতকগুলো শরীরী প্রেতাত্মার ভ্রূকুটী! সে দৃষ্টি যেমন কুৎসিত, তেমনি হিংস্র। তারা যেন নীরব-গর্জ্জনে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, তার এই আকস্মিক গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের অবৈধতার বিরুদ্ধে।

সত্যব্রতর আতঙ্কগ্রস্থ মন যেন আরও অসাড় হ'য়ে গেল। সে আবার ডেকে উঠল: রাঙাবৌ—

প্রত্যুত্তরে, সাদা মতো কী যেন একটা চলে গেল সামনে দিয়ে। সত্যব্রতর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই আওয়াজ শুনে বুঝল, সেটা একটা বেড়াল। কথঞ্চিৎ ভরসা পেয়ে আবার সে এগোল।

উঠোনের অপরদিকে ছিল রান্নাবাড়ী। সত্যব্রতর গতি রুদ্ধ হলো তারই রোয়াকে ধাক্কা খেয়ে। ব্যথা পেয়ে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল: রাঙাবৌ—

সাড়া পেয়ে বেড়ালটা এবার একটা জানলা টপকে সশব্দে অন্তর্হিত হলো। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা আওয়াজও কানে এল তার···সেটা কিন্তু বেড়ালের ডাক নয়···

থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল সে: আওয়াজটা অত্যন্ত মৃদু। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেল সে।

একি ব্যাপার! সাময়িক সন্ত্রাস অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে মনের গতি হলো তার ভিন্নমুখী—একি ব্যাপার!

ছয়

বনেদী বংশের রেওয়াজ অনুযায়ী, অবিদ্যা উপাসনার মতো বিদ্যানুশীলনের অভ্যাসটাও ছিল রায়-বংশের বংশগত। প্রবৃত্তিটা হয়তো এষ্টেটের আর্থিক স্বচ্ছলতা বা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভর করে সময়ে-অসময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতো, কিন্তু ধারাটা নিঃশেষে বিলুপ্ত হবার অবকাশ পায়নি কখনও।—সংস্কারটা উত্তরাধিকার সূত্রে সত্যব্রতকেও অর্শেছিল। তাই তাকে আজ থমকে দাঁড়াতে হলো।

ব্যক্তিগত জীবনের অকিঞ্চিৎকর সাধনার ফলে যেটুকু সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, তার সাহায্যেই সে বুঝতে পারল: আওয়াজটা সাধারণ সেতার-সুরবাহারেরও নয়—গমকটাও কোন গৎ তোড়ার অঙ্গীভূত নয়। অতি-কোমল ঋষভের স্পর্শ কৃন্তনযুক্ত গমকের যেটুকু রেশ তার কানে এসে পৌঁছেছিল, সেটা সম্ভবতঃ কোন সন্ধিক্ষণ রাগের বিলম্বিৎ আওচারের একটা ভগ্নাংশ। কিন্তু যন্ত্রটা····?

বীণ্?····সারস্বত বীণ্?

বিস্ময়ের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সে। রায়-রাজাদের এই পরিত্যক্ত শ্মশানে এতদিন পরে বীণকার কে এল! স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো উৎকর্ণ হয়ে থাকে সে। কিন্তু আওয়াজ আর শোনা যায় না।

শরীর-মন আড়ষ্ট করে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকবার পর ভুল ভাঙ্গে তার—স্বপ্নই বটে! কিন্তু আজ তার হয়েছে কী? সঙ্গে সঙ্গেই

আবার ফিরে আসে তার আতঙ্ক ; পূর্ব্বের মতোই আবার সে ডেকে ওঠে সন্ত্রস্তস্বরে : রাঙাবৌ—

আবার যেন ভেসে আসে ঋষভের রেস্। মীড়ের অবরোহ টঙ্কারে যেন তার সর্ব্বহারার বিলাপ!—ক্রন্দন্ তো নয়—স্পর্শে যেন তার মূর্ত্ত হয়ে উঠছে···মূর্ত্তিময়ী মৃত্যু! গমক তো নয়—আঘাতের বৈচিত্র্যে যেন ডুকরে কেঁদে উঠছে···রায়-বংশের রাজলক্ষ্মী!—সত্যব্রত উৎকর্ণ হয়েই থাকে। কিন্তু একটানা ঝিল্লীস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না!

মুহূর্ত্তের হেরফেরে আবার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সে! সাদা-শাড়ী-পরা কে যেন সরে গেল না সামনে দিয়ে! রান্নাঘরের ওপাশ থেকে মৃদু চুড়ির ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কাপড় সামলানোর খস্‌খসানিও যেন কানে আসে তার। ফলে, আবার সে চীৎকার করে ওঠে : রাঙাবৌ—

এবারও কেউ সাড়া দেয় না। কিন্তু নিজের চীৎকারে এবার নিজেই চমকে ওঠে সে! তারপর জোর করে এগিয়ে যায় দোতলার সিঁড়ির দিকে।

তার শোবার ঘরটা ছিল সিঁড়ির ধারেই। ঘর তালাবন্ধ। বারান্দার অপর প্রান্তে ছিল রাঙাবৌয়ের ঘর। কিন্তু সে ঘরও অন্ধকার!—সন্ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এবার একটু দুশ্চিন্তাও মিশল—অঞ্চলটা হিন্দুপ্রধান হলেও, বাড়ীটা নিতান্তই অরক্ষিত! সুযোগ বুঝে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের সেনাপতিরা এখানেও হানা দেয়নি তো!—একটা প্রত্যক্ষ ঘটনার স্মৃতি আরও সন্ত্রস্ত করে তোলে তাকে। Great Calcutta killing-এর গোটা কতক বিভৎস দৃশ্য আবার ভেসে ওঠে তার চোখের সুমুখে। সেদিনও সে এমনি আতঙ্ক নিয়েই অপেক্ষা করেছিল হত্যাকারীর!—গত ১৫ই

আগষ্ট, বহরমপুর জেল হাঁসপাতাল থেকে খালাশ পেয়ে কোলকাতায় এসে পৌঁছয় সে ১৬ই তারিখের অপরাহ্নে।—অবশ্য, মুসলীম লীগের প্রত্যাক্ষ্য-সংগ্রাম ঘোষণার কথাটা সে শুনেছিল, শুধু বুঝতে পারেনি, লড়াইটা তাদের সহিংস এবং প্রতিপক্ষরা হচ্ছে— ইংরাজ নয়—হিন্দু। তাই, শিয়ালদহে নেমে, কোন রকম যান-বাহনের সন্ধান না পেয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল নিকটেই— তার খুড়তুতো ছোটভাই দ্বিজব্রতর মেসে! তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে আরম্ভ করল সহরের অবস্থা! পাঁচজনের পরামর্শে সে পালাতে ভরসা করল না; অপরপক্ষে, অনাহার, অনিয়ম ও একঘেয়ে ট্রেণজার্নির জন্যে, শরারও যেন আর তার বইতে চাইছিল না। ফলে, নিদারুণ অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হতে হলো তাকে। হত্যাকারীর অপেক্ষায় তাকে ৭২ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মেস্‌বাড়ীর পায়খানার পাশে রক্ষিত স্তূপাকার রাবিশ গাদার মধ্যে আত্মগোপন করে সে সচক্ষে প্রত্যাক্ষ্য করেছিল প্রত্যাক্ষ্য-সংগ্রামের সেই পৈশাচিক ক্রীয়া;—সবান্ধব ছোট ভাইয়ের সেই খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহগুলো, —টাটকা রক্তস্রোতের সেই বিরাম-বিহীন প্রবাহ!…সে আবার চীৎকার করতে গেল: রাঙাবৌ—

কী লজ্জা! এতদিন পরে ভূতের ভয় ধরল নাকি তাকে! না হলে, চেষ্টা সত্ত্বেও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না!—বিরক্তিটা তার ক্রোধে পরিণত হলো। কিন্তু—নিজের মহল ছেড়ে রাঙাবৌ গেল কোথায়?

আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সে! বারান্দা অতিক্রম করে, পূর্ব্বপ্রান্তে পড়ে সেজ সরীকের পরিত্যক্ত মহল। তারই রান্নাবাড়ীর একতলার ছাদ্‌ ছিল বড় তরফের বারান্দার লাগোয়া! অন্ধকার অগ্রাহ্য করে

সত্যব্রত সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সেই ছাদ ধরে—ছোট সরীকের অন্দরের দিকে!

কিন্তু ততদূর এগোতে হলনা তাকে। সম্পূর্ণ আশাতীত ভাবে, চোখে পড়ল তার একটা দৃশ্য!—বিস্মিত-কৌতুকে অভিভূত হয়ে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সেজ সরীকেরই সেই পরিত্যক্ত ছাদটার ওপর।

ছাদের উত্তরদিকে অবস্থিত বারো-দুয়ারী ঘরটা—যে ঘরটা একদিন তার সেজকাকার শোবার ঘর ছিল—বহুকালের পরিত্যক্ত সেই ঘরটা থেকে এক ঝলক উজ্জ্বল আলোক ছিটকে বেরিয়ে ছায়াপথ রচনা করেছিল ছাদের ওপর।—খড়খড়ির একটা পাল্লা খোলা ছিল; সেই ফাঁক দিয়ে সত্যব্রতর নজর পড়ল—

রাঙাবৌয়ের ওপর।

পরণে তার চমৎকার করে পরা একখানা সবুজ রঙের মূল্যবান শাড়ী। নিটোল বাহু বেষ্টন করে ব্লাউজের যেটুকু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, বর্ণ তার গাঢ় লাল। বর্ণ বৈচিত্র্যে যা আরও অপরূপ হয়ে উঠেছিল, সেটা হচ্ছে তার ছোট্ট কপালের ওপর সযত্নে আঁকা ছোট্ট তিলকটি! মধ্যমণির লালিমা সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শ্বেত চন্দনের বেষ্টনীতে, যেন, আরও রক্তিম্ আরও রহস্যময় দেখাচ্ছিল! এ ছাড়া চওড়া করে পরা পায়ের আলতার সঙ্গে চওড়া-পাড় শাড়ীর রক্তরেখা তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণকে আরও জ্বলজ্বলে করে তুলেছিল! সর্ব্বপরি, সেই জ্বলন্ত বহ্নিশিখাকে আরও লোভনীয় আরও রমণীয় করে তুলেছিল, রত্নালঙ্কারের মনোহারিত্ব! মনিবন্ধের বরফি চুড়ি; আর্মলেটের ইন্দ্রনীল মীনে; নাকছাবির হীরক দ্যুতি; কণ্ঠহারের চুনী সমাবেশ; কর্ণাভরণের দোদুল্যমান পান্না,—রাঙা-

বৌয়ের দেহ অলঙ্কৃত করে যেন, তারা মহিমান্বিত করে তুলেছিল অলঙ্কারের সংজ্ঞাকে! অথচ, ইতিপূর্ব্বে, বিধিদত্ত বর্ণচ্ছটাটুকু ছাড়া এ সবের কিছুই ছিল না রাঙাবৌয়ের।

ছোট্ট একটা চতুষ্কোণ বাক্সর ওপর ঝুঁকে পড়ে, রাঙাবৌ খুব মনোযোগের সঙ্গে কী যেন একটা করছিল! হঠাৎ সেটার মধ্যে থেকে ক্যাঁক্ করে একটা আর্ত্তনাদ নির্গত হলো। সঙ্গে সঙ্গে, সারস্বত বীণ্ শোনার রহস্যটাও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল সত্যব্রতর কাছে।—ব্যাপারটা ড্রাই ব্যাটারীযুক্ত রেডিয়ো যন্ত্রের কাণ্ড! কিন্তু—

এতদিন পরে এ সব কোথায় পেল রাঙাবৌ! জোগাচ্ছে কে?

—আমি—ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে এল: আমি যে একটা জলজ্যান্ত লোক এতক্ষণ এখানে বসে রইছি, তা···

—কে বসে থাকতে বলেছে! রাঙাবৌ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: শুয়ে পড় না—

—কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায় বলো?

—তাহলে দাঁড়িয়ে থাকো।

—যাঃ চল্লে—

রাঙাবৌ আরও মনোযোগের সঙ্গে রেডিয়োর চাবি ঘোরাতে লাগল। কিন্তু যন্ত্র থেকে বীণ্-এর ঝঙ্কার যত না শোনা গেল তার চাইতে বেশী নির্গত হলো ঘট্ ঘটাং আওয়াজ!

—আঃ দাও না বাপু এটা ঠিক্ করে, প্রোগ্রামটা ফস্‌কে যাচ্ছে যে! রাঙাবৌ যেন হাঁফিয়ে উঠে হাল ছেড়ে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়েই ধমকে উঠল: আবার তুমি অমনি করে চেয়ে আছো আমার দিকে?

—চেয়ে আছি ? কই না তো—

—আবার মিথ্যে কথা ?

—সত্যি বলছি, আমি ভাবছিলাম—

—ভাবছিলে ? কী ভাবছিলে, শুনি ?

—ভাবছিলাম....বক্তা যেন একটু ইতস্তত করে থেমে গেল !

—না সত্যি, কী ভাবছিলে বলতেই হবে তোমাকে !—কৃত্রিম কোপে ভ্রূকুঞ্চিত করে রাঙাবৌ বলল : ভারি অসভ্য হয়ে উঠছ তুমি দিন দিন...

—আরে, না না—বক্তা ব্যস্ত হয়ে বলল : সে সব কিছু নয় ! আমি ভাবছিলাম, জহরের কথা। সেদিন বলছিল...

—কী বলছিল ?—রাঙাবৌ হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

—বলছিল : গৎ-তোড়ার চাইতে, তোমার নাকি আলাপের দিকেই ঝোঁক বেশী ! অথচ, সেতার শিখছ তো মাত্র মাস দশেক...

—তার মানে ?

—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয় ? তোমার এখন ভাল লাগার কথা, হাল্কা চালের গৎ-তোড়া ; রবিবাবুর মিষ্টি সুরের গান, কিংবা নাচের অর্কেষ্ট্রা ! অথচ, তুমি পছন্দ করো আলাপ, বেয়াড়া ঢংয়ের ধ্রুপদ-খেয়াল গান, রেডিয়ো কিনে দিলাম,—কোথায়, আধুনিক বাঙলা গান শুনবে, তা নয়,—বম্বে, দিল্লী হাতড়ে বেড়াচ্ছ, রাগ-রাগিনীর আলাপ শোনবার জন্যে !...তুমি সত্যিই অদ্ভুত রাঙাবৌ !

—হুঁ...মিনিটখানেক কী যেন ভাবল রাঙাবৌ। তারপর বলল : কিন্তু, তোমার ওই বন্ধুটার কাছে আমি আর শিখব না, বলে দিচ্ছি....

—সেকি ? কেন...কী হলো ?

—লোকটা ভাল নয়! বড্ড বিশ্রীভাবে চেয়ে থাকে আমার দিকে....

—সেটা তার দোষ?

—তার দোষ নয় তো কি আমার দোষ?

—নিশ্চয়ই তোমার দোষ!—বক্তা যেন একটু হাসল। বলল: তুমি জন্মালে কেন এই সর্ব্বনেশে রূপ নিয়ে?

—আবার ওই সব কথা?—রাঙাবৌ এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর বলল: আমি কথখোন শিখবো না ওই বদমাইস্‌টার কাছে...

—ছি রাঙাবৌ!—ভাল-মন্দর বিচার ওভাবে করোনা! জহরকে আমি ছোটবেলা থেকে জানি। সে শুধু সৎ নয়—অত্যন্ত সরল! সরল বলেই তো সে সোজা চোখে তোমার দিকে চায়—লুকিয়ে দেখে না।

—আচ্ছা সে নয় হলো। কিন্তু, কী হবে বলতো আমার এত সব শিখে? নাই বা শিখলাম্?

—এমন না হলে আর তোমায় বুদ্ধি! বিনা-মাইনের দাসীবৃত্তি করার চাইতে,—কিছু একটা শিখে, স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করাটা ভাল নয়?

—ইস—আমি গেলাম আর কি চাক্‌রী করতে!...তুমি আছো কী করতে?

—আমি? আমি হয়তো কালই মরে যেতে পারি...

—আবার?—রাঙাবৌ ধম্‌কে উঠল; তারপর আবার ঝুঁকে পড়ল রেডিয়োটার ওপর।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। আড়চোখে বক্তার দিকে তাকিয়েই রাঙাবৌ আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল: ফের, চেয়ে আছো অমনি করে?

—বাঃ চেয়ে আছি কী রকম ? আমি তো ভাবছিলাম···

—ভাবছিলে ? ইয়ার্কী হচ্ছে ?

—আরেঃ—সত্যিই ভাবছিলাম !

—বেশ, কী ভাবছিলে বল—

—সে, নাই বা শুনলে।

—দেখ, আমায় রাগিয়ো না বলছি ! বল বলছি শীগগীর···

—ভাবছিলাম····তোমার স্বামীর কথা—

রাঙাবৌয়ের সমস্ত উত্তাপ যেন নিমেষে অন্তর্হিত হলো ; নীরবে, বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল সে !

—লোকটা এদিকে যত বড় স্কাউনড্রেল হোক না কেন, এক দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে তার রুচির মিল ছিল কিন্তু। শুনেছিলাম—লোকটা সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে খুব নাম করেছিল ! কী সব আলাপ-টালাপ নাকি খুব ভাল করতে পারতো !

রাঙাবৌ পূর্ব্বের মতোই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হ'লো ?—বক্তার স্বরে এবার যেন একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল : অন্যায় কিছু বলেছি ? রাগ করলে ?

—নাঃ রাগ করবে না—আদর করবে। বিরক্তিভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাঙাবৌ আবার রেডিয়োতে মনোনিবেশ করল। তারপর চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল : বললাম এটা ঠিক করে দাও, তা নয়, কোত্থেকে যত সব বাজে কথা পেড়ে বসল···

—আরে, ঠিক করবার হলে কি আর বেঠিক থাকতো এতক্ষণ ? ওকে হাঁসপাতালে দিতে হবে। কাল···দাঙ্গা যদি থামে····কাল কলেজ

যাবার সময়ে দিয়ে আসব'খন! এখন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো, মাথাটা টিপে দাও দেখি একটু!

—কেন?

—ধরেছে যে!

—মাথা ধরেছে, ডাক্তার দেখাও।

—মাথা-ধরার জন্তে ডাক্তার! লোকে শুনলে বলবে কী?

—লোকের কথার ধার ধারো নাকি তুমি?

—বাঃ সমাজে বাস করছি যখন,—ধার ধারতে হবে বৈকি!

—আর. আমি বুঝি সমাজে বাস করি না?

—নিশ্চয়ই বাস করো!

—তবে?

—কী তবে?

—এই .ভর-সন্ধ্যেবেলায়, যদি তোমার মাথা কোলে করে বসতে হয়, তাহলে?

—কী তাহলে?

—লোকে নিন্দে করবে না?—রাঙাবৌ আবার ধমকে উঠল!

—নিন্দে? আড়ালে রাজার মাকেও তো লোকে নিন্দে করে! তাই বলে, সেই সব লোকের কথা শুনতে হবে নাকি?

—হবে! রাঙাবৌয়ের কণ্ঠস্বরে পূর্ব্ব-তারল্যের আর লেশ মাত্রও ছিল না; বেশ গম্ভীর হয়েই বলল : নিজেকে তো আর শুনতে হয় না! —হলে বুঝতে!

—ইতিমধ্যে, শুনেছ নাকি কিছু?

—সব সময় শোনবার দরকার হয় না—মুখ দেখেও বুঝতে পারা যায়!

—ওঃ তোমার নিজের বুদ্ধিতে বুঝেছো! বক্তার স্বরেও এবার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হলো: জীবনের প্রায় তিরিশটা বছর তো এই বুদ্ধি নিয়েই সব বুঝে এসেছো! কিন্তু বিনিময়ে, পেয়েছো কী? গু গোবর গঙ্গাজল আর সতী-সাবিত্রীর ধর্ম্ম, এই তো তোমাদের আদর্শ নারীত্বের মাপকাঠি! কিন্তু, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে, ভেবে বলো তো, এই আদর্শের বালাইগুলো তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে না দিলে, ওই সব ধর্ম্ম-প্রাণ লোকগুলোর কী পরিমাণ টাকা খরচ হতো ঝি-চাকর, রাঁধুনী, মেথরাণী পুষতে!

—কিন্তু—রাঙাবৌয়ের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল। বলল: কিন্তু সত্যিই তো এ সব আমাদের ভাল নয়!

—আমাদের ভাল-মন্দটা, আমাদের নিজেদের হাতে থাকাটাই কি সব চাইতে ভাল নয়? মনের অগোচরে তো আর পাপ নেই! তবে, কেন তুমি মনকে চোখ ঠারবে, বল?

নতমুখী রাঙাবৌ চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে সত্যব্রতর সন্দেহ হলো—বক্তব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে না পেরে সে যেন দিশেহারা হয়ে গেছে!

—হঠাৎ তোমার মাথায় এ সব কথা আসছে কেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি! সংস্কার বড় বালাই! তোমার স্বামীর নাম করাটা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু তুমিই বলতো রাঙাবৌ—পূর্ব্বেকার মতো গু-গোবর আর গঙ্গাজল নিয়ে মেতে উঠলে,

লোকের সন্দেহটাকেই সত্যি করে তোলা হবে না কী? তোমার বুদ্ধি কী বলে?

রাঙাবৌ চুপ করে রইল।

—গোটাকতক পাড়াগেঁয়ে ভূতের ভয়ে নিজেকে তুমি এইভাবে নষ্ট করে ফেলতে চাও রাঙাবৌ?—সত্যিই চাও?

এবারও রাঙাবৌ কথা কইল না।

—রাঙাবৌ তুমি তো জান—বক্তার কণ্ঠস্বরে এবার কেমন যেন একটা ক্লান্তির ভাব ফুটে উঠল। বলল: তোমাদেরকে শুধু মেয়ে মানুষ বলে মনে করতে আমি কিছুতেই পারিনা। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও আমি জোর করে কিছু করিনি কখন করবোও না।

—ওকি, যাচ্ছো কোথায়?

—লাইব্রেরীতে।

রাঙাবৌ ব্যস্ত হয়ে বলল: না না আর লাইব্রেরীতে যেতে হবে না। অত পড় বলেই তো মাথা ধরে—

—ঠিক উল্টো! মনের মতো সাবজেক্ট পেলে আমার মাথাধরা সেরে যায়।

—যেতে হ'বে না, বলছি না!—রাঙাবৌ হঠাৎ ধমকে উঠল।

—হুকুম?

—হ্যাঁ, হুকুম।

—কিন্তু লোকে যে নিন্দে করবে!

—আচ্ছা গো মশাই আচ্ছা! —রাঙাবৌয়ের ভাবান্তরটা

একেবারে অন্তর্হিত না হলেও, কণ্ঠস্বরের তারল্যটা আবার যেন ফিরে এল। বলল : বক্তৃতা থামিয়ে এখন শুয়ে পড় দেখি লক্ষ্মীছেলের মতো···

—ধমক খেয়ে আমার মাথা-ধরা সেরে গেছে।

—আবার কথা কয়!—স্নিগ্ধকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে রাঙাবৌ বলল : মাথা ধরেছে না খারাপ হয়ে গেছে!···শীগ্‌গীর শুয়ে পড়ো! দাঁড়াও, আগে জানলাটা খুলে দি—

রাঙাবৌ জানলার দিকে এগোবার উপক্রম করতেই সত্যব্রত চট্ করে সরে এল; থামল গিয়ে, একেবারে নিজের মহলে। সমস্ত শরীরটা তার তখন ঝিম্ ঝিম্ করছিল। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করল—একটা আকস্মিক দৌর্ব্বল্যের প্রভাবে, তার চিন্তাশক্তিটা পর্য্যন্ত কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। কিন্তু—

লোকটা কে?

যেই হোক, এ অবস্থায় রাঙাবৌয়ের কাছে আত্মপ্রকাশ করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কে ওই লোকটা?

লোকটা কে,—তাই জানবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। ফলে—ঔচিত্যের রন্ধ্রপথ দিয়ে আর একটা প্রশ্ন অদৃশ্য হয়ে গেল।—আবিষ্কারটা যে সে নিজে চোরের মতো আত্মগোপন করে করেছে, সে কথাটা তার মনেই পড়ল না!

ইতি কর্ত্তব্য স্থির করবার মতো মনের অবস্থা আর তখন তার ছিল না। আতঙ্কগ্রস্থ, পরিণাম-সন্দিগ্ধ রোগীর মতো সে আবার ধীরে ধীরে সদর মহলের দিকেই এগিয়ে চলল। কিন্তু বেশী দূর যেতে হলো না

একটা গোলমাল তার কানে এল। প্রথমে ক্ষীণ, তারপর স্পষ্ট, তারপর একেবারে যেন ফেটে পড়ল :

—বাড়ীতে মোচরমান ঢুকেছে, সব দেউড়ীগুলো আটকে ফেল।... পাড়ার সকলকে খবর দাও...কেউ থানায় যাক্ না সাইকেলটা নিয়ে... খাজনাখানার বন্দুকগুলো কোথায়....

সত্যব্রত অভিভূতের মতো সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

সম্বিৎ ফিরল, একাধিক টর্চের অভ্যগ্র ঝল্‌কানিতে—অসংখ্য কণ্ঠের অবিশ্রান্ত প্রশ্নের তাড়নায়। লম্ফ-ঝম্ফটা বেশী দেখা যাচ্ছিল পাহারাদার রামফল চৌবেরই। খানদানী খুনীর মতো সড়্‌কী আস্ফালন করে সে যা বলছিল তার ভাবার্থ :

—এক মিনিট মাত্র—এক মিনিটের জন্যে আমি পিসাবখানায় গিয়েছি, আর শালা সেই ঝোঁকে ঢুকে পড়েছে। আরে বাবা, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে, এমন মুসলমান দুনিয়ায় কেউ আছে নাকি? তাই, শালাকে মজাসে ঢুকতে দিয়ে আমি চলে গেলাম আপনাদের খবর দিতে! নেমে আয় শালা, আজ তোকে কোরবানী করবো...

বলা বাহুল্য বীরপুরুষদের এগোবার সাহস কারুরই ছিল না; সকলেই সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছিল!

—উঃ শালা কী শয়তান, ঠিক খবর রেখেছে : বাড়ী আজ ফাঁকা; সকলে গেছে মুকুজ্জে বাড়ীর মীটিং শুনতে! আরে আমি আছি কী করতে? নেমে আয় শালা—রামফল চৌবে ক্রমাগত তড়পে চলেছিল!

সত্যব্রতও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল! অবিশ্রাম, এক তরফা কাঁচা খিস্তির বর্ষণে পরিস্থিতিটা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে তার উচিত ছিল কৌতুকবোধ করা; কিন্তু সে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল ভীড়ের মাঝখানে সুব্রতকে দেখে!— ও হঠাৎ এখানে এল কী করে?

সেজ সরীকের একমাত্র বংশধর সুব্রত—এ বংশের ব্যতিক্রম! রায়-বংশের দারিদ্র্য তাকে সহ্য করতে হয়নি লক্ষপতি মাতামহের স্নেহাতিশয্যের জন্য; কোলকাতার কেরাণী-তৈরির আড়তে যাওয়ার দুর্ভাগ্যও তার হয়নি, যেহেতু, কেম্ব্রীজে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের অর্থ-সম্পদ তার প্রচুর ছিল, নীচুতলার কোন কিছুর সংস্পর্শে আসবার সম্ভাবনাকে সে তৎপরতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছে—কারণ, বিলিতী আভিজাত্যের আবাল্য মোহটা তার সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল!

সেই সুব্রত—যে বছর পাঁচেক আগেও অনর্গল বাঙলা বলতে গিয়ে অসংখ্যবার ইংরিজীর হোঁচট খেতো; পাণ্ডিত্যাভিমানে সঙ্কুচিত হয়ে—মার্জ্জিত রুচির পালিশ ক্ষয়ে যাবার ভয়ে—যে, পারতপক্ষে পৈত্রিক ভিটেতে পদার্পণ করতো না, যে সযত্নে বর্জ্জন করে চলতো নিকটতম আত্মীয়দেরও সংসর্গ—সে হঠাৎ এখানে এল কী করে? ওর তো থাকবার কথা ইংলণ্ডের হ্যাম্পষ্টেডে কিংবা রাসেল ষ্ট্রীটের মাতুলালয়ে।....

অসংখ্য প্রশ্নবাণের প্রত্যুত্তরে নিরঙ্কুশ নীরবতা জনতামাত্রকেই উন্মাদ করে তোলে। ফলে, সত্যব্রতর দৈহিক নিরাপত্তা বিপন্ন হবার উপক্রম করল। তাকে শেষবারের মতো আর একবার জিজ্ঞাসা করা হলো: সে কে? কী মৎলবে ঢুকেছে এ বাড়ীতে?

সত্যব্রতর মাথায় তখনও সুব্রত ঘুরছিল।

—ওরে....উত্তর দে না! খিঁচিয়ে উঠল আর এক সরীক ইন্দ্রব্রত : হাঁ করে দেখছিস্ কী রে....?

—দেখছি—অগত্যা সত্যব্রত বলল : তোমাদের মুখ খিস্তির দৌড়টা! আরও কাঁচা রকমের কিছু জান না?

এবার জনতার অবাক হবার পালা!

—তোমাদের সদ্য স্বাধীন দেশের এইটেই আধুনিক সভ্যতা নাকি?

—তুমি কে?

—আমি? তোমরা যেখানে ট্রেস্পাস্ করেছো, সেই বাড়ীর মালিক!

এর পরের ব্যাপার মিলনান্তক নাটকের শেষ দৃশ্যের অনুরূপ।

সত্যব্রতর ঘুমের দরকার ছিল; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সফলকাম হ'লো না। গত রাত্রে, তাকে নিয়ে শুধু বাড়ীর লোকেরাই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেনি; তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জানতে অনেক কৌতূহলী প্রতিবেশীও ছুটে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে যখন সে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেল—রাত্রি তখন অনেক হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে বিছানায় শুয়ে যতই সে ভেবেছে : শরীর তার ক্লান্ত; অতএব যথেষ্ট পরিমাণে নিদ্রার প্রয়োজন; ততই শারীরিক প্রয়োজনের উৎকণ্ঠাটা তার মানসিক অস্বস্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে, ব্যাহত করেছে ঘুমের সম্ভাবনাকে। শেষ পর্য্যন্ত সে ভেবেছিল : ভোরের হাওয়া গায়ে লাগলে অবশ্যই তার ঘুম আসবে; কিন্তু তার সে আশাও বৃথা হলো রাঙাবৌ আর সুব্রতর চিন্তায়।

পূর্ব্বাপর

গত সন্ধ্যায় কে মাথা ধরার অজুহাতে রাঙাবৌয়ের সাহচর্য্য কামনা করছিল! সুব্রত নিশ্চয়ই! তার বাপের শোবার ঘরে সে ছাড়া আর কে ঢুকতে যাবে! কিন্তু ব্যাপারটা গড়িয়েছে কতদূর?

শ্রদ্ধার পাত্রী সম্বন্ধে কুৎসিত কিছু কল্পনা করতে প্রবৃত্তি হয় না তার; কিন্তু রাঙাবৌয়ের জীবনে যে অতি ভয়ঙ্কর রকমের একটা পরিবর্ত্তন এসেছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। অথচ এই সুব্রতকে রাঙাবৌ এক সময়ে কী ঘৃণাই না করতো—তার নাস্তিকতার জন্যে!

কিন্তু ও ছোঁড়াটা—এত জায়গা থাকতে এখানে মরতে এল কেন?

অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর সে গত রাত্রেই পেয়েছিল! খেতে বসে পারিবারিক আলোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং সুব্রতই তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল: বছর দেড়েক পূর্ব্বে তার মাতামহ গত হ'য়েছেন; বিষয়ের ওয়ারীসন এখন মামাতো ভাইয়েরা। তাই······

অর্থাৎ মাতুলালয় থেকে বিতাড়িত হ'য়েছে সুব্রত; কিন্তু তা হ'লেও নিজেও সে তো কিছু কম্ উপার্জ্জন করে না! কোলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে, সপ্তাহে চারদিন লেকচার দেবার বিনিময়ে সে নাকি মাসিক পারিশ্রমিক পায় সাত শো' টাকা।—এ অবস্থায় ফ্লীট ষ্ট্রীটে ফ্ল্যাট ভাড়া না করে সে পৈত্রিক ভিটেকে ধন্য করতে এলো কিসের জন্যে!

রাঙাবৌয়ের আকর্ষণে নিশ্চয়ই! কিন্তু—ব্যাপারটা কি সত্যিই··· অতদূর গড়িয়েছে? সত্যব্রতর যুক্তিবাদী মন ক্রমাগতই তৎপর হ'য়ে ওঠে কার্য্য-কারণ বিশ্লেষণে। ঢাকা হাঁসপাতালে থাকবার সময়ে রাঙাবৌ প্রায়ই তাকে লিখত: আমার জন্যে তুমি কোন রকম দুশ্চিন্তা করোনা! কোন অসুবিধে নেই আমার!—যতদূর মনে পড়ে প্রবীরও যেন তাকে

এই ধরণের কী সব লিখেছিল! কিন্তু, সুব্রত যে এ বাড়ীতে এসে বস-বাস আরম্ভ করে দিয়েছে, এ খবরটা রাঙাবৌ তাকে জানাল না কেন?—এত বড় একটা সংবাদ গোপন করবার তাৎপর্য্য কী? আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজের সন্দেহের যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারেনা সে। সঙ্কোচ বোধ করে—চোখ রাঙিয়ে ওঠে আবাল্যের সংস্কার: এও কি কখনও হয়? ফলে, তর্কের সমুদ্র উত্তাল হ'য়ে ওঠে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ-ভঙ্গে সৃষ্টি হয় শুধু বহু-বিচিত্রের; সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আর হ'য়ে ওঠে না; সমস্যা হ'য়ে ওঠে আরও ঘোরাল....

—সতু উঠেছে নাকি?—মাথার দিক্‌কার খোলা জানলা দিয়ে সুব্রতর কণ্ঠস্বর শোনা যায়: খবর পেয়ে অনেকেই দেখা করতে এসেছে।—

প্রত্যুত্তরটা বুঝতে না পারলেও, শাড়ীর খস্‌খসানি শুনে সত্যব্রত অপর পক্ষের অস্তিত্বটা অনুমান করে নিতে পারল!

—আচ্ছা, ওদের তা'হলে একটু বসতে বলি।—সুব্রতর আর কোন কথা শোনা গেল না। তখন, অগত্যা, সত্যব্রতও ঘুমের আশা ত্যাগ করে উঠে পড়ল।

—ঘুম ভাঙ্গল!—সদ্যস্নাতা রাঙাবৌ বারান্দার রেলিঙে কাপড় মেলে দিচ্ছিল; সত্যব্রতকে ঘরের দরজা খুলতে দেখেই এগিয়ে এল সহাস্যমুখে। বলল: আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, তোমার ঘুম ভাঙ্গতে আজ দেরী হ'বে!

রাঙাবৌয়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে সত্যব্রতর সব যেন গোলমাল হ'য়ে গেল! মুহূর্ত্তের হেরফেরে, সে যেন আবার ফিরে পেল পূর্ব্বেকার সেই

রাঙাবৌকে। সেও হাসিমুখে বলল: ঘুমোলাম কখন যে, ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হবে!

—যাঃ সত্যি?

—প্রমাণ চাও? কিছুক্ষণ আগে সুব্রত আসেনি আমার খোঁজে?

—তা বলে, বাসি-মুখেই যেন বাইরে চলে যেও না!—রাঙাবৌ গম্ভীর হ'বার চেষ্টা করতে করতে বলল: বরং ব্যাগার-খাটাগুলো বন্ধ ক'রে নিয়ম মতো খাওয়া-দাওয়া করো দিন কতক! বুঝতে পারছো?

—আশাকরি বুঝতে পারবো! সত্যব্রতও গম্ভীর হ'য়ে জবাব দিল!

—ইয়ার্কী হচ্ছে?—রাঙাবৌ ভ্রূকুঞ্চিত করল। তারপরই ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল: আ-হা-হা, বাবুর চেহারা যা খোলতাই হ'য়েছে··· কে বলবে যে রায়-বাড়ীর ছেলে!····যান্, আর দেরী না ক'রে, হাত মুখটা ধুয়ে আসুন দয়া করে!

—যে আজ্ঞে!

সানন্দে গুণগুণ করতে করতে সত্যব্রত কলঘরে গিয়ে ঢুকল! রাঙাবৌয়ের পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর শুনে পর্য্যন্ত সে যেন আশ্চর্য্য রকমের স্বস্তিবোধ করছিল মনের মধ্যে। অনেকটা যেন, স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন বলে চিনতে পারার সান্ত্বনা!—আত্মনিপীড়নের নাগপাশ থেকে নিস্তার লাভের শান্তি! সদ্যস্নাতা রাঙাবৌয়ের কল্যাণীরূপটি আবার ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সুমুখে। হাস্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি যেন সস্নেহে তাকিয়ে আছে তার দিকে! অথচ, কী-ই বা সম্পর্ক তার এ বাড়ীর সঙ্গে! পিসতুতো বড় ভাই বাসব রায়ের পরিত্যক্তা স্ত্রী! বাস্তবিক বিচারে, এতাবৎকাল আশ্রিতা আত্মীয়া হিসাবেই প্রতিপালিত হয়েছে, বড় সরীকের দাক্ষিণ্যে!

কিন্তু সে দাক্ষিণ্যের জন্য কোন তরফেই কোন রকমের লজ্জা—কোন রকম হীনতা প্রশ্রয় পায়নি। কারণ—তুচ্ছকে তুচ্ছজ্ঞান বার মতো গুণ রাঙাবৌয়ের ছিল। বরং তার শাশুড়ী—সত্যব্রতর পিসিমা—নিজের জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, যে অপরের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করবার দৌর্ব্বল্য প্রায়সঃই দমন করতে পারতেন না। কিন্তু পুত্রবধূর স্নিগ্ধ ব্যবহারে, শাশুড়ীর অপরাধ ভুলতেও বেশী দেরি হ'তোনা লোকের। নিজের মহিমায় এমনই মধুর ছিল রাঙাবৌ। অথচ—

কাঁটার মতো কী যেন একটা খচ্ খচ্ করে ওঠে বুকের মধ্যে! অনুযোগ করবার মতো কিছুই কি নেই রাঙাবৌয়ের?

যাকে বলে, জন্ম দুঃখিনী, সেই শ্রেণীর মেয়ে রাঙাবৌ। কুমারী অবস্থায় অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে ছিল সে—জমীদার বাসব রায়ের স্ত্রী হ'তে পেরেছিল শুধু রূপের দৌলতে!—বিবাহের ফলে, দু'বেলা পেট ভরে খাবার সমস্যা হয়তো তার মিটেছে। কিন্তু····

মাতৃজাতির মনের কথা বুঝতে পারেনা সত্যব্রত। কিন্তু অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা বোধ করে মনের মধ্যে: নিশ্চিন্ত উদর কি নিঃস্ব হৃদয়ের ভার লাঘব করতে পারে?

অঘটনটা ঘটেছিল প্রধানত সত্যব্রতরই স্বর্গীয় পিতার আগ্রহাতিশয্যে। বছর ত্রিশ পার করে দিয়েও যখন বাসব রায় সংসার করল না; পরন্তু মকারান্তের চর্চ্চায় আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠল, তখন পিতৃহীন ভাগ্নের ভবিষ্যৎ ভেবে মামারা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না! শূন্যগোলার অতিখ্যাত রায়বংশের কুলতিলক তাঁদের ভাগ্নে—অন্ততপক্ষে বংশরক্ষার

অজুহাতেও তার একটা বিবাহ দেওয়া দরকার!—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তাঁরা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন!

অতঃপর প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হলো স্বর্গীয় রায় শুভব্রতর চেষ্টাতেই! প্রতিভা ছিল তাঁর; তাই তিনি খুঁজে খুঁজে এক অতি দরিদ্র সংসার থেকে রাঙাবৌয়ের মতো একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা জোগাড় করে ফেললেন। তারপর শুভদিনে ভাগ্নের বিবাহ দিয়ে জাহির করলেন: এক ঢিলে দুই পাখী মারা হ'লো!

অচিরেই প্রমাণ পাওয়া গেল, শুভাকাঙ্খী মাতুলের মৎলবটা ফলবতী না হ'লেও একেবারে ফেঁসে যায়নি! বিবাহের কিছুদিন পর থেকে বাসব রায়ের মকারান্ত চর্চ্চায় সত্যই যেন একটু ভাঁটা পড়ল! বাস্তবিক সংসারের খোঁজ খবর নেওয়ার সুমতি জাগল তার। তারপর স্থাবর অস্থাবরের হিসাব নিকাশ শেষ করে দিয়ে, একদিন রিক্তহস্তে পরামর্শ চাইতে এল শুভাকাঙ্খী মাতুলদের কাছে!

এতখানি কেউ আশা করেনি!—করা সম্ভবও নয়; কারণ উকীল এ্যাটর্নী আর মাড়োয়াড়ী মহাজনদের কার্য্যকলাপের রহস্য কেবলমাত্র কাজের কাজী খলিফারা ছাড়া অপর কারুর টের পাওয়ার কথা নয়! সুতরাং সব শুনে শুভাকাঙ্খীরা বললেন: তাইতো—

বাসব রায়ের সম্ভবত ধারণাই ছিল না—ছোট্ট ওই তাইতো কথাটার মধ্যে বিশ্বরূপ দেখার মতো একটা মারাত্মক ব্যাপার প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। ফলে, অনুরূপ অবস্থায় তার মতো লোকের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক, সে তাই করে গা ঢাকা দিল। অর্থাৎ তার এক গেলাসের ইয়ার সেই কাপ্তেন-ধরা এ্যাটর্নীটাকে খুন করে নিরুদ্দেশ হলো। ওদিকে তার বালিকা বধূ

তখন দ্বিরাগমনের অপেক্ষায় পিতৃগৃহে বাস করছিল! কিন্তু মেয়েকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াবার জন্যে কেউ চরিত্রহীনের সঙ্গে বিয়ে দেয় না। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে পিতৃত্বের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের সংস্কার সব কিছুই ভেসে গেল! বালিকা রাঙাবৌকে বাধ্য করা হলো শ্বশুর-বাড়ী যেতে!

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীও ইতিমধ্যে বিকিয়ে গিয়েছিল দেনার দায়ে; ছিলেন শাশুড়ী! তিনি অগত্যা ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর সন্তান সংক্রান্ত যাবতীয় অঘটনের দায়িত্ব "অলক্ষ্মী" পুত্রবধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারস্বরে অনুশোচনা করে গরম করে তুলেছিলেন গড়-বাড়ী! সেই শাশুড়ীরই সেবার অজুহাতে রাঙাবৌকে মামা শ্বশুর-বাড়ীতে ঢুকতে হ'লো!

রাঙাবৌয়ের বয়স ছিল তখন অল্প। কিন্তু রায় শুভব্রতর গৃহিণীহীন সংসারে আশ্রিতা হবার প্রথম দিন থেকে—শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে সে কৃতিত্বের সঙ্গে হাঁড়ি ধরেছিল—সে কৃতিত্ব তার আজও অটুট আছে! তারপর প্রাকৃতিক নিয়মে এ বংশের কত পরিবর্ত্তন ঘটেছে! রায় শুভব্রত আজ স্বর্গত! তাঁর আরও পাঁচটি সহোদরও আগে পরে অনুগমন করেছেন তাঁকে! তাঁদের সঙ্গে পৈত্রিক জমিদারীও গেছে সহমরণে। স্মরণযোগ্য যা কিছু সব কিছুর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে পরিবর্ত্তনের বন্যাস্রোত। শুধু পরিবর্ত্তন আসেনি এ বাড়ীর গৃহিনীর জীবনে।—সত্যব্রত অনুতপ্ত হয়: সেই রাঙাবৌ সম্বন্ধে সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল! কিন্তু, কেমন করে পারল সে! সারা রাত্রি জেগে চিন্তা করেছে সে—রাঙাবৌ বদলে গেছে। কিন্তু, কই একবারও তো

তার মনে হয়নি, আসলে, বদলে গেছে সে নিজে! নাহলে, শ্রদ্ধার পাত্রী সম্বন্ধে এ ধরণের চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারল কী করে? অজুহাত তার—রাঙাবৌয়ের গতিবিধিতে চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে উঠেছে; দেহে উঠেছে বহুমূল্য আভরণ! কিন্তু এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছুই নেই! ঈশ্বরেচ্ছায় বছর খানেক পূর্ব্বে গত হয়েছেন তার খাণ্ডারনী শাশুড়ী। সুদীর্ঘকালের ক্রীতদাসীত্ব থেকে হঠাৎ মুক্তি পেলে, যে কোন লোকের পক্ষেই তো আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক! আর বহুমূল্য আভরণ? রাঙাবৌয়ের বর্ত্তমান অভিভাবক সুব্রত এবং সে সত্যব্রতর মতো দরিদ্র নয়! সুতরাং এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।—অনুশোচনার আতিশয্যে চোখে জল আসে তার; মনে পড়ে পুরোণ কথা: তার বড় দুঃখের দিনের সাথী এই রাঙাবৌ! নিজের মাকে হারিয়েছে সে বালক বয়সে; পিতা ছিলেন খাম-খেয়ালী প্রকৃতির অসংসারী লোক; কটুভাষিনী পিসিমাকে সে ঘৃণা করতো; কেবল রাঙাবৌ ছিল তার সহায়-সম্বলহীন জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। সেদিন বয়সে ছিল সে নিতান্তই বালিকা; কিন্তু সেই কিশোরীর মধ্যেই সে অনুভব করেছিল—একাধারে, স্নেহময়ী জননীর বিরাট দায়িত্ববোধ; কল্যাণী বড় বোনের কঠোর শাসন; এবং খেলার সাথী বৌদিদির পরিহাস তরল স্নেহ-প্রবণতা।

সাত

জলযোগের বিরাট আয়োজন ক'রে রাঙাবৌ সত্যব্রতকে খাওয়াতে বসেছিল; ঘরে ঢুকল সুব্রত। বলল : কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—ওমা, এখনও বসে আছে তারা? প্রশ্ন করল রাঙাবৌ।

সুব্রত হেসে বলল : নিশ্চয়ই! গ্যালন দুয়েক চা টেনে বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বসে আছেন তাঁরা।

এ সব ব্যাপারে সত্যব্রত চিরদিনই একটু বেশী উৎসাহী; কিন্তু আজ যেন বিরক্ত হলো। এঁদের এই শুভাগমনের আসল উদ্দেশ্যটা যে কি, তা তার বুঝতে যে আর বাকি ছিল না। কিন্তু গত রাত্রি থেকে, ক্রমাগত একই কাহিনীর পুনরুক্তি ক'রে ক'রে সে সত্যিই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। বিশেষত, এতদিন যে সে আয়ুক্ষয় করে বন্দীজীবন যাপন ক'রে এল, সে কি এই গল্প-বাগীশ অপদার্থগুলোর মজা-মারবার খোরাক যোগাবার জন্যে?—সে একটু বিরক্ত হ'য়েই বলল : ওঁদের কাজ-কর্ম্ম নেই?

সুব্রত বলল : তা ঠিক জানিনা। তবে, দাঙ্গার জন্যে বাইরে বেরুবার উপায় নেই।

—তাই—কথার জের টেনে সত্যব্রত বলল : আমার সময় নষ্ট করতে এসেছেন দয়া করে।

—তোমার আজ হ'লো কী?—রাঙাবৌ বলে উঠল: চিরদিনই তো এই সব ক'রে এসেছ ওদের নিয়ে; আজ যেন বিরক্ত হচ্ছো বলে মনে হচ্ছে।

—সত্যি, আজ আর এ-সব ভাল লাগছে না!

—কী সব?

—কাজের নামে বাজে আড্ডা।—দেশোদ্ধারের নামে পলিটিক্যাল কচ্‌কচি—

—পলিটিক্‌স্‌-এ বিতৃষ্ণা?—সংবাদটা যেন ভূতের মুখে রাম-নামের মতোই অভাবনীয়। সুব্রত হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

সত্যব্রত আবার বলল: জীবনে অনেক নোংরা ঘেঁটেছি আর নয়···

—নোংরা? পলিটিক্‌স্‌?—সুব্রত বলল: এতদিন পরে বুঝতে পারলে?

সত্যব্রত সুব্রতর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল; সেই হিসাবে বড় দাদা। তাই, কনিষ্ঠের উক্তিটা বক্রোক্তি কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে, সে জ্যেষ্ঠের গাম্ভীর্য্য নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করল।

ইতিমধ্যে রাঙাবৌও মুখে আঁচল চাপা দিয়েছিল। হঠাৎ আঁচল সরিয়ে ভাল মানুষের মতো বলল: তোমার আবার কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

খাওয়া থামিয়ে সত্যব্রত কটমট্ ক'রে তাকাল রাঙাবৌয়ের দিকে।

—না, তাই বলছি—রাঙাবৌ আবার বলল: ওগুলো ফেলে রেখোনা —পেটভরে খেয়ে নাও। দেশোদ্ধারের ঠ্যালায় কত বেলা হবে তা কে জানে!

—ইয়ার্কী হচ্ছে ?

—ওমা, তুমি কি আমার ইয়ার্কীর লোক !

—বলি—সত্যব্রতর গাম্ভীর্য্য নষ্ট হ'বার উপক্রম করছিল ;. তবুও ভারিক্কী-চালে বলল : বয়সটা কমছে না বাড়ছে ?

—কার ?

—নাঃ হোপ্‌লেস্‌—

—কে ?

এবার সত্যব্রত হেসে ফেলল।

গতকাল, সত্যব্রতর অভিমান হয়েছিল—কম্‌রেড্‌ প্রভাতীকে অভ্যর্থনা করার ঘটা দেখে!—তার এতদিন আটকে থাকার পরিণাম হলো এই! আজ আর কেউ তাকে চিনতেই পারছে না!—এমনই অকৃতজ্ঞ দেশের এই লোকগুলো!—কিন্তু, মাত্র চোদ্দ ঘণ্টা পরেই, আর একটা অজুহাত খুঁজে পেয়ে সে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করল! চিঠির গোলমালের জন্য তার প্রত্যাবর্ত্তনের খবরটা তখন সত্যই তো কেউ জানতো না;—আজ জেনেছে তাই দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট হ'লো—উদ্দেশ্যটা সকলেরই গতানুগতিক নয়! তার নির্ব্বাসিত জীবনের কাহিনী শোনাটা গৌন হ'য়ে গিয়ে, মুখ্য হ'য়ে উঠেছিল, বিভিন্ন ব্যাপারে তার সাহায্য-লাভ ও নির্দ্দেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যটা :

দাঙ্গা দুর্গতদের সমস্যা—

তাদের পুনর্বসতি ও সাহায্য-দানের পরিকল্পনা—

দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যবর্ত্তী উপচীকীর্ষুদের দালালী তথা চুরী বন্ধ করবার উপায়—

সার্ব্বজনীন পূজোর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফল তথা দলাদলির পরিণাম—

পুরোন পলিটিক্যাল পার্টিগুলোতে ভাঙ্গন ধরবার কারণ; সদস্যদের সাবেক পার্টি ত্যাগ করে নতুন নতুন পার্টি গড়বার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ—

রায়-কর্ত্তাদের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়টার ভাঙ্গন-নিরোধের উপায়! স্কুলটার উন্নতির জন্যে এ অঞ্চলের নবীন ও প্রবীণের দল যে রকম নিদারুন প্রতিযোগীতা আরম্ভ করে দিয়েছে, তাতে, প্রতিষ্ঠানটার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—

এবং—শীকারপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির সমস্যা! আজ থেকে বাইশ বছর পূর্ব্বে রায়কর্ত্তারা, মাত্র চারশ' পঁচাত্তর টাকা মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মুদিখানাটার! বছর পাঁচেক পূর্ব্বে সত্যব্রত দেখে গিয়েছিল, সোসাইটির মূলধন দাঁড়িয়েছে আটত্রিশ হাজারে! ইদানীং গোটাকতক বেকার বৃদ্ধ, বিপত্নীক প্রৌঢ়, ও ব্রিফ্‌লেস উকীলে মিলে দফা-রফা করে দিয়েছে দোকানটার! ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক রকমের সমস্যা। অথচ—

পরের সমস্যার চাইতে, সত্যব্রতর নিজের করণীয়গুলির গুরুত্ব ছিল ঢের বেশী। বাসস্থান বাসোপযোগী করতে হবে; লাইব্রেরীটাকে গোছাতে হবে ভাল করে; জামা-কাপড়ের সমস্যা আছে; এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী; ওদিকে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অতি-অবশ্য দেখা

করে আসা দরকার। কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় দিন পনেরো কেটে গেল,—নিজের কোন কিছুর দিকে নজর দেবার অবসর পেল না সে। অবশ্য—

ইতিমধ্যে, দাঙ্গা নরম হওয়ার ফলে যান-বাহন আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, অফিস্-আদালতের কেরাণীরা আবার আরম্ভ করে দিয়েছিল তাদের দশটা-পাঁচটার দাসত্ব; স্কুল-কলেজের সাময়িক বেকাররাও অগত্যা মেনে নিয়েছিল তাদের গতানুগতিক জীবন; গণ-দেবতার একটা অংশও কোথাও মীটিং করে—কোথাও বাজার লুট্ করে—কোথাও বা শৌর্য্য বীর্য্যের সাহায্যে সিনেমার টিকিট্ আদায় করে তাদের বেকারত্বের বিপক্ষে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল! সাধারণদের মতো অসাধারণরাও অচঞ্চল ছিলেন না!—

নোয়াখালির দুর্গতদের চাইতেও দিল্লীর স্নেহাস্পদদের আহ্বান মহাত্মাজীর কাছে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায়, ইতিমধ্যে তিনি রাজধানী যাত্রা করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেলেঘাটার শিবির-বিহারীরাও চঞ্চল হয়ে রওনা দিয়েছিলেন দিল্লী এবং লালদিঘীর রহস্য-মহলের উদ্দেশ্যে। অতি-নগণ্য শীকারপুরের অবস্থাও অনুরূপ। দাঙ্গা থেমে যাওয়ার ফলে, এখানকার গোটা কতক ব্যাপারেও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। হৃদয়গোপালের রিলিফ কমিটি কাজের অভাবে রেলওয়ে ষ্টেশন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু একেবারে উঠেও যায়নি। তারা আসে-পাশে ছড়িয়ে-পড়া উদ্বাস্তুদের উপকার করে বেড়াচ্ছিল। কম্‌রেড প্রশান্তর অবস্থাও তথৈবচ। তার শান্তি-সম্মেলনের সার্থকতা দলের লোক ছাড়া আর কেউই তেমন উপলব্ধি করতে পারেনি; কিন্তু কম্‌রেড-ধর্ম্মীরাও কাবু

হবার পাত্র নয়! শান্তির বদলে তারা কল্যাণকে নিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ প্রতিদিন বিকেলে ঘরোয়া-সভা করে তারা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ কামনার পথ বাংলাতে আরম্ভ করে দিয়েছিল এবং বিশেষ বয়সের একটা ক্রমবর্দ্ধমানদল, রেডিয়ো মারফৎ মহাত্মাজীর প্রার্থনা শোনার চাইতে, ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে কম্‌রেড প্রভাতীর বাণী শোনার সার্থকতা বেশী করে উপলব্ধি করছিল।

বাইরের মতো বাড়ীর লোকেরাও বসেছিল না। সেজ তরফের সুব্রত তার প্রোফেসারী জীবনের এক ঘেয়েমীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছিল রাঙাবৌকে আশ্রয় করে। চাকুরী জীবনের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া আর সব সময়েই সে রাঙাবৌকে নিয়ে উন্মত্ত। পিশ্‌তুতো ভাইয়ের পরিত্যাক্তা পত্নীকে সে স্বাবলম্বী করে তুলতে বদ্ধপরিকর'—বয়স্থা যুবতীর পক্ষে নতুন করে স্কুলে যাওয়া সম্ভবপর নয়, তাই সুব্রত নিজে দায়িত্ব নিয়েছিল তাকে লেখা-পড়া শেখাবার! অধিকন্তু আছে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপার। একটি সুদর্শন যুবক সপ্তাহে দু'দিন করে এসে রাঙাবৌকে সেতার শিখিয়ে যায়!—সুন্দরী ছাত্রীর জ্ঞানার্জ্জনের পথে যাতে কোন রকম সাংসারিক বিড়ম্বনা অন্তরায় না হয়, তার জন্য সুব্রত, দুজনের—অধুনা সত্যব্রতকে নিয়ে তিনজনের—সংসারে নিযুক্ত করেছিল তিনজন কর্ম্মচারী—দাস দাসী ও পাচিকা। সুযোগ বুঝে রাঙাবৌও যেন তার আজীবনের ভুল-ভ্রান্তি-গুলোকে সুদ্ সমেত পুষিয়ে নিচ্ছিল। সুব্রতর দাক্ষিণ্যকে সে যেন তার প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত দিয়ে সার্থক করে তুলছিল।

সেজ তরফের মতো ন' তরফের লোকেরাও অচঞ্চল ছিল না। শিবব্রত ও ইন্দ্রব্রত চিরকেলে বেকার, কিন্তু দাঙ্গার কল্যাণে তারাও বেশ

করিৎকর্ম্মা হয়ে উঠেছিল।—ইজারাদারের যা মাসিক বরাদ্দ তাতে আজকালকার বাজারে কোন রকমে খাওয়া-পরা জুটলেও আনুসঙ্গিকের খরচা কুলোয় না। তাই, তারা নিজেদের অংশের খান-তিনেক ঘর ভাড়া দিয়ে, আরও অর্থোপার্জ্জনের ফন্দী খুঁজ্‌ছিল। ব্যষ্টির স্বার্থের জন্য সমষ্টি-নিগ্রহের এ এক প্রামাণ্য উদাহরণ। এজ্‌মালী বাড়ীর মধ্যে অপরিচিত ও অস্বাভাবিক চরিত্রের ভাড়াটের অস্তিত্বটা, অন্যান্য সরীকের পক্ষে যে কী পরিমাণ অস্বস্তিকর হতে পারে, সে কথা তারা বুঝতে নারাজ! বোঝাতে যাওয়ার ফলে, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে!

সেজ সরীকের মতো অন্যান্য সরীকদেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে,—কিন্তু তারা সহরের লোক। মোদ্দা কথা,—সকলেই স্ব স্ব প্রতিভানুযায়ী কর্ম্ম-যোগের জমী তৈরি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, শুধু সত্যব্রত ছাড়া।

লাইব্রেরী ঘরে একলা বসে পা নাচাচ্ছিল সত্যব্রত, হঠাৎ লক্ষ্য করল: একটা হুলো বেড়াল ব্যস্তভাবে অন্দরের দিকে চলে গেল। শ্রীমানের উদ্দেশ্যটাও অজানা নয়, নির্জ্জন মধ্যাহ্নে সে তার দৈনন্দিন অপকার্য্য করতে চলেছে রান্নাঘরে। কিন্তু—

সত্যব্রত হঠাৎ যেন চমকে ওঠে: সকলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে! কিন্তু সে নিজে কী করছে?—এইভাবে দিনের পর দিন, শুধু নেমন্তন্ন খেয়ে আর পরচর্চ্চা করেই দিন কাটাবে সে!

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চেষ্টা করে সে! পলিটিক্‌স্‌এর গন্ধ আছে এমন কোন কিছুর মধ্যে সে নিশ্চয়ই যাবে না। অথচ, কী যে করবে তাও মাথায় আসে না!

রাজনীতি-জগতের কেউ-কেটা হ'তে না পারলেও, একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে, শান্তিতে জীবন যাপন করা হয়তো তার পক্ষে অসম্ভব না-ও হ'তে পারে! আর পাঁচজনের মতো আত্ম-সম্মান বলি দিয়ে হীনতা স্বীকার করতে পারলে, উপার্জ্জনের অঙ্কটা তার নিশ্চয়ই বাড়বে। সেই টাকায় সে মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে তার সংসার —তার স্ত্রী—পুত্র—

স্ত্রীপুত্রের কথা মনে হতেই সত্যব্রত আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে: মনে পড়ে যায় করুণাকে; সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে জনৈক দীপক চৌধুরীর অদেখা চেহারা। লোকটা কালো কিংবা ফর্সা—মোটা কিংবা রোগা, কিছুই সে কল্পনা করতে পারে না—শুধু, মনে পড়ে, লোকটা বিলেত থেকে ফিরলেই, একটি মেয়ে তার কাছে পরস্ত্রী হ'য়ে যাবে!

ভবিতব্য? করুণা যে আজ তার স্ত্রী নয়—এটা ভবিতব্য না তার স্বর্গীয় পিতার দেউলে আভিজাত্যের বিকৃত প্রকাশ? পুরোণ কথা মনে পড়ে যায়: আজকেকার রায়বাহাদুর হৃদয়গোপাল। এই রায়-বাড়ীরই অনুগৃহীত লোক;—তাঁর বিধবা জননী ছিলেন এই পরিবারেরই মাস-মাইনের রাঁধুনী! মা রাঁধুনীবৃত্তি করতেন, আর ছেলে স্কুলে যেত। সহায় সম্পদহীনা বিধবা সেদিন হয়তো স্বপ্ন দেখতেন,—ছেলে তাঁর "পাশ" দিয়ে চাকরী করবে—তাঁর দুঃখ ঘোচাবে! কিন্তু, আশ্চর্য্য—এ ধরণের

স্বপ্ন শতকরা নিরেনব্বুই জনের ক্ষেত্রে বিফল হ'লেও,—সেই বিধবার বরাতে সফল হয়েছিল। ছেলে তাঁর "পাশ" দিতে পারেনি বটে কিন্তু অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই অর্থোপার্জ্জনে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল! দেখে,—সকলেই হ'য়েছিলেন চমৎকৃত এবং এই উৎসাহদাতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, সত্যব্রতরই পিতা। তারপর ভাগ্যচক্রের গতি হ'লো ভিন্নমুখী ঘটনাচক্রে পুরোণ অন্নদাতারই ইজারাদার হ'য়ে বসলেন ভূতপূর্ব্ব অন্নদাস। শেষে একদিন লক্ষপতি হৃদয়গোপাল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন : তাঁর একমাত্র সন্তান করুণাকে, সত্যব্রতর হাতে দান করে, গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করবেন—গৌরীটির বয়স অবশ্য তখন চৌদ্দ পেরিয়ে গিয়েছিল।

রায় শুভব্রতর স্কন্ধে, যদিও তখনও, সাম্যবাদের ভূতটা বেশ কায়েমী-ভাবেই চেপে বসেছিল ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ভূতপূর্ব্বা রাঁধুনীর পৌত্রীকে পুত্রবধূ করবার মতো ঔদার্য্য তাঁর নেই। ফলে, উভয় পরিবারের ঘনিষ্টতাটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল ; সকন্যা হৃদয়গোপাল কারবারের অজুহাতে কোলকাতাবাসী হ'লেন!—স্বর্গতঃ পিতার দোষ-গুণ বিচার করতে প্রবৃত্তি হয় না সত্যব্রতর ; কিন্তু,—তাঁর জবরদস্তির জন্যই করুণা আজ পরস্ত্রী হ'তে চলেছে,—কথাটা মনে হ'লেই একটা অকথ্য যন্ত্রণায় বুকটা তার টন্‌টন্ ক'রে ওঠে! এ কী জ্বালা·······

—আসতে পারি?

—বিকাশ?

আট

দুশ্চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সত্যব্রত সশব্দে উঠে দাঁড়াল: সাড়ম্বরে অভ্যার্থনা করে বলল: আয় আয়, তুই যে ভুলেও এ পথ মাড়াস্ না রে! সেই গত হপ্তায় একবার এসেছিলি, তারপর একেবারে নিপাত্তা—

—পাত্তা লাগাই কী করে ব'লো?—কপালের ঘাম মুছে বিকাশ বলল: গাধাবোটের চাক্‌রী,—তার জন্যে মাইনে দেয় মামা—

—গাধাবোট? কার?

—শ্রীমতী করুণার—আবার কার!—কৃত্রিম বিরক্তিতে মুখ বিকৃত ক'রে বিকাশ বলল: এ এক আচ্ছা ফ্যাঁসাদে পড়া গেছে যা হোক! মেয়ে তাঁর বিলেত ফেরতের বৌ হ'বে, সুতরাং তাকে পাবলিক লাইফ্ সম্বন্ধে তালিম দেওয়া চাই-ই! এদিকে আবার সাবেকী সংস্কারও ছাড়তে পারেন না! অতএব যা ব্যাটা বিকাশচন্দর মেয়ের গার্ড হ'য়ে!—কম্মো-ভোগটা একবার বোঝো দাদা....

সত্যব্রত হেসে ফেলল। বলল: বুঝলাম! তা, তোমার আজকের শুভাগমনটাও কি গাধাবোট রূপে?

—নিশ্চয়ই! ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকলে প্রহার খেতে হয়,—জানি বলেই এখানে এসে বসলাম; নাহলে, চাক্‌রীর খাতিরে আমার উচিত ছিল ঠাকরুণের সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌদির ঘরে যাওয়া!

— করুণা এসেছে—রাঙাবৌয়ের কাছে ?

—তবে আর শুনলে কী এতক্ষণ ? মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি—

—কী রকম ?

—ছেঁড়া ন্যাকড়া।

—সে আবার কী রে ?

—মানে, ছেঁড়া ন্যাকড়া ! Dcor to Door knock ক'রে সংগ্রহ করা হ'চ্ছে !

—উদ্দেশ্য ?

—কাঁথা !

কিছু বুঝ্‌তে না পেরে সত্যব্রত বলল : তোর টেলিগ্রাফিক্ ক্যায়দা ছেড়ে, ব্যাপারটা একটু সোজা ক'রে বলনা ভাই।

—এই সরল ব্যাপারটাও বুঝতে পারলে না ?—

বিকাশকে অগত্যা বুঝিয়ে বলতে হ'লো : পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা কাঁথার ওপর চমৎকার নক্‌সা তুলতে পারে। দেশের ইতর ভদ্র সকলের কাছেই এসব কাঁথার কদর আছে। তাই, রিফিউজী রিলিফ্‌ কমিটি ওদের ওই বিদ্যেটাকে কাজে লাগিয়ে নিচ্ছে ! আমরা চেয়ে চিন্তে ছেঁড়া কাপড় জোগাড় ক'রে দি ;—উদ্বাস্তু মেয়েরা সেই সব কাপড়ে কাঁথা তৈরি ক'রে দেয় ; তারপর আমরাই আবার সেগুলো বিক্রি ক'রে যার যা পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দি ! এইভাবে ক্রমে ওরা স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠ্‌বে !

—কিন্তু, কাঁথা বিক্রি ক'রে ক' পয়সা হ'বে ?

—ঠিক্ কথা !—বিকাশ হঠাৎ থেমে গেল ; তারপর মিনিটখানেক কী যেন ভেবে নিয়ে বলল : তুমি বিন্‌দাকে মানো ?

বিন্‌দা অর্থাৎ বিনোদ রায় হ'চ্ছেন পাড়ার একজন ছিটগ্রস্থ প্রৌঢ়ের নাম !—সত্যব্রত আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রতি প্রশ্ন করল : বিন্‌দাকে মানি মানে ?

—বিন্‌দা নয়—সবেগে মাথা নেড়ে বিকাশ বলল : I mean, বিন্‌দা কী সব ভগবান্-টগবান্ আওড়ায় না ?—তুমি সে সব মানো ?

সত্যব্রতর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। বলল : আমি ভগবান মানি কি না জিজ্ঞাসা করছিস ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—হঠাৎ এ কথা ?

—মানে আছে। আগে তুমি বলোই না—ভগবান মানো ?

—বলা মুস্কিল ! তবে, এটুকু বলতে পারি, সত্যিকার বিপদে পড়লে সব বান্দাই তাঁর আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু হঠাৎ ভগবান বেচারীকে নিয়ে টানাটানি করছিস্ কেন ?

—তুমি কাঁথার দামের কথা তুললে কি না তাই মনে পড়ল ভদ্রলোককে !—বিকাশ কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বলল : মানুষের কান্নার মধ্যে যদি খাদ্ না থাকে, তাহলে,—তাহলে সত্যিই বোধহয় তিনি সাড়া দেন্। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে !

—কী রকম ?

—দেখ, উদ্বাস্তু পুরুষগুলোও কাঁদে ; কিন্তু সে কান্নার রূপ এমনই পলিটিকস্-ঘেঁষা যে, ভগবান তো দূরের কথা, মানুষেরই মন ভাল করে ভেজে না ! কিন্তু, যাদের কান্না কেউ শুনতে পায় না—দেখতে পায়না

—তাদের দুঃখের খবরটা ঠিক যথাস্থানে পৌঁছে যায়। না হ'লে "লায়ন" এল কী ক'রে ?

—লায়ন আবার কী রে ?

—আমেরিকার ঈগল্-লায়ন কোম্পানীর বারো-আনী-পার্টনার! কারবারের ব্যাপারে মামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা এমনই বেড়ে গেছে যে—দুজনকে কানাই-বলাই বলা চলে! কিন্তু কারবারী হ'লেও বৃদ্ধ একজন খাঁটি শিল্পী! সেদিন করুণার হাতে খান কতক কাঁথা দেখে বৃদ্ধ যেন লাফিয়ে উঠলেন: ওরিয়েন্টাল আর্টের এমন অপূর্ব্ব নিদর্শন ইতিপূর্ব্বে তিনি নাকি আর দেখেন নি!—ছেঁড়া কাপড়ের ওপর শাড়ীর পাড়ের সুতোয় তোলা নক্সাগুলো দেখে ভদ্রলোক নিজেই শুধু তৃপ্তি পেলেন না—দেশের লোক্‌কে দেখাবার জন্যও ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। ফলে, পার্শেল ক'রে কাঁথা চালান যাচ্ছে আমেরিকায়! আর, শ্রমিকরা পারিশ্রমিক পাচ্ছে, প্রতি কাঁথা পিছু, একশ' থেকে আড়াইশ' পর্য্যন্ত, যার যেমন সূক্ষ্ম কাজ! ব্যাপারটা বুঝতে পারছো সতুদা!

—হুম্!—সত্যব্রত বিচলিত হ'লো; কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে! একটা শোনা কথা মনে পড়ে গেল তার। তখন সবুজপত্রের যুগ। একদিন অবনীন্দ্রনাথ বালীগঞ্জে বীরবলের বাড়ীতে গিয়ে পরিচিত হ'লেন, পবিত্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক উদীয়মান সাহিত্যিক সাংবাদিকের সঙ্গে। গতানুগতিক ব্যাপার; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটল। শিল্পাচার্য্য যে মুহূর্ত্তে জানতে পারলেন, পবিত্রবাবুর দেশ পূর্ব্ববঙ্গে, তক্ষুনি শিশুর মতো বায়না ধরলেন: বাঙ্গাল দেশের মেয়েদের আলপনা-দেবার, কাঁথা তৈরি করবার নক্সাগুলো জোগাড় করে

দিতে হ'বে—দিতেই হ'বে! কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়ার জাত্ কাঁথা নিয়ে কী করছে? শিল্পকলার সমাদর না শিশুরাষ্ট্রের নাড়ী পরীক্ষার কোন অজুহাত?

—বুঝ্লে সতুদা—বিকাশ বলে চলল : ওদের জাত্ই আলাদা। এই দেখনা, আমাদের বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস জান্তে গিয়ে কত বখেড়া বাধিয়েছে!

—বখেড়া?

—বখেড়া নয়? প্রথমত: বিক্রমাদিত্য ক'জন ছিলেন তাই নিয়ে গোলমাল; তার ওপর মহাকবি কালিদাস কোন আদিত্যের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন সেও আর এক সমস্যা! লায়ন সাহেব এত দিন যশোবর্দ্ধনদেবকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন—সুব্রতবাবু সেদিন আবার কুমার-সম্ভবের কথা বলে মাথা খারাপ করে দিয়েছেন!

—আমাদের সুব্রত?—সত্যব্রত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল : ও বুঝি রোজ তোদের বাড়ী যায়?

—হ্যাঁ!—বিকাশ পূর্ব্বকথার জের টানল : সুব্রতবাবু সংস্কৃত আউড়ে বললেন, মহাকবি কুমার-সম্ভব লিখেছিলেন, যুবরাজ কুমারগুপ্তের বাবা হুনারী চন্দ্রগুপ্তকে তেল্ মাখাবার জন্যে। ব্যাপার বোঝো!

—তারপর? সমস্যা মিটল?

—জানিনা, সাহেব এখন স্যার সরকারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—যদি মজা দেখ্তে চাস্—সত্যব্রত হেসে বলল : তুইও গিয়ে একটু টুকে দেনা!

—আমি? আমি কী বুঝি এ সবের?

—আমি বলে দিচ্ছি। তুই গিয়ে বলবি : মহাকবি কালিদাসকে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত অগ্নিমিত্রের আমলে।

—অগ্নি মিত্তির আবার কে ?

—সুঙ্গবংশীয় সম্রাট পুষ্যমিত্রের ছেলে অগ্নিমিত্রও একজন বিক্রমাদিত্য ছিলেন !

—ওঃ বাবা !—একটা উদ্গার তুলে বিকাশ ঘাড় নাড়ল ; তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে বলল : আরে, করুণাটা গেঁজিয়ে গেল নাকি ? করছে কী এতক্ষণ ধরে ? একটু খবর দাও দেখি—

—কী দরকার ? তুই তো আসলে গাধাবোট—চেপে বসে থাক্ না !

—আরে না না।—বিকাশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরও ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। বলল : বেলা পাঁচটায় মীটিং, এদিকে পাঁচটা দশ হ'য়ে গেছে। দেরির জন্যে ও আমারই মাথা খাবে—

—কিসের মীটিং রে ? গণদেবতা সংক্রান্ত কোন কিছু নাকি ?

—দেবতা নয় নেতা। একজন ভূতপূর্ব্ব গণ-নেতাকে অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে—তারই মীটিং !

—নেতাটি কে ?

—সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

—কিন্তু প্রকাশ হ'য়ে গেছে !—সত্যব্রত হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল। বলল : সেদিন নীরু ডাক্তার বলছিল, তোর মামা নাকি অনেক খরচ ক'রে আমাকে একটা অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা করছেন ! কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে এক্ষুনি তাঁকে বারণ করে দেওয়া উচিত।

—তার মানে ?

—মানে, দরকার নেই !

—কথাটা একটু খুলে বলো সতুদা !

—মানে,—আমি যে একদিন পলিটিক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, সে কথাটা ভাবতেও আজ আমার বিশ্রী লাগে !—এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্যে আজ যদি কেউ আমাকে অভিনন্দন জানাতে চেষ্টা করে, তাহলে, ব্যাপারটা আরও বিশ্রী হ'য়ে যাবে। তোর মামাকে বলে দিস্,— মীটিং-সংক্রান্ত কোন কিছুর মধ্যে আমি থাকবো না ! অভিনন্দন আমি নোব না !

বিকাশ কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে চেয়ে রইল ; তারপর বলল : একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—সত্যি জবাব দেবে ?

—ওই তো বললাম—সত্যব্রত উগ্রস্বরে বলল : পলিটিক্স আমি ছেড়ে দিয়েছি,—মিথ্যে বলতে যাব কিসের জন্যে ! কী জানতে চাস্, বল না ?

—তুমি চুপ-চাপ ঘরে বসে থাক কেন ?

সত্যব্রত সম্ভবতঃ অন্য কিছু আশা করেছিল ; কিন্তু প্রশ্নের বিষয়বস্তু তাকে আশ্বস্ত করল। সে আবার পূর্ব্বের মতো হাল্কাস্বরে বলল : সাধে কি আর বসে থাকি, দায়ে পড়ে থাকি !—পায়ে যা মোক্ষম ব্যায়রাম ধরেছে···

—জানি !—বাধা দিয়ে বিকাশ বলল : একাদশী পূর্ণিমাতে তোমার পায়ের হাড়ে যন্ত্রণা হয়। কিন্তু অন্য দিন ? আর কিছু না করো, আমাদের রিলিফ্ অফিসে গিয়ে বসে থাকতেও তো পারো !

—কিন্তু, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি. পলিটিক্স-এর ছায়া মাড়াব না।

—তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি? বিকাশ আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: সব কিছুই পলিটিক্‌স্-ময় দেখছো? দাঙ্গা-দুর্গতদের সঙ্গে পলিটিক্‌স্-এর সম্পর্ক কী?

—অতি ঘনিষ্ঠ!—দুর্গতির আসল কারণটা যে ওই পলিটিক্‌স্-ই, সেটা বোঝাবার চেষ্টা ক'রে সত্যব্রত বলল: সত্যিই যদি দুর্গতদের কোন উপকার করতে চাস, তাহলে আগে গিয়ে ধর সেই সব পলিটিসিয়ানদের—যাদের পলিটিক্‌স্ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে!

—ধরবো কী করে,—তারা তো সব পাকিস্থানে!

—আমি তাদের কথা বলছি না—

—তবে?

—আমি সেই সব মহাপুরুষদের কথা বলছি, যারা একদিন মায়ের পেটের ভাইকে বেশী স্নেহ দেখাতে গিয়ে, তোয়াজ করে ফেলেছিল জামাইয়ের মতো!—জামাই কখনো আপনার হয়?

—কিন্তু সতুদা, তুমি তো ওই সব মহাপুরুষদের সঙ্গে বহুকাল ঘর করেছ,—তুমি তো হাড়ে হাড়ে জান, ওঁদের বাগানো কত কঠিন,—কত সময়-সাপেক্ষ! ততদিন অপেক্ষা করতে গেলে, এ বেচারীরা যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে!

—তুই একটা পাগল!—সত্যব্রত হেসে বলল: এ জাতের ইতিহাসটা যদি ভাল করে পড়তিস্, তাহলে বুঝতিস্—এই মাটির লোকগুলো কখখোন নিঃশেষে নিঃশেষ হবে না। কত শক্, হুন্, যবন, ইংরেজ এলো, নিঃশেষ হ'লো না,—আর আজ তুচ্ছ একটা Ism-এর ধাপ্পায় পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে?

—কী আশ্চর্য্য! এর মধ্যে আবার 'ইজম' এল কী করে ?

—চিরকাল যে ভাবে এসেছে! যেমন, বেদ্-ব্রাহ্মণ-ইজম্-এর ঠ্যালায় এসেছিল বৌদ্ধ-ইজম্—

—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, বলো ?

—নাঃ তুই শুধু বয়েসেই বেড়েছিস!—আরে, নামে কী এসে যায় ? মৎলব-হাঁসিল করবার জন্যে দল তৈরি করাটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। সে দলের নেতাকে পলিটিসিয়ান, পরমহংস, স্বামীজী, নেতাজী, ফুরার, ডুচে, কমরেড, কায়েদ্-এ-আজম্—যা খুশী নামে ডাক্ না কেন কী এসে যায় তাতে ?

—বুঝিছি! বলে যাও তারপর—

—তারপর, বৌদ্ধরা পয়দা করল মহাযান্-হীনযান্ ইজম্; সে ইজম্-এর জ্বালায় তৈরি হ'লো শঙ্করের সনাতন ইজম; সনাতন ধর্ম্মের Restoration-এর দাপটে সৃষ্টি হ'লো শাক্ত-বৈষ্ণব ইজম্; তার থেকে জন্মাল তান্ত্রিক আর ন্যাড়ানেড়ী ইজম্; সুযোগ বুঝে আকবর দি গ্রেট ছাড়লেন দীন ইলাহী ইজ্‌ম্; ইলাহীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে এলো শিখ ইজম; তারপর হিন্দু মুসলমান, শিখ, মারাঠা, জাঠ, রাজপুতদের ঘরোয়ানা-ইজ.ম্-এর সুযোগ সুবিধে নিয়ে এদেশে শিকড় গাড়ল ফিরিঙ্গী ইজম্; ফিরিঙ্গীকে সামাল দিতে গিয়ে তৈরি হলো ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা ইজম্—অহিংসা ইজম্-এর মেনিফেষ্টো দিয়ে এর ছত্রে ছত্রে আরও কত রকম ইজম্-এর হদিস বাৎলানো আছে, সে সব জানতে পারবে আমাদের নাতি পুতিরা; আপাততঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকুলার ইজম্-এর মেনিফেষ্টো হচ্ছে পাকিস্থান-তোষণ ইজম্……

সত্যব্রতর ব্যাপার দেখে বিকাশের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ; সে চট্ করে একবার তার পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল।

—কী হ'লো রে?

—কিছু নয়, চালিয়ে যাও তুমি—

—তাহলে বোঝ্,—এত রকম ইজম্-এর ধাক্কা সামলেও আজও যারা টিঁকে আছে—তারা তুচ্ছ একটা Refugee-ism-এর পাল্লায় পড়ে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—তা কখনও হয়? অ-হিন্দু, অ-মুসলমান, বা অ-মানুষ,—যে ভাবেই হোক টিঁকে আমরা নিশ্চয়ই থাকবো!

—হক্ কথা বলেছ।

—বুঝিছিস্ তাহলে!

—এক বর্ণও নয়!

—তবে যে বললি—সত্যব্রত অপ্রতিভ হয়ে বলল : হক্ কথা বলেছ—

বিকাশ বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল: তুমি যে হক্ ছাড়া অ-হক্ কিছু বলছো না, সেটা বুঝিছি। কিন্তু কী যে বলছো, সেটা মাথায় ঢোকেনি।

—আচ্ছা মনে কর—সত্যব্রত বোঝাতে আরম্ভ করল : আমাদের গাঙ্গুলী মশাইয়ের ছেলে, বিয়ের জন্যে জাত দিল, বা পচা কাওরার ছেলে মনিবের বাম্‌নাই সহ্য করতে না পেরে মুসলমান হলো ; কিংবা কোন বাঙ্গালী বীর প্রাণের ভয়ে ধর্ম্ম বদলালো! কিন্তু এদের খাঁ সাহেব হয়ে যাওয়ার ফলে এ কথা কি মিথ্যে হয়ে যাবে যে, এরা বাঙ্গালীর ছেলে নয় ; ভাত খায় না ; পিতৃ-পুরুষ এদের আরব বেদুইন?

—ঠিক্ কথা। কিন্তু আমাদের দেশে যে সব বে-ঠিক্ হ'য়ে যায়! না হলে পাকিস্থান হয় কী করে?

—আমরা করতে দিচ্ছি বলেই হয়! যা মিথ্যা, তাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য দরকার হয় আরও অনেক রকম মিথ্যাচারের। ইতিহাস সাক্ষী, দেশে দেশে যুগে যুগে, গোটা কতক অতি-বুদ্ধিমান আশাবাদী লোক, এই মিথ্যাচারকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অনেক রকম মৎলবের পরিচয় দিয়েছে। কেউ ইনক্লাবের জিগীর তুলেছে; কেউ বলেছে ধর্ম্ম বিপন্ন; কেউ বা আরও মজাদার কোন ইজম-এর শ্লোগান আউড়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে কী? বিপ্লববাদীরা প্রতি-বিপ্লবের স্রোতে ভেসে গিয়েছে; ধর্ম্মধ্বজীরা উচ্ছন্ন গিয়েছে নিজেদের ধর্ম্মান্ধতার অস্ত্রেই! মিথ্যা কি কখনও সত্য হয় রে?

—কিন্তু—বিকাশ অসহায়ভাবে বলল: এর সঙ্গে দাঙ্গা-দুর্গতদের সম্পর্কটা কী?

—বস্তু-বিশেষের এ পিঠ আর ওপিঠ!—ডি, এল, রায় একদিন বললেন:

গিয়েছে দেশ দুঃখ কিসের

মানুষ আমরা নহি তো মেষ!

আমরা গম্ভীরভাবে বললাম—ঠিক কথা। তারপর, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই, প্র, না, বি, শোনালেন:

……গিয়াছে দেশ লজ্জা কিসের

মানুষ আমরা নহি তো—মেষ!

শুনে, আমরা খুব হাসলুম—বেড়ে বলেছেন ভদ্রলোক! মোদ্দা কথা,

সবই তো করছি, সেই আমরাই; তবে আর সমস্যা কিসের? বুঝলি?

—অ্যাঁ?

—রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার,—সব কিছুই গতিশীল! পৃথিবীর অন্যান্য জাতগুলো, নিজেদের ভাল-মন্দর দিকে লক্ষ্য রেখেই এ গতিবেগকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু, আমাদের তো তা করলে চলবে না! আমরা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম জাত! আমাদের বেদ-বেদান্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম. কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবই যে ঐতিহ্যপূর্ণ! আমরা যে অতি বুদ্ধিমান, অসাধারণ! অসাধারণ বলেই তো আমরা স্বাভাবিক গতিবেগকে অবজ্ঞা করে সাজি প্রগতিপন্থী; পচা পুরোন বিবর্ত্তনবাদকে তালাক দিয়ে গ্রহণ করি নিত্য নতুন বিপ্লবের শ্লোগান! আমরাই তো মাসতুতো ভাইকে সায়েস্তা করবার জন্যে কায়েম করেছিলাম মুসলমান বাদশাহী; মুসলমানকে জব্দ করবার জন্যে ডেকে এনেছিলাম ইংরেজকে! —শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন,—শ্বেত জাতির পর আমরাই আবার ডেকে আনব পীতজাতিকে! পুরাণ পড়েছিস তো? অতএব মা ভৈঃ! রিফিউজীদের এই নতুন ইজম্‌টাও ধোপে টি`কবে না! তবে, গোটা কতক লোকের সুবিধে হতে পারে! নেতৃবৃন্দের কথা বলছি। যাঁরা দলত্যাগ করে সন্ধি করবেন, তাঁরা মন্ত্রী হবেন; যাঁরা বিজেতাদের হাতে মরবেন, তাঁরা হবেন ইতিহাসের শহীদ্; আর যাঁরা পালাতে পারবেন, তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে Exiled monarchদের সুযোগ-সুবিধে পাবেন!—আগামী ইলেক্‌শনে জিত্‌তে পারলে হয়তো—

সত্যব্রত হঠাৎ থেমে গেল। অত্যন্ত উত্তেজিত হলেও, একেবারে

আত্মবিস্মৃত সে হয়নি; তাই, আড়ালে বসে ব্যক্তিগত আক্রমণের নীচতাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারল না; বলতে পারল না—আগামী ইলেক্‌শানে জিত্‌তে পারলে হয়তো তোর মামাও একজন মন্ত্রী হয়ে যাবেন এ দেশের! তারপর পাঁচ বছরের রাজত্বে যা করবার করে নাও—

বিকাশও সন্দিগ্ধ হয়েছিল; কিন্তু সত্যব্রতর আসল বক্তব্যটা ধরতে পারছিল না। বলল: তুমি রিফিউজী-ইজম্ কথাটা ব্যবহার করছো কেন? তারা আস্তে আস্তে দলবদ্ধ হচ্ছে বলে?

—তুই তাহলে স্বীকার করছিস্, ওরা দলবদ্ধ হয়েছে।

—কেন করবো না?

—কিন্তু, ওদের দলবদ্ধ হবার আসল তাৎপর্য্যটা কী? ব্যক্তিগত অনুভূতি না নেতৃবৃন্দের উৎসাহবাণী?

—এ রকম সন্দেহের কারণ?

—অত্যন্ত প্রাঞ্জল! পেটের জ্বালার চাইতেও জবাই হবার ভয়টা লক্ষ গুণে বেশী! কিন্তু যথাস্থানে, যথাসময়ে ওরা তো কই দলবদ্ধ হতে পারেনি! সারা ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যে পরিমাণে সংখ্যালঘু ছিল, সেই অনুপাতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যাটা কত ছিল সে খবর রাখিস? তবুও ভারতবর্ষের জমিতে যা সম্ভবপর হলো,—পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষেত্রে তা কারুর মাথাতেও এল না কেন, বলতে পারিস?

—কী সর্ব্বনাশ!—বিকাশ অভিভূতের মতো উঠে দাঁড়াল। বলল: তোমার মনের কথা আমি বোধহয় বুঝিছি; কিন্তু দোহাই

তোমার, এ সব নিয়ে কোথাও যেন বক্তৃতা করে বসো না! দেশে কোন রকমে একটু শান্তি এসেছে! তুমি আবার•••

—দেশে শান্তি এসেছে নাকি?

—দোহাই দাদা—বিকাশ হাত জোড় করে বলল: তোমার সব কথা কাল এসে শুনবো, কিন্তু আজ আমায় বাঁচাও!—এদিকে সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেছে—

—ওহো, করুণাকে ডেকে দিতে হবে, না?—সত্যব্রত প্রস্থানোদ্যত হলো; কিন্তু আবার ফিরল। বলল: হ্যাঁরে, তোরা নাকি কী সব চ্যারিটি করছিস, দাঙ্গা-দুর্গতদের জন্যে?

—কে বললে?

—নীরু ডাক্তার বলছিল: রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা রিহার্সাল হচ্ছে, —স্রেফ মেয়েদের ব্যাপার····?

—আমি ও সবের কিস্যু জানিনা!—সত্যব্রতর কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে বিকাশ তাড়াতাড়ি বলল: ও সব তুমি বরং সুব্রতবাবুর কাছ থেকে জেনে নিও! এখন করুণাকে একবার···

—সুব্রত বুঝি মোড়ল হয়েছে? তবে যে শুনলুম, স্রেফ মেয়েদের ব্যাপার?

বিকাশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল: আসল মোড়ল করুণা; সুব্রতবাবু তাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করেন!

—ওঃ সহকর্ম্মী!—সত্যব্রত ভেতরে চলে গেল!

নয়

করুণা কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের মৎলবেই আসেনি, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সুব্রতর মৎলব অনুযায়ী অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও, আরও একটা ফন্দী মাথায় এসেছিল তার। জলসা। কিছুদিন যাবৎ সে লক্ষ্য করছে, দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার সঙ্গে তাল রেখে কারণে-অকারণে যত্র-তত্র সঙ্গীত জলসার আয়োজন করে, এক শ্রেণীর উৎসাহী ভদ্রলোক বেশ কিছু উপার্জ্জন করে চলেছেন! সাধারণত এঁরা চাঁদা সংগ্রহ করেন; কিংবা প্রমোদকর ফাঁকি দেবার জন্য, ছাড়েন তথাকথিত নিমন্ত্রণ পত্র। কিন্তু সে বিশ্বস্তসূত্রেই অবগত হয়েছে, এ ব্যাপারে, শিল্পীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পরও কর্ম্মকর্ত্তাদের পকেটে বেশ কিছু লভ্যাংশ থেকে যায়। সুতরাং তাদের রিলিফ্‌ ফাণ্ডের জন্য এ রকম ব্যবসার সুযোগ নিলে কেমন হয়? সম্ভবত ভালই হয়, কিন্তু তার আগে দরকার রাঙাবৌয়ের সাহায্য! কারণ, শিল্পীদেরকে স্বল্প পারিশ্রমিকে বা বিনা পারিশ্রমিকে জোগাড় করে আনবার মতো জানা-শোনা লোক,—আপাততঃ সে একজন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছেনা এবং লোকটি হচ্ছেন, রাঙাবৌয়ের সেতার শিক্ষক জহর চৌধুরী! সমব্যবসায়ীদের সমাজে নিশ্চয়ই তাঁর খাতির আছে। অনুরুদ্ধ হলে, অনেকেই হয়তো বিনা পারিশ্রমিকে গান গেয়ে যাবে—

—উফ্‌, ব্যবসায়ী বাপের উপযুক্ত মেয়ে বটে ভাই তুমি!—রাঙাবৌ তার বাক্স প্যাঁট্‌রা খুলে ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করছিল; করুণার কল্পনার

দৌড় দেখে হেসে ফেলল। বলল: এ মৎলব যার তার মাথায় আসতো না!

করুণাও হাসল। তারপর সাগ্রহে বলল: তাহলে আপনি ওঁকে বলবেন তো?

—তা না হয় বলবো'খন! কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কী,—তোমার মৎলব মতো কাজ হাঁসিল করা ওর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছি না!

—জহর বাবুর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। ও ভাই বড্ড লাজুক! তার ওপর এ লাইনে নতুন তো! অনেকের সঙ্গে আলাপই হয়নি এখনও!

—আলাপ হয়নি এখনও?

—কী ক'রে হ'বে বলো! রাঙাবৌয়ের হাসিমুখ কেমন যেন মলিন হ'য়ে গেল। বলল: ছিলেন জমীদারের ছেলে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ীতে ভাল খান্‌দানের উস্তাদ পুষেছেন; আধুনিক গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে তেমন মেলা মেশা করেন নি তো কখনও—

করুণা এত কথা জানত না। বলল: ও হরি, তবে তো ভারি মুস্কিল হ'বে—

—মুস্কিল নয়? ছিলেন লক্ষপতি জমীদারের ছেলে, কখন তো ভাবতে পারেননি,—মুসলমানেরা একদিন ওদের তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে;—খেতে হবে চাকরী ক'রে।

—আসবার সময়ে সঙ্গে আনেন নি কিছু?

—এনেছে হয়তো দু'-দশ হাজার টাকা; কিন্তু বসে খেলে, সে

আর ক' দিন! ও তো আর বড়লোকের ঘরের রাঙামূলো নয়। রীতিমত শিক্ষিত লোক। —তাই, ভবিষ্যৎ ভেবে আগে থেকেই খাটুতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, লেখাপড়ার চর্চ্চা করলেও ডিগ্রী জোগাড় করবার কথা কখনও ভাবেনি—

—তাই বুঝি এই লাইন্ নিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু তাতেও মুস্কিল বেধেছে! জানে অনেক রকম; কিন্তু তালিম্ বজায় রেখেছিল শুধু ধ্রুপদে। আমাদের দেশে ক'জন বোঝে ও সব বড় বড় ব্যাপার। তাই, ওর টিউশানাও জোটে না—এ লাইনের লোকগুলোর সঙ্গে খাপও খায় না! কী বলবো,—একদিন যে লোক মিউজিক কন্‌ফারেন্‌স্‌-এ বসে, সম্মানিত শিল্পী হিসাবে সুরবাহারে চার তুক আলাপ করতো, তাকে আজ সেতারে কাফি সাধতে হচ্ছে রেডিয়ো প্রোগ্রাম পাবার জন্যে!

করুণার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল: শিক্ষকের ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিবৃত্তর জন্যে নয়—ছাত্রীর দরদের জন্য! ইতিপূর্ব্বে সে অবশ্য রাঙাবৌ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সুব্রতকে জড়িয়ে; কিন্তু আজ যার ইঙ্গিত পেল, তা সত্যিই অভাবনীয়! তাই, ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে সে আলোচনার জের টানল। বলল: কিন্তু রেডিয়োতে সুরবাহার-ও তো বাজে?

—সেই কথাই তো বলছি! রাঙাবৌ গম্ভীরভাবে বলল: এদের সঙ্গে ওর খাপ খায় না। রেডিয়োতে ও সুরবাহারের অডেশন দিয়েছিল; কিন্তু প্রোগ্রাম নিলে না।

—কেন?

—সময় দিয়েছিল মাত্র দশ মিনিট !

—তাতে কী হয়েছে ?

—ও বলে, সুরবাহার বা বীন্-এ আলাপ, জোড়, তার-পরণ দশ মিনিটে বাজতে পারে না। এমন কি এক ঘণ্টা দশ মিনিট বাজালেও, বাজনার অনেক কিছু অংশ বাকি থেকে যায় ! সামান্য দশ-পনেরো টাকার জন্যে ব্যাভিচারী হ'বো ?

করুণা সঙ্গীত শাস্ত্রের কিস্সু বোঝে না ; কিন্তু রাঙাবৌয়ের ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে বুঝে ফেলল ! ব্যাপারটা পরিপাক করতে গিয়ে, বিশেষ বয়সের বিশেষ সংস্কার বশে তারও মুখ চোখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল ! একটা উদগ্র কৌতূহল তাকে উত্তেজিত করে তুলল ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে সঠিক ভাবে জেনে নেবার জন্যে। একটা মারাত্মক প্রশ্ন মুখেও এসে পড়েছিল তার ; কিন্তু বাধা পড়ল। একটি মেয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল চৌকাঠের ওপর !

মেয়েটি সুন্দরী। এবং স্বাস্থ্যও যে তার একদিন আকর্ষণীয় ছিল, দেহের সৌষ্ঠবে আজও তার প্রমান মেলে। কিন্তু, মুখের পাণ্ডুরতা দেখে করুণার সন্দেহ হ'লো—কোন রকম দৈহিক বা মানসিক অশান্তি মেয়েটির জীবন বিড়ম্বিত করেছে !

—সুকৃতি ? রাঙাবৌ মেয়েটিকে দেখে বলল : এস—

সুকৃতি ঘরে ঢুকল না। সেইখান থেকেই মৃদুস্বরে বলল : বাবার অসুখটা বেড়েছে, আমি এখুনি যাব····আমি এটা এনেছিলাম—

রাঙাবৌ উঠে বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুকৃতি তার হাতে একটা পাঁচ্ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলো।

—সুকৃতি! রাঙাবৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল ; তারপর আশ্চর্য্য হয়ে বলল : হঠাৎ টাকা পেলে কোথায়?

বাধা পেয়ে সুকৃতি দাঁড়াল ; কিন্তু মুখ তুলতে পারল না।

—বলো, টাকা কে দিলে তোমায়?

সুকৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ; কোন রকমে বলল : জানি না—

—সুকৃতি, ভাই—রাঙাবৌ সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল : আমি তোমার দিদি হই। আমাকেও বলবে না?

সুকৃতি আর সামলাতে পারল না ; ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল!

রাঙাবৌ স্তম্ভিতভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক ; তারপর ফিরল। করুণা জিজ্ঞাসা করল : ও কে ভাই বৌদি?

—ন' তরফের ভাড়াটের মেয়ে—

—মেয়েটার মুখখানা যেন কেমন·· হয়ে····

—আচ্ছা করুণা,—রাঙাবৌ কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল : তোমরা রিলিফ-ফাণ্ড খুলে কত লোকের অন্ন জোগাচ্ছো,—এদের একটা ব্যবস্থা হয় না?

—উদ্বাস্তু বুঝি?

—শুধু উদ্বাস্তু!—রাঙাবৌ বিচলিত হয়ে বলল : ওদের কথা শুনলে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়! বাপ্ ছিল স্কুল মাষ্টার ; মা খুন হয়ে বেঁচেছে ; বড় বোন নিরুদ্দেশ ; ইনিও ঘর করে এসেছেন মাসখানেক···

—কার?

কথাটা হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল ; রাঙাবৌ বিরক্ত হ'লো নিজের ওপর! একি দুর্ব্বলতা তার! এ সব কথা কি কাউকে বলবার মতো!

—কার ঘর করে এসেছে?—করুণা আবার জিজ্ঞাসা করল।

চোখের জল সামলে রাঙাবৌ বলল: জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ম্ম নষ্ট করেছিল....একজন নয়...একদিন নয়...রোজ অত্যাচার হ'তো ওর ওপর! তারপর পাড়ার একজন ভদ্রলোক ওকে বিয়ে করে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচায়!

—তারপর?

—তারপর একটা সুযোগ পেয়ে পালিয়ে আসে এখানে! ওর সেই স্বামীই পালাবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল—

—তারপর?

—ক্যাম্পে থাকতে না পেরে, ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে সস্তায় বাড়ী ভাড়া পেলে!—নগদ পুঁজি-পাটা যা ছিল, সব অগ্রিম দিয়ে দিতে হ'য়েছে ন' তরফ্‌কে বাড়ী ভাড়া বাবদ। বুড়ো বাপ্‌ হাঁপানিতে ভুগছে, উঠ্‌তে পারে না! কিন্তু ও বেচারা কী করে চালায় বলতো? ভদ্রলোকের মেয়ে ভিক্ষে করতে শেখেনি! শুনলুম ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছে; কিন্তু ও টুকুতে কী হ'বে আজকালকার দিনে, বলতো?

—লেখা-পড়া কিছু জানে তাহলে?

—জানে বৈকি! সেই জন্যেই তো হয়েছে আরও মুস্কিল! কারুর সাহায্য নিতে পারেনা! নিলেও, দেনা শোধ করবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। দেখলে না, সাত তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে গেল—

—আর কেউ নেই বুঝি ?

—থাকবে না কেন ? বিধবা বড় ভাই আছেন একটি—

—বিধবা ভাই কী গো ?

—ওটা সেজ্ ঠাকুরপোর কথা !—একটু হাসবার চেষ্টা করে রাঙাবৌ বলল : ছোঁড়াটা সমস্তদিন চায়ের দোকানে বসে দেশোদ্ধার করে, বাড়ীতে আসে শুধু ভাত মারতে !

বাধা পড়ল। সশব্দে ঘরে ঢুকে সত্যব্রত বলল : উঠ্‌তে হবে—বিকাশ তাড়া দিচ্ছে।

—ইয়ে—ছোট হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে করুণা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বলল : বড্ড দেরী হয়ে গেল ভাই বৌদি ! পাঁচটায় মীটিং, এদিকে সাড়ে পাঁচ্‌টা হয়ে গেছে। বিকাশদাটা যেন কী—

—বাঃ—সত্যব্রত বলল : তুমি জমালে আড্ডা, আর দোষ হলো বেচারা বিকাশের ?

—আজ আসি ভাই বৌদি—কেমন ? করুণা সত্যব্রতের দিকে একবার ফিরেও চাইল না, হন্তদন্ত হয়ে প্রস্থান করল।

ব্যাপারটা রাঙাবৌয়ের দৃষ্টি এড়াল না ! করুণাকে নীচে পৌছে দিয়ে এসে সে দেখল, সত্যব্রত ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখ মেঘাচ্ছন্ন !

—করুণার সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি ? রাঙাবৌ জিজ্ঞাসা করল।

—ওর সঙ্গে দেখা হলো কখন যে, ঝগড়া হবে !

—তবে, ও কথা কইল না যে ?

সত্যব্রত এবার ভ্রূকুটী করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল : বড

লোকের মেয়ে! বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টারের হবু স্ত্রী! যার তার সঙ্গে সে কথা কইবে কেন?

সত্যব্রতর রাগ দেখে রাঙাবৌ মুচ্‌কে হাসল। বলল: তোমরা দেখছি সবাই সমান! সেই রকম মেয়ে নাকি করুণা? সত্যি, কি হয়েছে বল না?

—কী মুস্কিল! সত্যব্রত বিরক্ত হয়ে বলল: ওর মনের কথা আমি জানব কী করে? সেদিন ষ্টেশনে কত কথা কইলে; নিজে গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দিয়ে গেল; অথচ, আজ একেবারে যেন চিনতেই পারলে না!

সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ হলো—পাতলা চটির হাল্কা শব্দ! পরক্ষনেই করুণা উঠে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল: আসল জিনিষটাই ফেলে গেছি—

—কাপড়ের পুঁটলি! আবার দুজনে ঘরে ঢুকল। সত্যব্রত বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল পূর্ব্বের মতো। তারপর শুনলো রাঙাবৌ বলছে: হ্যাঁ ভাই করুণা—

—উঁ!

—বারান্দায় যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে বুঝি তুমি চেন না?

করুণা আশ্চর্য্য হয়ে বলল: চিনবো না কেন?

—তবে যে কথা কইলে না?

করুণা এবার চুপ করে রইল!

রাঙাবৌ আবার বলল: ভদ্রলোকটিকে জিগ্যেস্ করাতে তিনি বললেন—

—কী বললেন ?

—তুমি বড় লোকের মেয়ে,—বিলেত ফেরতের হবু বৌ, যার তার সঙ্গে তুমি নাকি কথা কও না!—বলতে বলতে রাঙাবৌ ঘর থেকে বেরুল ; পিছনে পুঁটলি হাতে করুণা !

—আচ্ছা আজ চলি ভাই বৌদি!—করুণা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলো ; তারপরই হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি এনে বলল : ভাই বৌদি, আমার বাবা বড় লোক কিনা জানি না ; কোন বিলেত ফেরতের খবরও রাখি না। তবে একথা মনে আছে, আমার ঠাকুরমা একদিন এ বাড়ার মাস-মাইনের রাঁধুনী ছিলেন।

—এ কথা বলবার মানে ?—করুণা প্রস্থানোদ্যত হয়েছিল, সত্যব্রত সগর্জ্জনে ছুটে গিয়ে তার পথরোধ করল।

করুণা ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রথমে মাথা নীচু করল ; তারপর তাকাল রাঙাবৌয়ের দিকে !

ব্যাপার দেখে রাঙাবৌ চট্ করে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। অগত্যা করুণা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : পথ ছাড়ুন—

—না। সত্যব্রত উগ্রস্বরে বলল : আমার কথার জবাব দিতে হ'বে তোমাকে—

—পথ ছাড়ো বলছি ! নিদারুণ উত্তেজনায় করুণারও গলা কেঁপে গেল।

—আগে জবাব দাও—সত্যব্রত আবার চেঁচিয়ে উঠল : কেন তুমি আমাকে অপমান করবে ?

করুণা আরক্ত মুখে একবার এদিক ওদিক তাকাল ; তারপর, চাপাস্বরে

বেশ করবো,—বলেই সত্যব্রতকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সবেগে নীচে নেমে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌও বেরিয়ে এল ঘর থেকে! কিন্তু সত্যব্রতর চোখে তখন প্রলয়ের আগুন। দেখে, রাঙাবৌ আর কোন রকম রসিকতা করতে ভরসা করলনা; ভাল মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করল: তুমি এখন বেরুবে নাকি?

—তুমি একটি আস্ত শয়তান! বলে, সত্যব্রতও ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল!

বাস্তব জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যারা যত বেশী সচেতন;—যারা যত বেশী স্পর্দ্ধা প্রকাশ ক'রে বলে: দুঃখকে তুচ্ছ করেও আমি উপলব্ধি করতে চাই পরম সত্যকে,—সাধারণত দেখা যায় তাদের উপলব্ধিগত সত্যটা আমিত্বের অহংকারে ঘোলাটে হ'য়ে গিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণ এক অন্য ব্যাপারে! বিশেষত স্বভাবের দিক্ দিয়ে, যদি সেই সত্যান্বেষীর শিক্ষিত ও সংযমী হিসাবে দম্ভ থাকে, তাহলে, রূপান্তরের প্রতিক্রিয়াটা তার জীবনে দেখা দেয় বিষক্রিয়ারূপেই! অভ্যাসবশতই চিন্তা করে সে; পারিপার্শ্বিককে বিচার করবার চেষ্টা করে সে ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিবাদীদেরই যুক্তি তর্ক দিয়ে; কিন্তু নিখুঁত বিশ্লেষণের বেড়াজালে পড়ে, তার নিজের খুঁতটি যে একেবারেই অবিশ্লেষিত রয়ে গেল, অতি সচেতন আমিত্বটা তার সে খবর রাখবার প্রয়োজনও মনে করে না! বেচারা সতুদা—

পূর্ব্বাপর

পুরোণ দিনের কথা স্মরণ ক'রে একটু কষ্ট হয় বিকাশের। বেচারা কী ছিল আর কী হয়ে গেছে! এমন যে উদ্বাস্তু সমস্যা এও তার কাছে নিছক পলিটিক্যাল নোংরামী ছাড়া আর কিছু নয়! তাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা—সামান্য একটু সহানুভূতিও প্রকাশ পেলনা তার কণ্ঠস্বরে!—ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে সত্যই কষ্ট হয় বিকাশের! বেয়াল্লিশের গণ-নেতা সাত-চল্লিশে এতখানি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল কী ক'রে? ইতিমধ্যে এমন কী ঘটল তার জীবনে, যা তাকে এই ভাবে ভেঙ্গে গড়ল?—লোকটা একেবারে বদলে গেল……

একটা গরুকে পাশ কাটাতে গিয়ে বিকাশের কনুইতে করুণার বাহু ঠুকে গেল! সে সচেতন হ'য়ে বলল: একটা ভীষণ কাণ্ড হ'য়েছে, বুঝলি?

—আমিও তাই ভাবছিলাম। করুণা হাসি চেপে বলল: বাক্যবাগীশের আজ হলো কী! প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল অথচ মুখে কথা নেই!

—না রে—বিকাশও হাসল; কিন্তু হাসিটা কেমন যেন মলিন। বলল: সতুদা আজ আমাকে ভড়কে দিয়েছে। একেবারে বদলে গেছে লোকটা—

একেবারে বিপরীত মন্তব্য শুনে করুণাও বিস্মিত হলো। এতক্ষণ সে-ও ভাবছিল সত্যব্রতরই কথা। লোকটা একটুও বদলায় নি! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে কাণ্ডটা সে করল, তাতে করুণা নিসংশয়ে বুঝে এসেছে, লোকটা শুধু বয়সেই বেড়েছে, আর কিছুই বদলায় নি তার! নাহলে, অমন করে করুণার পথ আটকাতে পারতো? একগুঁয়ে, গোঁয়ার-গোবিন্দর

মাথায় বুদ্ধি নেই এতটুকুও, আছে শুধু রাগ আর অভিমান!........ ইতিমধ্যে যে আট দশ বছর কেটে গেছে,—অনেক কিছুই বদলে গেছে, সে খেয়াল নেই; স্বচ্ছন্দে করুণাকে চোখ রাঙিয়ে বসল,—সেই আগেকার দিনের মতো! বুদ্ধির ঢেঁকির এ কথাটা মনেই পড়ল না যে করুণার পথ আট্‌কাবার অধিকার আর তার নেই!

—আমিও আজ তাই পেন্নাম ঠুকে চলে এলাম! বিকাশ তার মন্তব্যর উপসংহার করল!

বিকাশ এতক্ষণ কী যে বলছিল, তার একবর্ণও করুণার কানে ঢোকেনি। সে তাই আশ্চর্য্য হয়ে বলল: পেন্নাম ঠুকে এলে? তার মানে?

বিকাশ আবার দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও দাঙ্গা-দুর্গতদের বিরুদ্ধে সত্যব্রতর বর্ত্তমান উপলব্ধির কথাটা সংক্ষেপে জানিয়ে দি:য় বলল: লোকটা স্রেফ পাগল হয়ে গেছে!

করুণা বলল: তোমরা সবাই এক একটি নীরেট, ইয়ে......

—তার মানে?

—ও কবে পাগল ছিল না যে, আজ পাগল বলছো!

—তা ঠিক নয়! বিকাশ চিন্তিতমুখে বলল: আগে ও ছিল একসেন্‌ট্রিক। তাতে গবর্ণমেণ্টের যেমন ক্ষতি হ'তো তেমনি উপকারও হ'তো জনসাধারণের। কিন্তু এখন এক্‌সেনট্রিক দাঁড়িয়ে গেছে লুনাটিক-এ। ফল...

—ঘোড়ার ডিম! করুণা গম্ভীরভাবে বলল।

—ঘোড়ার ডিম নয়! বিকাশ মাথা নেড়ে বলল: এর ফল ওর

পক্ষে খুব সাংঘাতিক হ'তে পারে! এখনও যদি মুখ সামলে না চলে........

করুণা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে বিকাশের দিকে তাকাল!

বিকাশের চোখ ছিল রাস্তার দিকে। সে সন্তর্পনে একটা বাঁক নিয়ে, আবার বলল: তবে, ওর মতো অবস্থায় পড়লে, বোধহয়, সকলের মনের অবস্থাই এই রকম হয়। বুঝতে তো পারি কিছু কিছু......

করুণা জিজ্ঞাসা করল: কী আবার বুঝতে পারলে?

বিকাশ চুপ ক'রে রইল।

করুণা তাড়া দিয়ে বলল: বল না। কী হ'য়েছে?

—কী হ'য়েছে বুঝতে পারছিস না! বিকাশ গম্ভীরভাবে বলল: হ'য়েছে, রাগ,—অভিমান; বাবু তাই জ্বলে পুড়ে মরছেন!

—অভিমান? করুণা আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: কার ওপর?

—কার ওপর নয়? বিকাশ গম্ভীর হ'য়েই বলল: দুনিয়ার লোকের ওপর!—করতে চাইল বিয়ে; বাপ দিলে ভণ্ডুল করে; মাঝখান থেকে ফস্‌কে গে'লি তুই! করতে গেল জন-সেবা, পড়ে গেল রাজনীতির ফাঁদে; ফলে, খাটতে হ'লো জেল! কিন্তু, এতদিন ধরে এত যে কাণ্ড করল, বিনিময়ে পেল কী বল্‌তে পারিস?—অভিমান হ'বে না?

বিকাশের কল্পনার দৌড় দেখে করুণার মুখ লাল হ'য়ে উঠেছিল; সে চট্ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

—বুঝলি? —বিকাশ আবার বলল: আমার তো মনে হয়........

—তুমি থাম তো! করুণা ধমক দিয়ে উঠল: একেবারে সাইকোলজীর বিধাতা পুরুষ হ'য়েছেন...

ধমক খেয়ে বিকাশও ভড়কে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল : তা হতে পারে। আমার চাইতেও তুই ওকে বেশী Study করেছিলি তো!

—বিকাশদা! উগ্রস্বরে করুণা আবার বলে উঠল : ছোট বোনের সঙ্গে ইয়ার্কী হ'চ্ছে?

—চাপা দে বাবা!—গাড়ী ইতিমধ্যে ফিরিঙ্গীবাগানের ফটক অতিক্রম করেছিল। —বিকাশ সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলল : মামা শুনতে পাবে—

দশ

ফিরিঙ্গীবাগান—এ অঞ্চলের একটা বিখ্যাত বাগানবাড়ীর নাম! ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত অনুযায়ী বাড়ীটার বয়স অন্ততপক্ষে আড়াইশো থেকে তিনশো বছর। একদিন এই বাড়ীতেই বাস করতেন ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর। তারপর দেশের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটার চেহারা যত না বদল হ'য়েছে, হাত-বদল হ'য়েছে তার চাইতে ঢের বেশী। পঁচিশ বছর পূর্ব্বেও ফিরিঙ্গীবাগানের মালিক ছিলেন রায়-রাজারা। এই বাড়ীরই বলরুমে হ'তো তাঁদের বাইনাচ; সেলারে থাকতো বহুমূল্য অমৃত; কার্পেট-মোড়া প্রকাণ্ড ঘরগুলোতে প্রয়োজনমত আস্তানা গাড়তো রাজাদের ইয়ার-বকসী আর ভাড়া করা স্বজনীরা। তারপর ইজারার দৌলতে ফিরিঙ্গীবাগান দখলে আসে হৃদয়গোপাল মজুমদারের।

তখন কিন্তু বাড়ীটা ছিল ইজারাদারের জুটমিল ও জমীদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের একটা শাখা অফিস; তিনি নিজে থাকতেন গড়্-বাড়ীর পৈত্রিক ভিটেতে। কিন্তু বছর সাতেক পূর্ব্বে চলে যান (শত্রুপক্ষ বলে : করুণার বিবাহ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে) কোলকাতায়, তাঁর সন্ত কেনা তালতলার বাড়ীতে, কাজকর্ম্ম পরিচালনার সুবিধার অজুহাতে। তারপর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগুনে সে বাড়ী গেল পুড়ে; এদিকে তদারকের অভাবে দেশের পৈত্রিক বাড়ীটাও গিয়েছিল নষ্ট হ'য়ে; অগত্যা, উপায়ন্তর

না দেখে মেরামতীর কয়েকটা মাস তিনি ফিরিঙ্গীবাগানে এসেই উঠলেন। কিন্তু রহস্য এই যে, তালতলার বাড়ী সম্পূর্ণভাবে মেরামত হয়ে যাওয়া সত্বেও আর তিনি কোলকাতায় ফিরলেন না। কোন নিগূঢ় কারণে, শীকারপুরের বাসীন্দা হ'য়ে—সকলের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে—পাঁচজনের একজন হ'য়েই রয়ে গেলেন এখানে!

গুণীলোকের সন্ধান পেলে গুণমুগ্ধরও অভাব হয় না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি যাবতীয় গোলমেলে ব্যাপারে, তাঁরা হৃদয়গোপালের বিরাট অন্তঃকরণের বিবিধ পরিচয় পেতে লাগলেন। ক্রমে হৃদয়গোপাল হ'লেন কো-অপারেটিভ এর চেয়ারম্যান; বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী; স্থানীয় বারোয়ারীর প্রেসিডেণ্ট; রিফিউজী রিলিফ কমিটির ফাউণ্ডার—ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হ'লেন তিনি; এবং এ হেন লোকের সাক্ষাৎ পরামর্শ লাভের জন্য এ অঞ্চলের ছোট বড় অনেকেই সকাল সন্ধ্যে যাতায়াত আরম্ভ করলেন ফিরিঙ্গীবাগানে। দেখতে দেখতে বাগানবাড়ী হেসে উঠল! দাঙ্গা দুর্গতদের সাহায্যার্থে অভিনয়ের মহলা তো ছিলই, তার ওপর সত্যব্রত-অভিনন্দন সমিতির সর্ব্বাধুনিক ব্যাপারটা যেমন মুখর করে তুলেছিল ফিরিঙ্গীবাগানের অস্তিত্বটাকে তেমনি প্রকট করে ফেলেছিল তার মালিকের ব্যক্তিত্বটাকে!

সমিতির অফিস-বেয়ারার ও কার্য্য-পদ্ধতি গ্রহণের শেষ মীটিং বসেছিল, সেকালের সেই নাচঘরে। ইতিপূর্ব্বে সমিতির সভাপতি করা হ'য়েছিল কংগ্রেসী রাজকুমার চক্রবর্ত্তীকে। তাঁর সহ-র পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন যথাক্রমে কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট পার্টির দেবনাথ ভৌমিক;

মহাসভার ভগবানদাস আগারওয়াল ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কম্‌রেড কাশীমুন্সী! মীটিং-এর বর্ত্তমান অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতিত্ব দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট কমরেড প্রশান্তকে। এবং প্রশান্তও তার জন তিনেক সহ বেছে নেবার প্রস্তাব করেছিল আরও তিনটি বিপক্ষীয় দল থেকে,—বল্‌শেভিক পার্টি, মার্কসিষ্ট-ষ্ট্যালিনিষ্ট পার্টি ও সোবিয়েৎ সুহৃদ সঙ্ঘ।—অ-সভ্য হৃদয়গোপালের অর্থানুকূল্যে, কমরেড প্রশান্ত প্রমুখ স্থানীয় যুবকবৃন্দের সহযোগিতায়,—নির্য্যাতীত রাজবন্দী সত্যব্রতকে উপলক্ষ্য করে,—যে সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার পূর্ব্বাভাষ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হ'য়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু, বিশদ বিবরণ প্রচারের ব্যবস্থাটা যাতে বিশদভাবেই হয়, তার জন্যেও টেলিগ্রাম চলে গিয়েছিল এলাহাবাদে, প্রবীরের কাছে—তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্যে। সব ব্যবস্থাই যথাযথভাবে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মুস্কিল বাধল একটা ছোট্ট সমস্যার সমাধান নিয়ে: মেয়েদের ব্যাপারে মোড়লী করবে কে? আসলে, যে-ই করুক, কার নামটা কাগজে প্রকাশিত হওয়া উচিত। —পাড়ার প্রভাতী সেন না বাইরের কেউ! অর্থাৎ কার নামের ভারে ব্যাপারটার গুরুত্ব বাড়বে!

আলোচনা চলছিল। হঠাৎ প্রশান্ত উঠে প্রভাতীকে নাকচ করে দিল; পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করল আর একজন কমরেড সেন-এর নাম। ইনি কম্যুনিষ্ট এবং প্রভাতীর মতো রূপসী না হলেও, তুলনায় ঢের বেশী বিখ্যাত!

শুনে, অনেকেই অবাক হলেন। প্রশান্তর প্রস্তাবে মহানুভবতার

পরিচয়ও পেলেন অনেকে! —সর্ব্বদল সম্মেলনের আদর্শ বজায় রাখবার জন্মে, আজকালকার বাজারে ক'টা লোক নিজের পার্টির লোককে চেপে রেখে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে? কিন্তু, প্রতিবাদ উঠল! ঘরের এক কোণে বসেছিল গোঁসাইপাড়ার ফণী আর অবনী। দুজনেই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তারপর মুখ-চোরা অবনীকে ইতস্তত করতে দেখে ফণী বলল: যদি খ্যাতি-অখ্যাতির দাঁড়িপাল্লা ধরে মিস্ সেনকে বাদ দিতে হয়, তাহলে, প্রশান্তকেও তাড়ানো উচিৎ। কারণ, ওর চাইতে ঢের বেশী বিখ্যাত লোক এখানে আছে।

প্রশান্তর ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেল। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলনা; গম্ভীরভাবে বলল: উত্তম প্রস্তাব। আমি এই মুহূর্ত্তে চলে যাচ্ছি—

—হাঁ হাঁ—মণ্টু-ঝণ্টু-গুয়ে-রমুনা প্রমুখ কয়েকজনে মিলে ফণীকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠে দাঁড়াল পঞ্চানন-তলার ঠোঁটকাটা অজয়। সে হেঁকে বলল: আমরা এখানে নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছি—বসে পড়বার জন্মে আসি নি! আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি—আজকেকার মীটিং-এ মিস্ প্রভাতী সেনকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি কেন?

—তাই নাকি?—রাজকুমারবাবু আশ্চর্য্য হয়ে চাইলেন কন্‌ভেনর প্রশান্তর দিকে; প্রশান্তর মুখের অবস্থা তখন আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল; সে তাকাল দেবনাথবাবুর দিকে!

—এ প্রশ্ন অবান্তর! দেবনাথ ভৌমিক বললেন: এখানে শ্রমিক সঙ্ঘকে Represent করছেন কমরেড প্রশান্ত and that's all

—তাই নাকি মশাই ?—অজয় মুচকে হেসে বলল : আপনি কি বলতে চান মিস প্রভাতী সেনও শ্রমিক-সঙ্ঘের একজন মেম্বার ?

—আলবৎ।—গর্জ্জে উঠল মণ্টু-ঝণ্টুর দল।

—থামো তোমরা।—দেবনাথবাবু ধমক দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিতও হলেন : প্রশান্তর বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে সে বিষয় নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি বললেন : মিস্ সেন হয়তো শ্রমিক-সঙ্ঘের নাম লেখান মেম্বার নন্! কিন্তু তাতে কী হয়েছে? গান্ধীজীও তো কংগ্রেসের মেম্বার নন্। মিস্ সেন শ্রমিক-সঙ্ঘের হয়ে কাজ করবার জন্যেই এখানে এসেছিলেন এবং আজও যে তিনি ফিরে যান নি, সেও ওই সঙ্ঘের কাজের জন্যেই !

—আজ্ঞে না স্যার !—অজয় বলল : মিস্ সেন ফিরে যেতে পারেন নি গাড়ী ভাড়ার অভাবে। আমাদের কম্‌রেড প্রশান্তটি তাঁকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছেন—

—জানতে পারি কী—আর সামলাতে না পেরে প্রশান্ত বলে উঠল : একজন স্ত্রীলোকের হয়ে দালালী করবার এমন কী প্রয়োজন ঘটল এ মীটিং-এ ?

—আমারও ঠিক ওই প্রশ্ন! অজয় বলল : শ্রমিক-সঙ্ঘের কম্‌রেডের জন্যে সোশ্যালিষ্ট-এর আজ এত মাথা ব্যথা কেন ?

প্রচলিত পার্লিয়ামেণ্টারী পদ্ধতিতে মীটিং চলতে লাগল ; হঠাৎ ভগ্নদূতের মতো ঘরে ঢুকে বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল : মীটিং শিকেয় তুলে রাখুন স্যারেরা—সত্যব্রত রায় আপনাদের অভিনন্দন নেবে না !

সংবাদটার অভিনবত্বে সকলের সব উত্তাপ জল হয়ে গেল এবং

বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতোই অজস্র ধারায় প্রশ্ন বর্ষণ আরম্ভ হলো বিকাশের ওপর।

গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন হৃদয়গোপাল। ব্যস্ত হয়ে বললেন: হলো কী?

ব্যাপারটা সকলে এক সঙ্গেই তাঁকে জানাবার চেষ্টা করল। তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন! আস্তে—

তারপর সকলে নিস্তব্ধ হতেই, স্মিতমুখে বললেন: একজন বলো। কী হয়েছে দেবনাথবাবু?

দেবনাথ বললেন: বিকাশ বলছে, সত্যব্রত নাকি আমাদের অভিনন্দন নেবে না!

—ষ্টুপিড!—ভাগ্নের দিকে একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ্য হেনে হৃদয়গোপাল আবার সকলের দিকে তাকালেন। তারপর স্নিগ্ধস্বরে বললেন: আপনারা কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না! বিকাশ ভুল শুনেছে! মীটিং চালিয়ে যান!

—কিন্তু, এদিকে আর একটা ফ্যাসাদ বেধেছে স্যার। প্রশান্ত বনাম অজয়ের ঝগড়াটা উল্লেখ করে সোবিয়েৎ-সুহৃদ বলল: এর কী বিহিত করা যায় বলুন তো?

—ওহে—প্রশান্ত—হৃদয়গোপাল সহাস্যমুখে বললেন: তুমি যাঁর নাম করছো তিনি তো কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বার! তাঁকে নিলে, আইনতঃ কম্‌রেড কাশীমুন্সীকে ছাড়তে হবে যে!

—তাহলে—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল মার্কসিষ্ট-ষ্ট্যালিনিষ্ট: কমরেড প্রভাতীকেই নেওয়া হোক?

—ও সব আমি জানি না। —হৃদয়গোপাল বললেন : ও সব তোমাদের কাজ !

—আপনি স্যার একটা Suggestion দিন না ?

—No no my boy—it is your business. আমিই যদি সব করবো, তাহলে তোমরা আছ কী করতে ? —হৃদয়গোপাল দরাজ গলায় হেসে উঠে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে !

নাচঘর পেরিয়ে, আরও একটু ভেতর দিকে, করুণার পড়ার ঘরে চলছিল নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার মহলা। সঙ্গীত পরিচালিকা নীলিমা চক্রবর্ত্তী গলদঘর্ম্ম হয়ে জন চারেক মেয়েকে গান শেখাবার চেষ্টা করছিল ; আর করুণা প্রমুখ কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে তাই দেখছিল। এমন সময়ে হৃদয়গোপাল ঢুকে বললেন : O. K. ? তোমাদের ডিরেক্টর সাহেব কোথায় ?

নীলিমা সাবধানে তার জর্জ্জেট সামলে উঠে দাঁড়াল ; তারপর নীরস গলায় বলল : সুব্রতবাবু আজ আসেন নি এখনও।

—তোমার নিজের কাজ এগোচ্ছে তো, বেশ ?

—বেশ আর কই…

—বেশ বেশ !—নীলিমার হয়তো আরও কিছু বলবার ছিল, কিন্তু হৃদয়গোপাল তার পূর্ব্বেই পিছন ফিরলেন।

ফিরে, অন্দরে যাবার উপক্রম করছিলেন, মাঝপথে বিকাশের সঙ্গে দেখা হলো। চাপা-গর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করলেন : সতু কী বলেছে তোমাকে ?

তুই-র বদলে তুমি শুনেই বিকাশ মামার মেজাজ বুঝল ! সে, সভয়ে, অতি সংক্ষেপে সত্যব্রতর অভিমত জানাল।

—বুঝলাম!—হৃদয়গোপাল জলদ-গম্ভীরস্বরে বললেন: কিন্তু, কথাটা আগে আমাকে না জানিয়ে. ওদের বলতে গেলে কেন?

বিকাশ ঘেমে উঠল; কিন্তু তাকে বাঁচাল একটা চাপরাশী ছুটে এসে। সে বলল: কোলকাতার অফিস থেকে পাল সাহেব এসেছেন—

—এ সময়ে হঠাৎ!—হৃদয়গোপাল ব্যস্ত হয়ে তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন: ব্যাপার কী হে রাধানাথ?

রাধানাথের পোষাকে সাহেবী জৌলুষটা যেমনি প্রকট হয়ে উঠেছিল; ঠিক তেমনি শুখিয়ে গিয়েছিল মুখ-চোখ। সে উৎকন্ঠিত হয়ে বলল: একটা গোলমাল বেধেছে স্যার! Customs একটা আয়নার consignment আটকেছে; মাল জেটিতে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হৃদয়গোপাল ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন: Legal Licence-এর against-এ মাল এসেছে, Customs তার মধ্যে Illegal কী পেলে?

—Appraiser বলছে, mirror যে Plate glass-এর অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ কী?

—অর্থাৎ Silvered Plate glass আর mirror এক জিনিষ নয়?

—লোকটা তো তাই বলছে—

—এতাবৎকালের মধ্যে কেউ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেনি, সে কথা তাকে জানান হয়েছে?

—হয়েছে। কিন্তু সে, সব কাগজ-পত্র ঠেলে দিয়ে নতুন কিছু প্রমাণ চাইছে।

—প্রমাণ—মানে?

রাধানাথ লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করল। হৃদয়গোপাল আবার জিজ্ঞাসা করলেন: লোকটা বাঙ্গালী?

—বোধহয়। কিন্তু বাঙ্গালা কথা বলে না।

—বুঝেছি! নাও, লেখো—

রাধানাথ তাড়াতাড়ি Notes নিতে বসল।

চিঠি শেষ করতে সময় লাগল প্রায় পনের মিনিট; তারপর হৃদয়গোপাল বললেন: চিঠিখানার খান ছয়েক কপি করিয়ে এখানকার I. T. C., দিল্লীর I. T. C., এখানকার Bengal Chamber, দিল্লীর Commerce Department, আর জন দুই Opposition লীডারের কাছে forward করে দেবে। সঙ্গে ডেমারেজের টাকাটাও স্থদ সমেৎ কষে দাবী করে পাঠাবে। বুঝেছো, আপাততঃ এই করো; তারপর দেখা যাবে—

এই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

—Come in—

ঘরে ঢুকল বলশেভিক কমরেড স্থশীল, সঙ্গে আরও কয়েকজন। স্থশীল উত্তেজিতভাবে বলল: স্যার প্রশান্ত মুকুজ্জে আপনার firm-এর welfare officer হতে পারে,—কিন্তু সেই অজুহাতে সে আমাদেরকে অপমান করবে?

হৃদয়গোপাল তাড়াতাড়ি রাধানাথকে বিদায় দিয়ে বললেন: কী হলো আবার?

স্থশীল আরও উত্তেজিত হয়ে বলল: সে বড়লোকের ইদুর হতে পারে, তাই বলে, আমরা কেন তার চোখ-রাঙ্গানী সহ্য করবো?

—কিন্তু হলো কী ? কী করেছে প্রশান্ত ?

—ব্যাটা বলে কী জানেন ?—অসহ্য ক্রোধে সুশীলের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। বলল : আমরা নাকি এখানে আসতে পেয়েছি, তারই অনুগ্রহে ! যা দু' এক বাটি চা-টা খেয়েছি, তাও নাকি তারই অনুগ্রহে ! আমরা প্রতিবাদ করে বললাম,—আমরা এসেছি রায় বাহাদুরের ডাকে, তোমাকে আমরা চিনি না ! তাতে, বললে কী জানেন ? বললে, আপনি নাকি কিস্যু নন্—সে-ই সব ! তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার নাকি এক পা-ও চলবার উপায় নেই ! আমাদেরকেও চলতে হবে, তার ইচ্ছে মতো, হুকুম মতো—

—প্রকাশ্য মীটিং-এ একথা বলেছে প্রশান্ত ? হৃদয়গোপাল খুব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : কেউ প্রতিবাদ করলে না ?

—আপনি বলেন কি স্যার ?—একজন সোবিয়েৎ-সুহৃদ বলল : ওর দলের ছোঁড়াগুলো ছাড়া আর সকলেই প্রতিবাদ করেছে। each and everyone—সবাই ক্ষেপে লাল হয়ে গেছে স্যার ! কেবল আপনার খাতিরে—

—তোমরা আচ্ছা ছেলে তো !—হৃদয়গোপাল সহাস্যে বললেন : সবাই যার ওপর অসন্তুষ্ট, মীটিং-এ সে থাকতে পারে কী করে ? ভোট নাও না ! তোমরা যদি দলে ভারি হও, প্রশান্ত সরে যেতে বাধ্য হবে।

—বাধ্য হবে কী স্যার !—সোৎসাহে সুশীল বলল : ভোটের জোরে আমরা ওকে পাড়া ছাড়া করে দিতে পারি ! কিন্তু, মুস্কিল হয়েছে, —ও যে আপনার লোক !

—নাঃ তোমরা দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ! —হৃদয়গোপাল বললেন: প্রশান্ত আমার কর্ম্মচারী তা ঠিক! কুলীদের ওপর তার দরদ আছে দেখে, আমি তাকে welfare officer করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কী?

—কিন্তু, আপনি যে তাকে একটু ইয়ের চোখে দেখেন স্যার,—তাই আমরা ভরসা করে কিছু করতে পারছি না!

—আমি প্রশান্তকে স্নেহ করি বলতে চাও তো? হৃদয়গোপাল সস্নেহে বললেন: কিন্তু, আমি কি তোমাদেরকেও ভালবাসি না? একটু ভেবে-চিন্তে দেখ তো—

—আমরা তা জানি স্যার!—মার্কসিষ্ট-ষ্টালিনিষ্ট পার্টির একজন বলল: সেই জন্যেই তো আপনি ডাকলে কখনও না বলতে পারি না! কিন্তু স্যার,—এ কথাও আমরা তাহলে বলবো, প্রশান্তর সম্বন্ধে আপনি ভুল করেছেন! মজদুরদের ওপর তার দরদ সিকি পয়সারও নেই। —সে তো নিজেই তড়পায়—next election-এর জন্যে জমি তৈরি করছি!

—ও সব আমি বুঝি না!—হৃদয়গোপাল তাচ্ছিল্যভরে বললেন: বুঝতেও চাই না! আমি দেখেছিলাম—কুলীরা ওকে মানে-গোনে, তাই—

—সে সব এখন উল্টে গেছে স্যার!—বাধা দিয়ে সুশীল বলল: প্রশান্তর সর্ব্বস্ব এখন সোরাবজীর গর্ভে! ওর এখন টাকাও নেই—কারুর ওপর কম্যাণ্ডও নেই। মজদুররা এখন আর ওর কথা শোনে না।

—তা যদি হয়, তাহলে—হৃদয়গোপাল আস্তে আস্তে বললেন: কুলীরা যার কথা শোনে, এমন লোকেরই উচিৎ তাদের welfare officer হওয়া।

—Exactly,—সুশীল সসম্ভ্রমে বলল: আপনার মতো লোকের কাছ থেকে আমরা এই রকম নিষ্ঠাই প্রত্যাশা করি! তাহলে স্যার…

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

—কাম্ ইন।

ঘরে ঢুকলেন রাজকুমারবাবু,—সঙ্গে নীরু ডাক্তার। বললেন: ওহে হৃদয়, তোমার মীটিং যে এদিকে মেছো-হাটায় দাঁড়িয়ে গেল—

—শুনিছি। ব্যবস্থা হচ্ছে।

—তাছাড়া, তুমি তখন বিকাশের কথাটা কানেই নিলে না; কিন্তু, সত্যব্রত সত্যিই আমাদের অভিনন্দন নেবেনা বলেছে। এই নীরু নিজে শুনে এসেছে।—কেন আর ঝঞ্ঝাট্ বাড়াচ্ছো, বন্ধ করে দাও এ সব।

হৃদয়গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন: নীরুর সঙ্গে কোথায় দেখা হলো সত্যব্রতর?

—রাস্তায়।—নীরেন একটু হেসে বলল: কারা বুঝি চাঁদা চাইতে গিয়েছিল বারোয়ারী পূজোর জন্যে, তাই তাদেরকে তড়্পাচ্ছিল।

—তড়পাচ্ছিল? তার মানে? কী বলছিল?

—বারোয়ারী পূজোর নাম করে আমরা এদানীং যে সব কাণ্ড করছি, তার নাকি ক্ষমা নেই!

—কী ফ্যাসাদ!—রাজকুমারবাবু গুণ গুণ করে বললেন: আমাকে

যে দু' জায়গায় Preside করতে হবে! ওহে হৃদয়, তোমারও তো President-গিরি আছে মনসাতলায়....

হৃদয়গোপাল একটু হেসে নীরেনকেই বললেন: ওর রাগের আসল কারণটা কী? হঠাৎ পূজোর ওপর চটল কেন?

নীরেন বলল: বোধহয় পরের পয়সায় ফূর্ত্তি মারার জন্যে! বলছিল—জীব-মাত্রেরই দেহে-মনে ক্লেদ জন্মায়। সেই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেই অনেক রকম ফূর্ত্তির আশ্রয় নেয়, নাহলে, সামাজিক জীবনযাত্রার Balance ঠিক্ থাকে না! এইজন্যে কেউ মদ খায়; কেউ পলিটিক্স্-এর নেশা করে; কেউ বা শনিবার করতে যায় বাগানবাড়ীতে! But they are true to their motives. কেউ উচ্ছে ভেজে পটলের নাম করে না— পরস্মৈপদীরও ধার ধারে না। কিন্তু এই বারোয়ারী-বিলাসীদের motive সাংঘাতিক! মাতৃপূজার নাম করে এই ব্যাভিচার ক্ষমার অযোগ্য!

—অযোগ্য তো বুঝলাম; কিন্তু কী motive-এর কথা বলতে চায় সে?

নীরেন লজ্জিতভাবে একটু হাসল! বলল: উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের অনেক কাণ্ডর উদাহরণ দিয়েছিল—সে সব আপনার না শোনাই উচিৎ...

—বেশ, অনুচিত কাজ করোনা! হৃদয়গোপাল সহাস্যে বললেন: কিন্তু অভিনন্দন সম্বন্ধে কী বলে সে?

—বললে....

—থামলে কেন,—বল?

—বললে, ইজারাদারের মৎলব আমি বুঝিছি! ও সব হবে-টবে না।

হৃদয়গোপাল ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন: আমার মৎলব? সেটা আবার কী হে?

নীরেন হাসল, বলল: কে জানে!

হৃদয়গোপাল গম্ভীরভাবে সকলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন: সত্যব্রত রায় একজন নির্য্যাতীত রাজবন্দী! সে আমাদের কল্যাণ চেয়েছিল এবং সেই জন্যেই সহ্য করতে হয়েছে তাকে নির্য্যাতন! সুতরাং, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করবোই।—সে আমাদের অভিনন্দন নেবে, কি, নেবে না, দেখবার দরকার নেই! তোমরা কী বল হে?

—Exactly—সবান্ধব সুশীল তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব সমর্থন করল।

—তাহলে কাজ চালিয়ে যাও।—হৃদয়গোপাল প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললেন: প্রশান্ত সম্বন্ধে যা বললাম তাই করো। আর, মেয়েদের চেয়ার-ম্যানের পদটা, তোমরা যদি ইচ্ছে করো, প্রভাতীর বদলে নীলিমাকেও দিতে পারো! আসলে খাটছে সে-ই…

—আমি বলছিলাম কি—সুশীল তাড়াতাড়ি বলল: ওটা করুণাদেবীকে দিলে হতো না?

—নিশ্চয়ই না!—হৃদয়গোপাল চড়া গলায় বললেন: আমার মেয়েকে নিলে, লোকে ভুল বুঝে নিন্দে করবে।—নিন্দের কাজ আমি করি না! মোদ্দা, যা কিছু Dispute আজই মীমাংসা করে ফেলা চাই; কাল থেকে আসল কাজে নামতে হবে!

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে হৃদয়গোপাল দোতলায় চললেন; কিন্তু সিঁড়ির মুখে আবার দেখা হলো নীলিমার সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—কী কথা ?

—ও মেয়েগুলোকে কিছু শেখানো সম্ভবপর নয় !—নীলিমা অসহায়ের মতো বলল : আমি আর পারছি না—

—পারছো না, মানে ?—হৃদয়গোপালের মনের অবস্থা তখন অভিনয়ান্তে গ্রীনরুমে গমনোদ্যত অভিনেতার মতো; তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে গর্জ্জে উঠলেন : তাহলে তোমাকে রাখা হয়েছে কী জন্যে ?

গর্জ্জন শুনে নীলিমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল : রায় বাহাদুরের এ মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেনি সে !

—বোকা মেয়ে !—নীলিমার মুখের অবস্থা দেখে হৃদয়গোপাল সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়েছিলেন ; কিন্তু আর আত্মবিস্মৃত হলেন না। মৌখিক বিরক্তিটাকে বজায় রেখেই বললেন : অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্যেই তো, এত লোক থাকতে তোমাকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম। আর, তুমি এখন বলছো....এসো আমার সঙ্গে।

দোতলায় নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি নীলিমাকে বসালেন ; তারপর বললেন : এবার বল দেখি, কী তোমার অসুবিধে হচ্ছে ?

নীলিমা সংক্ষেপে তার অসুবিধার কথা বলল : যাদের গলায় সুর নেই, তাদেরকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাবে সে কী করে ? তাছাড়া, কয়েকটা মেয়ে যেমনি চালিয়াৎ তেমনি দুর্ব্বিনীত ! বিশ্বকবির কাব্য তো দূরের কথা,—এদের কাছ থেকে শালীনতাপূর্ণ কোন রকম কিছুই প্রত্যাশা করা যেতে পারে না !

পূর্ব্বাপর

ব্যাপারটা হৃদয়গোপালও যে জানতেন না, তা নয়। অভিনয় করে দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্য করার প্রস্তাবটা, প্রকাশ্যে করুণা, নীলিমা, সুব্রত প্রভৃতির দ্বারা প্রচারিত হলেও, মৎলবটা আসলে এসেছিল তাঁরই মাথায়। এর জন্যে প্রচারকার্য্য যতদূর করবার তা তিনি করেছিলেন; অধিকন্তু, অগ্রিম ডোনেসান্‌ও আদায় করেছেন তিনি অসংখ্য মাড়োয়াড়ী-ভাটিয়া বন্ধুদের কাছ থেকে। কিন্তু, মুস্কিল বেধেছে, অভিনেত্রীদের নিয়ে। এই সব অতি-আধুনিক ব্যাপারে পাড়ার গৃহস্থদের সহযোগীতা তিনি আশাও করেন নি এবং পান-ও নি। যারা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা সকলেই প্রায় মিল এরিয়ার! এদের বাপ্‌-দাদারা অধিকাংশই বেশী মাইনের মিল-চাকুরে। থাকেন ইউরোপীয় ষ্টাইলে; বলেন চৌদ্দ আনা ইংরিজী এবং প্রতিবেশীর বে-আক্কেলেপনা দেখে অনবরত দোহাই পাড়েন—কালচারের। এই কালচারের ছুঁচকেই তিনি ফালে রূপান্তরিত করবার মৎলব করেছিলেন। ফলও ফলেছিল। প্রস্তাবমাত্রেই কালচারিষ্টরা সানন্দে মেয়ে পাঠাতে সম্মত হয়েছিলেন, ক্রোড়পতি হৃদয়গোপালের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গোল বাধাল ওই কালচারেরই আতিশয্য!—অনুকরণের ব্যাপারে শীকারপুরীরা নকল করে দক্ষিণ কোলকাতার একটা সমাজকে; এই সমাজ নকল করে খাস্‌ সাহেবপাড়ার একটা সম্প্রদায়কে এবং স্বদেশী সাহেব সম্প্রদায় আবার অনুকরণ করে, প্রতি বৎসর যথাস্থানে গিয়ে।—এর ওপর আবার আছে ইংরিজী, বাঙ্গলা, হিন্দী সিনেমা-তারকাদের প্রভাব! পরিণামে, এই ডবল্‌-ট্রিপল্‌ অনুকরণের ঠ্যালায় এখানকার কালচারিষ্টদের অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে

একেবারে অসহনীয়। অপরপক্ষে, নীলিমার শিক্ষা-দীক্ষা খাস শান্তি নিকেতনের; খোদ রবীন্দ্রনাথের শিষ্যা ছিল সে কিশোরীকালে। সুতরাং…

নীলিমা আবার বলল: কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে, সত্যিই আমার আত্মসম্মানে বাধে!

তা ঠিক্! আত্মসম্মানের ব্যাপারেও কিঞ্চিৎ অভিমান থাকা নীলিমার পক্ষে স্বাভাবিক!—পিতা রাজকুমার চক্রবর্ত্তী একজন দু'পুরুষে ব্রাহ্ম; কুটুম্ব হিসাবে অসংখ্য অতিখ্যাত ব্যক্তির ঘরের লোক তিনি এবং এই সামাজিক কৌলীন্যের জন্যই তিনি লর্ড সিন্‌হা থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত, অনেকেরই খাতিরের পাত্র!—হৃদয়গোপাল একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন: বড়লোকদের কুটুম্ব হলেও রাজকুমার বাবু নিজে বড়লোক নন্; অথচ, বাইরের ঠাটে বড়লোকত্ব বজায় রাখবার দুর্ব্বলতা আছে ষোল আনার ওপর আঠার আনা।—তিনি এই দুর্ব্বলতার সুযোগটাই গ্রহণ করেছিলেন! পকেটে বকেয়া সেলাই জানা সত্ত্বেও চক্রবর্ত্তীকে টাকা ধার দিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। অধিকন্তু, উপযাচক হয়ে উপহার দিয়ে দিয়ে তিনি একেবারে কাবু করে ফেলেছিলেন ভদ্রলোককে। বিনিময়ে, রাজকুমারবাবুও কখনও পিসতুতো শ্যালককে বলে তাঁকে পাইয়ে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকার Scrap Iron-এর Tender, কখনও বা খুড়তুতো ভগ্নিপতিকে অনুরোধ করে জোগাড় করে দিয়েছেন মোটা অঙ্কের কাঁচের কনট্র্যাক্ট! মোদ্দা, বাপকে তিনি বাগিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু বিপদ বাধিয়েছে মেয়েটা—সর্ব্বদাই গম্ভীর—সদাই যেন চিন্তিত—অতীব দুর্ব্বোধ্য চরিত্রের মেয়ে এই নীলিমা চক্রবর্ত্তী! ওদের সমাজে সুযোগ-সুবিধে থাকা

সত্ত্বেও আজও বিবাহ করেনি। কারণ সন্ধান করতে গেলে, কেউ বলে : ব্যর্থ প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত! কেউ বা বলে : আরও গোলমেলে কথা! অথচ, এদিকে বয়স গড়িয়ে গেছে! সুন্দরী সে একেবারেই নয়—কোনদিন বোধহয় ছিলও না; কিন্তু সুবেশা!—তার এই সেজে গুজে থাকবার দুর্ব্বলতাটাকেই তিনি বিশেষভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু ইদানীং যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল : দেউলে পিতার বয়স্থা কন্যা, বিপত্নীক উপহারদাতার কাছ থেকে শুধু উপহার নিয়েই সন্তুষ্ট নয়,—সে যেন আরও বড় রকমের একটা স্থায়ী ব্যবস্থার প্রত্যাশী! মা-মরা করুণার কথা স্মরণ করে তিনি একবার শিউরে উঠলেন!—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার চিন্তিতও হলেন : চ্যারিটি-শো'র দিন পর্য্যন্ত নীলিমাকে ঠাণ্ডা রাখা যায় কী করে!

বিকাশ গলা খাঁক্‌রানি দিয়ে ঘরে ঢুকল। বলল : রাজকুমারবাবু ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—ওঃ—হৃদয়গোপাল বললেন : কী হ'লো মীটিং-এর?

—নীলিমা দেবীকে নেওয়াই সাব্যস্ত হ'লো।

—আর, প্রশান্ত?

—সে রেগে-মেগে তার দল নিয়ে চলে গেছে!

—আচ্ছা, তুমি আজ এসো—হৃদয়গোপাল নীলিমাকে বললেন : আমিও দেখি এদিকে কী করতে পারি!

এগার

একটা ঝড় আসছে!—সমস্তদিনের হৈ হল্লোড়ের পর বিকাশ শয্যা গ্রহণ করেছিল; কিন্তু, ঘুম আসছিল না। একটা যে ঝড় আসছে সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্রও নেই; কিন্তু অঘটনের দেবতাটিকে সমালোচনা করতে প্রবৃত্তি হ'লোনা তার! দোহাই ভগবানের! কৃতঘ্ন সে হ'তে পারবে না, না কাজে না চিন্তায়! ভুলেও যেন না সে ভোলে: সে কী ছিল আর কী হ'য়েছে এবং হয়েছে কার অনুগ্রহে! নিঃস্ব হোটেলওয়ালার ছেলে সে—জননী ছিল তার আরও দুস্থ আরও অসহায়! স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর, সদ্যবিধবা যখন তার শিশুটিকে কোলে ক'রে আত্মীয় স্বজনের দোরে দোরে ফিরেছিল আশ্রয়ের আশায়, তখন কেউ ফিরে চায়নি। সকলেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সামাজিক মানহানির ভয়ে; সকলেই চেয়েছিল হোটেলওয়ালা আত্মীয়কে অস্বীকার করতে। তারপর পেটের জ্বালায় তার মা যখন সত্যিই কোলকাতায় গিয়ে নিযুক্ত হলো পাইস্ হোটেলে,—রাঁধুনীবৃত্তিতে, সেই সময়ে সেই হোটেলেরই একজন উট্‌কো খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল—পরিচয়! মায়ের জ্ঞাতি খুড়োর ছেলে হৃদয়গোপাল মজুমদার।

হৃদয়গোপাল তখন লোহাপটির নতুন দালাল; মাসিক আয় বড় জোর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু, সে সব গ্রাহ্য না করে, তিনি ভগ্নি ও ভাগ্নেকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর গড়বাড়ীর খোড়ো ঘরে।

তারপর, সেদিনকার সেই শিশু ভাগ্নে,—যার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল, চায়ের দোকানের "বয়" হওয়া—তাকে তিনি মানুষ করে তুললেন নিজের ছেলের মতো। আজ বিকাশচন্দ্র একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক; মা তার বিপত্নীক ভাইয়ের সংসারে একমাত্র গৃহিণী; কিন্তু কার অনুগ্রহে? লোকে কথায় বলে:

জন—জামাই—ভাগনা—
তিন নয় আপনা—

কিন্তু দোহাই ভগবানের! অন্ততঃ একজনের জীবনে, এই প্রবাদ যেন মিথ্যা প্রমানিত হয়! পিতৃতুল্য অন্নদাতাকে কখনও যেন সমালোচনা করবার দুর্বুদ্ধি তার না হয়! এ মহাপাপ কখনও যেন তাকে প্রলোভিত না করে—দোহাই ভগবানের—

পরদিন সকালে, জলযোগের জন্য রান্নাঘরে গিয়ে বিকাশ লক্ষ্য করল মায়ের মুখখানা যেন একটু গম্ভীর। কারণ জিজ্ঞাসা করেও সদুত্তর মিলল না। সেখান থেকে ফিরে ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল—মাতুলের মুখ ততোধিক গম্ভীর।—এর মধ্যে আবার কী হ'লো রে বাবা! কিছু বুঝতে না পেরে সে করুণার খোঁজে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল!

করুণা তখন জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল, বিকাশের পায়ের শব্দ পেল না।

এ আবার আরও গম্ভীর নাকি?—বিকাশ নিঃশব্দে এগোতে লাগল।

এই সময়ে হঠাৎ একটা কাণ্ড করল করুণা। ধপ্‌ করে হাঁটু মুড়ে

বসে পড়ে সে সন্তর্পনে জানালার নীচের খড়খড়ি খুলল ; তারপর কী যেন লক্ষ্য করতে লাগল শরীরটাকে নানাভাবে বেঁকিয়ে চুরিয়ে। অর্থাৎ নিজেকে দেখতে না দিয়ে সে কিছু একটা দেখছে। বিকাশ কৌতূহলী হ'য়ে বলল : কী রে ?

করুণা চকিতভাবে উঠে দাঁড়াল ; তারপর, কতকটা যেন, বিকাশের পথরোধ করবার জন্যই দু' পা এগিয়ে এসে বলল : কী আবার....

আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে করুণার মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠেছিল ; কিন্তু সে সব কিছু চোখে পড়ল না বিকাশের, সে সকৌতুকে তার পাশ-কাটিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল—নিথর ঠাকুরুণের সঙ্গে কথা কইতে কইতে একজন লোক মোড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। পিছন থেকে দেখলেও লোকটিকে সে চিনতে পারল। কিন্তু, করুণাও কি ওকেই দেখছিল ?

কথাটা মনে হতেই বিকাশ যেন একটা প্রচণ্ড হোঁচট খেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সত্যিই যেন তার লোপ পেয়ে গেল বুদ্ধি-শুদ্ধি !—সে শুধু যুক্তিবাদীই নয়—পরিণামদর্শীও বটে। তাই, অভিভূতের মতো, মলিন মুখে তাকিয়ে রইল করুণার দিকে !

করুণা ইতিমধ্যে আয়নার সামনে গিয়ে চুল খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। মুখের অবস্থা, যেন অতিরিক্ত রকমের উদাসীন। আড়চোখে বিকাশকে একবার দেখে নিয়ে সে আরও মনযোগী হয়ে পড়ল চুলের ফিতে খুলতে।

কিন্তু, করুণা কি ভুলে গেছে—সে দীপক চৌধুরীর বাগ্‌দত্তা ? বিকাশ চুপি চুপি বলল : করুণা —

—উঁ—

—অমন করে কী দেখছিলি রে?

করুণা এতক্ষণ এই প্রশ্নরই ভয় করছিল; কিন্তু তাকে রক্ষা করলেন হৃদয়গোপাল। একতলা থেকে গর্জ্জন উঠল: বিকাশ—

—যাই।—বিকাশ তাড়াতাড়ি নীচে চলল!

ড্রইংরূমে হৃদয়গোপাল একা ছিলেন না। ইতিমধ্যে অবন, অজয়, ফণী, সুশীল প্রমুখ কয়েকজন এসে জুটেছিল। বিকাশকে দেখে হৃদয়গোপাল ব্যস্তভাবে বললেন: তোর এখন কী কাজ আছে?

—একবার ষ্টেশনে যেতে হবে।

—কেন?

—তিন হন্দর করোগেট পাঠিয়েছে দুর্গত-মিনিষ্ট্রি—হলুদপুর রিফিউজীদের জন্যে। সে গুলো ডেলিভারী নিতে হবে।

—বেশ, যাবার মুখে একবার নীরুকে ডেকে দিয়ে যাস্ দেখি।

বিকাশ ঘাড় নেড়ে চলে গেল। হৃদয়গোপাল তখন অজয়ের উদ্দেশে বললেন: প্রভাতীর বদলে নীলিমকে select করে তোমরা বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছো! সেদিন সুব্রতর কাছে শুনলাম, প্রভাতী এবার এখানে থাকবার জন্যে আসেনি; এসেছে, সব বেচে দিয়ে দিল্লীতে settle করবার জন্যে! ভাব তো, ওকে select করে, তারপর যথাসময়ে না পাওয়া গেলে কী বিশ্রী ব্যাপার হতো!

—আজ্ঞে তা তো বটেই।

—কিন্তু প্রশান্ত হঠাৎ প্রভাতীর ওপর অতো চট্‌লো কেন? তোমরা জান কিছু?

—জানি বৈকি! অজয় ঘটনাটা বলল:

সেই শান্তি-সম্মেলনের দিন রাত্রেই প্রশান্ত ও শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ বাধে, রমণদাস আর প্রভাতীকে নিয়ে। প্রশান্ত সেইদিনই সোরাবজীর শুঁড়িখানা থেকে শুনে এসেছিল—পার্টির একটা গোপন মৎলব ফাঁস্ হয়ে যাওয়ার কথা। এর জন্যে প্রশান্ত দায়ী করে রমণদাসকে; কিন্তু প্রভাতী প্রমান চেয়ে প্রতিবাদ করাতে ঝগড়াটা বেশী দূর গড়াতে পারেনি। কিন্তু তারপরই বাধল খোদ প্রভাতীর সঙ্গে। ওই ফাঁস্ হয়ে যাওয়া খবরটাকে ধামা-চাপা দেবার জন্যে প্রশান্ত তক্ষুনি একটা ঘরোয়া মীটিং করে রেসোলিউশানে সই করতে বলল প্রভাতীকে!

প্রভাতী আশ্চর্য্য হয়ে বলল: আমি তো এ সঙ্ঘের সভ্য নই; আমি কেন সই করবো?

প্রশান্ত বলল: তা হোক, আপনিই এখন আমাদের প্রধান মুরুব্বি। সই করুন—

প্রভাতী দৃঢ়স্বরে বলল: তা হতেই পারে না।

প্রশান্তরও তখন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। অভদ্রভাবে বলল: আলবৎ হতে পারে। আমিই আপনাকে ফাষ্ট ক্লাস্ ট্রেণ ভাড়া দিয়ে এখানে এনেছি।

প্রভাতী স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তারপর বলল: আমি এখানে এসেছি, একটা সর্ব্বদলীয় শান্তি-সম্মেলনে Preside করতে—কোন পার্টি বিশেষের হুকুম তামিল করবার জন্যে নয়!

প্রভাতীর ব্যাপার দেখে প্রশান্ত বোধহয় একটু ভয় পেল ; সে তখন প্রভাতীকে ছেড়ে রমণদাসকে হুকুম করল : সই করো !

রমণদাস্ তখন ঘরের এক কোনে শুয়ে জ্বরে ধুঁকছিল, অসহায়ভাবে জানাল : ও সব করবার অবস্থা এখন তার নয় !

—What ? প্রশান্ত খিঁচিয়ে উঠল : প্রেসিডেন্টের অর্ডার তুমি মানতে চাও না ?

—আপাততঃ পারছি না।

—তুমি জান,—এর জন্যে, এই মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি পার্টি থেকে ?

—তোমার খুশী।

—নেমকহারাম ! প্রশান্ত এবার ফেটে পড়ল : এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার ? আমারই খেয়ে আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ! হারামজাদা—মেয়ে মানুষ দেখে মাথা তোমার একেবারে ঘুরে গেছে ?—বেরোও—বেরোও এখান থেকে—এক্ষুনি বেরোও—

রমণদাসের জ্বর তখন বোধহয় একশ'-তিনের ওপর ; সেই অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে প্রভাতীর কাছে এসে বলল : আপনি চলে আসুন, আর অপমান সহ্য করবেন না—

প্রভাতী এতক্ষণ অবাক হয়ে চেয়েছিল। বলল : না, আমাকে কেউ অপমান করতে পারেনা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,—কে কাকে কার বাড়ী থেকে বার করে দিতে চায় ! এ বাড়ীটা তো শুনলাম আপনারই—

—তা হোক,—রমণদাস সঙ্কুচিতভাবে বলল : আপনি চলে আসুন এখান থেকে—

—না, আমি একটা কথা শুনতে চাই এই ভদ্রলোকটির মুখ থেকে। —বলে, প্রভাতী প্রশান্তর দিকে তাকাল। কিন্তু, কথাটা আর জিজ্ঞাসা করা হলনা, প্রশান্ত নিজেই তক্ষুনি পালাল সেখান থেকে।

—প্রশান্তর উচিত ছিল,—হৃদয়গোপাল সহাস্যে বললেন: মধ্যযুগের একজন রাজা-বাদশা হ'য়ে জন্মান। কিন্তু, তখন পালাল কেন?

—পালাবে না? অজয় বলল: রাগের মাথায়, রমণদাসের বাড়ী থেকেই রমণদাসকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল যে!

—ওঃ—হৃদয়গোপাল বললেন: কিন্তু, রমণদাসকে নেমকহারাম বলবার কারণটা কী তা তো বুঝলাম না! ওর বাড়ী-ঘর-দোর, জমি-জায়গা তো কিছু কম ছিল না!

—বাড়ীটা এখনও আছে বটে;—কিন্তু জমি জায়গা সব উড়ে গেছে—

—সেকি? কি করে গেল?

—সেই কথাই তো বলছি। অজয় বলল: যে লোকটা যথা সর্ব্বস্ব বিক্রী ক'রে শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়ে তুলল, তাকেই তাড়াতে চায় প্রশান্ত! আপনি জানেন না সে সব ইতিহাস?

—না, হৃদয়গোপাল তাচ্ছিল্যভরে বললেন: তোমরা তো জান, ও সব পার্টি-ফার্টির কথা আমার ভাল লাগে না! বড় নোংরা জিনিষ—

অজয় বলল: তা ঠিক! এই শ্রমিক-সঙ্ঘের ব্যাপারটাই দেখুন না: আজ যারা শ্রমিক-সঙ্ঘের সভ্য, একদিন তারা সকলেই ছিল, ফরোয়ার্ড-ব্লকের মেম্বার,—সত্যব্রত রায়ের চ্যালা! তারপর, সতুদার জেল হবার পর পার্টিতে ধরল ভাঙ্গন! বামপন্থীদল,—কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে কংগ্রেসে যাবার আর উপায় ছিলনা। তাই, কেউ নাম লেখাল কংগ্রেস্-সোস্যালিষ্ট

পার্টিতে ; কেউ গেল মহাসভায় ; কেউ বা হ'লো কম্যুনিষ্ট। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের শীকারপুর শাখার লীডারগুলো তখন এমনই কর্ত্তাভজা ছিল যে রমণদাসের মতো শিক্ষিত ছেলেরা বেশীদিন লয়ে লয় দিতে পারলনা ; পার্টি ছেড়ে দিয়ে নতুন সঙ্ঘ গড়তে আরম্ভ করল। তৈরি হ'লো শ্রমিক-সঙ্ঘ ; তাকে চালু রাখতে গিয়ে রমণদাসকে একে একে বেচতে হ'লো যথাসর্ব্বস্ব !—ইতিমধ্যে, প্রশান্তরও বাপ মরেছিল। বাপটির কথা মনে আছে তো আপনার ? ছিলেন P. W, D-র একজন কেরাণী। পেন্‌সেন নিয়েছিলেন একশ পঁচিশ-এ, কিন্তু মরবার পর দেখা গেল, নগদ রেখে গিয়েছেন অন্ততপক্ষে তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। তাছাড়া এখানকার বাড়ীটাও বড় করেছিলেন, অনেক খরচ করে ! দু' পক্ষের দুটি ছেলে। বড়, সুশান্তর মা নেই ; সুতরাং বাড়ীর অর্দ্ধেক ছাড়া সে আর কিছুই পেলনা। ছোট, প্রশান্তর মা ছিল ; তাই সিন্দুকের নগদ টাকাটা সবই পেয়ে গেল।

—তারপর ?

—Public Waste Department-এর টাকাগুলো তো আর বৃথা যেতে পারে না ! প্রশান্তর মাথায় ব্যবসার মৎলব ঢুকল। বন্ধুরা বলল : লুটি তো ভাণ্ডার মারি তো গণ্ডার ! তুই সোরাবজীর মতো একটা মদের দোকান কর—আমরা তোকে দু'দিনে বিড়লা বানিয়ে ছেড়ে দোব। কিন্তু খোদ সোরাবজী দিলেন আরও মোক্ষম রকমের পরামর্শ। বললেন, বিড়লার মতো লোকেরাও যে ভাণ্ডারে খাজনা জমা দেয়, সেই ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী হওয়াটা কি আরও বড় রকমের ব্যবসা নয় ? পরামর্শটা বেশ ভাল মনে হলো প্রশান্তর। কিন্তু গণ-নেতা সেজে

ইলেক্‌সনে জিতে কার্য্যোদ্ধার করতে গেলে আগে চাই মূলধন—অর্থাৎ পার্টি। ওদিকে,—কংগ্রেসের মতো খানদানী পার্টিতে যোগ দেওয়ার ফল, —জন্মভোর কিউয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বয়স্থ মহারথীরা মহাপ্রস্থান করবার পর, তবে তো chance মিলবে নবীন রথীদের। সুতরাং ও হ্যাঙ্গামে না গিয়ে প্রশান্ত পাড়ার শ্রমিক-সঙ্ঘে গিয়েই যোগ দিল।—এদিকে পার্টি-তরুণরাও এতদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল; আচম্‌কা একজন গৌরী সেন পেয়ে, রাতারাতি লীডার বদলে ফেলল—

—তার মানে?

—মানে, রমণদাসের সম্পত্তির মধ্যে, খোড়ো-বাড়ীটা ছাড়া আর সবই উড়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে! বনেদী মেম্বারদের পেট্ চলছিল, চাঁদার ওপর নির্ভর করে! তাইতো প্রশান্তকে পেয়ে ওরা লীডার বদলে ফেললে!

—তারপর?

—তারপর, শুনলুম, প্রশান্তর সর্ব্বস্বও ইতিমধ্যে চলে গেছে পার্টি পুষতে গিয়ে—

—ইস্!—যেন ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন, এমনি একটা ভাব প্রকাশ করে হৃদয়গোপাল বললেন: বল কী হে? ছেলেটা আচ্ছা বোকা তো!

—আজ তাকে বোকা বলছেন!—ঠোঁট্-কাটা অজয় মুচ্‌কে হেসে বলল: কিন্তু, একদিন তার দাপট্ দেখেই আপনি তাকে welfare officer করেছিলেন!

—উনি সে সবের কী জানেন?—বাধা দিয়ে সুশীল বলল: মজদুররা

সেদিন প্রশান্তকে মেনে চলতো, তাই সে চাকুরী পেয়েছিল। আজ যদি···মানে, যদি তুমিই ধরো ওদের লীডার হ'ও,—তাহলে তোমাকেও ইনি প্রশান্তর জায়গায় বসাবেন!

—ও সব বাজে কথা রাখ!—সুশীলকে ধমক দিয়ে অজয় হৃদয়-গোপালের উদ্দেশে বলল: এই সব দেখে শুনে,........

বাধা পড়ল। নীরেন ঘরে ঢুকে বলল: ডেকেছিলেন আমাকে?

—হ্যাঁ!—হৃদয়গোপাল বললেন: তুমি তো প্রভাতীর বাড়ীতে যাও, না?

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা বুঝতে না পেরে নীরেন একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর বলল: প্রভাতী দেবী দু'দিন দুটো কল দিয়েছিলেন। তাঁর মায়ের হার্ট ডিসিসের জন্যে!

—শুনছি, মেয়েটি নাকি শীগ্‌গীরই চলে যাবে এখান থেকে। তুমি কিছু জানো?

—জানতাম না,—এই মাত্র শুনলাম সতুর কাছে!

—সতু? সে এসেছিল নাকি এদিকে?

—হ্যাঁ! আপনার কাছ থেকে ফিরে,—আমার ওখানেই তো ছিল এতক্ষণ!

—সতু—আমার কাছে এসেছিল?—সেকি?

—সেকি?—নীরেন আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বলল: আপনি জানেন না?

—না তো!—হৃদয়গোপাল অভিভূতের মতো বললেন: কী রকমটা হলো তাহলে···কী আশ্চর্য্য!

বারো

ব্যাপারটা সত্যব্রতকেও কম আশ্চর্য্য করেনি—

গতকাল রাঁধুনী পিতামহীর উল্লেখ ক'রে, করুণা আসলে কী বলতে চেয়েছিল, সত্যব্রত তা বুঝেছিল। এবারে বাড়ী ফেরবার দিন কয়েক পরের কথা: একদিন সকালে হৃদয়গোপালের বেয়ারা এসে তাকে একটা চিঠি দেয়। ইংরিজীতে লেখা অফিসিয়াল চিঠি; লিখেছিলেন ইজারাদারের ম্যানেজার। বক্তব্য: সত্যব্রত অবিলম্বে যেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে,—জরুরী প্রয়োজন।

সেদিন সকাল থেকেই একাদশী পড়েছিল এবং পূর্ব্বাপর অসুস্থতার কথা স্মরণ করে সত্যব্রতও সময় বুঝে শয্যা গ্রহণ করেছিল। পায়ের ক্রমবর্দ্ধমান যন্ত্রণার কথা ভেবে সে যখন আতঙ্ক বিহ্বল, সেই সময়ে, বেয়ারা মারফৎ আদেশ এল, ইজারাদারের নয়—তাঁর বেতনভুক ম্যানেজারের: অবিলম্বে দেখা করো!

মেজাজ্ তার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল নিঃসন্দেহ! কিন্তু সে কথা তো সে প্রকাশ করেনি; তবে কেন করুণা তাকে ভুল বুঝলো? চিঠির উত্তরে ইংরিজীতেই লিখেছিল সে: আপাততঃ আমার পক্ষে, কোথাও গিয়ে কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর নয়! প্রয়োজনটা যদি সত্যিই জরুরী হয়, তাহলে, ইজারাদারের পক্ষেই জমীদারের সঙ্গে দেখা করতে আসাটা বাঞ্ছনীয়!

অবশ্য চিঠির ভাষাটা একটু রূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, একটা অসুস্থ মানুষের সাময়িক উত্তেজনাকে করুণা যদি স্বাভাবিক প্রকৃতি বলে ভুল করে, তাহলে,....তাহলে তো মহামুস্কিল!

মুস্কিলের কথা ভাবতে ভাবতে সে আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে! সন্ধ্যার আড্ডায় সে যথারীতি উপস্থিত থাকল; কিন্তু যোগ দিতে পারল না। ঘুরে ফিরে, মাথার মধ্যে কেবলই করুণার মুখখানা ভেসে ওঠে; সঙ্গে, তার চাপা গর্জ্জনের—সরো বলছি।

কী আপদ! আজ না হয় করুণা তার পর হ'য়ে গেছে; কিন্তু, একদিন কি সে আপনার ছিল না? তবে, কেন সে তাকে দাম্ভিক—ইতর বলে ভুল করবে? তার এ ভুল কি ভেঙ্গে দেওয়া যায় না? কাছে ডেকে, আর কি তাকে নিজের মনের কথা বলা চলে না—আগেকার দিনের মতো?

মেজাজ্ আরও দমে যায়, করুণার পূর্ব্বাপর ব্যবহারের তারতম্য বিশ্লেষন করে।—সত্যব্রত একদিন তার অতি-আপনার ছিল বলেই কি আজ এতখানি পর হয়ে গেছে! করুণার কাছে এখন সে একজন অপরিচিত "আপনি"! কিন্তু, একজন হবু-পরস্ত্রীর কাছে, এ ছাড়া আর কোন পরিচয় থাকতে পারবে না তার? পরস্ত্রী হ'তে হ'লেই কি তাকে নিঃশেষে ভুলে যেতে হ'বে পূর্ব্ব-জীবনের সব কথা! এতই কি সস্তা মানুষের জীবন! মুহূর্ত্তের ভুলেও কি তার মনে পড়বে না এমন কারুর কথা,—একদিন যাকে সে নিজের বলে ভাবতো! যে দাম্ভিক ছিল না—ছিল না ইতর!—ছিল একান্তভাবেই তার অনুগত!

পূর্ব্বাপর

করুণার ভূতটা তাকে ভাল করে ঘুমোতে পর্য্যন্ত দিল না; পরদিন শয্যাত্যাগ করল সে—বিশ্রী রকমের অবসাদ নিয়ে! কী বিপদ! সমস্তক্ষণ বসে বসে এই করবে নাকি সে?

একটু অন্যমনস্ক থাকতে পারলে মন্দ হ'তোনা; কিন্তু, তাই বা কী করে সম্ভব। ছুটির দিন ছাড়া সকাল বেলায় কেউ আড্ডা দিতে আসেনা তার কাছে; সুতরাং সে শুড়ে বালি। আগেকার দিনের মতো, রাঙাবৌয়ের সঙ্গে রগড় বাধিয়েও অন্যমনস্ক হ'বার প্রবৃত্তি হয় না তার, কারণ—

—তোমার কী হ'য়েছে বলতো?—হাতে জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল রাঙাবৌ। বলল: কাল থেকে দেখছি, কী যেন ভাবছো অনবরত—

—করুণার কথা ভাবছি—আচমকা গর্জ্জে উঠল সত্যব্রত: এই তো বলতে চাও?

গর্জ্জন শুনে রাঙাবৌ প্রথমে ভড়কে গিয়েছিল। তারপর ব্যাপার বুঝে হাসল। মনে মনে বলল—ঠাকুরঘরে কে রে?—না, আমি তো কলা খাইনি।—মুখে বলল: ওমা, আমি কেন তা ভাবতে যাব? কিন্তু, কী হ'য়েছে বলনা গো?

—কী আবার হ'বে?

—নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে।

সত্যব্রত বিরক্ত হ'য়ে আর উত্তর দিল না—জলযোগে মনোনিবেশ করল। অগত্যা, অন্যকথা পাড়ল রাঙাবৌ। বলল : আজ একটা জিনিষ করছি,—খেয়ে কিন্তু সত্যি কথা বলতে হবে।

—কী ?

—বিরিয়ানী। বই পড়ে শিখেছি—

মোগলাই-খানার কথায় হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল সত্যব্রতর মনে। একটু ইতস্তত ক'রে বলল : আচ্ছা রাঙাবৌ, ওই যে সুকৃতি মেয়েটি,—ও তো কিছুদিন হারেম-বাস্ করে এসেছে না ?

অকস্মাৎ এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ বুঝতে পারল না রাঙাবৌ। বিস্মিতভাবে বলল : হুঁ—

—আচ্ছা, ওদের সমাজে তো তালাক, নিকে, হরবখৎ চলে, না ?

—হুঁ—

—আচ্ছা, মেয়েগুলো কী ক'রে একজনকে ভুলে গিয়ে আর একজনের ঘর করে বলতে পারো ? একটুও কি তাদের মন কেমন করে না ?

—ওদের মনের কথা আমি জানব কী করে ?

—ওদের সমাজের না হ'লেও, তুমিও তো মেয়ে রাঙাবৌ ! বলনা একটু ভেবে,—সত্যিই কি তোমরা ভুলে যেতে পারো অমন করে ?

—কী যা তা বক্‌ছো ?—প্রশ্নটা সাধারণ বুদ্ধিতে আপত্তিকর ; রাঙাবৌ তাই বিরক্ত হলো।

—বলবে না তো ?

—খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি!—রাঙাবৌ বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে! দেখে, সত্যব্রতও বিরক্ত হলো: রাগ করবার মতো এমন কী হ'লো আবার! অগত্যা, সে লাইব্রেরীতে চলল—অন্যমনস্ক হবার জন্যে!

পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত, বিভিন্ন বিষয়ের বিরাট সংকলন,—এই গ্রন্থাগারটির প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল সত্যব্রতর! সম্পত্তিটা যদিও সরীক সাধারণের, কিন্তু বাস্তবিক জিম্মাদার হ'য়ে পড়েছিল—একমাত্র সত্যব্রতই! তার গ্রন্থ সংরক্ষণের সযত্ন পরিকল্পনা; নিজের পয়সায় বই কেনা; পঠন-পাঠনের নিয়ম-নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে, সাহিত্য-অরসিক অন্যান্য সরীকরা, আপত্তির বদলে আনন্দই জানিয়েছিল এ ব্যবস্থায়! এই লাইব্রেরীটার জন্য, সত্যব্রতর অশান্তির সীমা ছিলনা বন্দী অবস্থায়; কিন্তু বাড়ী ফিরে সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল,—বইগুলোর অবস্থা দেখে; এক ফোঁটা ধুলো পর্য্যন্ত জমেনি কোন র‍্যাকের থাকে। এর জন্যে সে সাড়ম্বরে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, সুব্রতকে!

কিন্তু আজ তাকে বিস্মিত করল গোটা দুয়েক নতুন আলমারীর অস্তিত্ব। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়ে দেখল, সংকলনটা শুধু দুর্মূল্যই নয়, দুষ্প্রাপ্যও বটে। প্যারীর Bibliotheque Nationale-এর গ্রন্থাধ্যক্ষ Leon Vallee সম্পাদিত Limited Edition-এর চার ভল্যুম ম্যাডাম ডুব্যারী; দু' ভল্যুম ফুচি; দু ভল্যুম ট্যালির‍্যাণ্ড; দু ভল্যুম জোসেফিন; দু' ভল্যুম রিচল্যু—

দেখতে দেখতে সত্যব্রতর মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম করল: শুধু প্রথম নেপোলিয়ান সম্বন্ধেই বত্রিশখানা বই; তৃতীয় নেপোলিয়ানের ওপর সাতখানা; এ ছাড়া, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ লুই; রাণী মেরী; রবসপীয়ার, রুসো, ভল্‌টেয়ার, কার্লাইল,—এক কথায় ফরাসী বিপ্লবের আদি-অন্ত জানবার পক্ষে একটা নিখুঁত সংকলন ঠাসাঠাসি করে রাখা ছিল আলমারী দুটোর মধ্যে! কিন্তু কে সংগ্রহ করলে এই অমূল্য সম্পদ! কে এই ইতিহাস-রসিক দার্শনিক পণ্ডিত....

সুব্রত ঘরে ঢুকল। অন্যদিন এ সময়ে সে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ে, কিন্তু আজ যেন তাকে ব্যস্ত মনে হলো; সে ড্রয়ার খুলে কী একটা কাগজ নিয়ে আবার প্রস্থানোদ্যত হ'লো।

—তুই কি কোথাও বেরুচ্ছিস? সত্যব্রত বলল: একটু বোস্‌ না—

—একটু তাড়াতাড়ি ছিল—সুব্রত উস্‌খুস্‌ ক'রে বলল: মিস্‌ সেন আবার বেরিয়ে যাবেন!

—মিস্‌ সেন—মানে—প্রভাতী? সত্যব্রতর জিজ্ঞাসা গোলমাল হ'য়ে গেল। একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: তার কাছে আবার তোর কী দরকার? তোরও আবার পলিটিক্‌স্‌-এর ব্যায়রাম্‌ ধরল নাকি?

—না। সুব্রত হেসে বলল: আমি ওঁর লাইব্রেরীটার একটা ষ্টক নিচ্ছি। ভাবছি সবটাই কিনে নোব।

—প্রভাতীর লাইব্রেরী? মানে, তার বাপের Collection? সত্যব্রত বিমূঢ়ভাবে বলল: বেচে দিচ্ছে নাকি প্রভাতী?

—শুধু লাইব্রেরী কেন! সুব্রত বলল: উনি তো সব কিছুই বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তুমি শোন নি?

—না তো। কোথায় চলে যাচ্ছে?

—শুনলুম দিল্লীতেই Settle করবেন—

—ওই আলমারী দুটো তাহলে···

—আমিই কিনে নিলাম! সুব্রত উৎসাহিত হ'য়ে বলল: ওই রকম আরও গোটা দশেক আলমারী ঠাসা বই আছে।

সত্যব্রত বিমূঢ় বনে গেল। বলল: হতভাগা মেয়েটা এই ভাবে নষ্ট করছে মরা-বাপের সম্পত্তি! রজত সেন যে একজন দেশ-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন—

সুব্রত বলল: নষ্ট আর করলে কোথায়! বরং বিক্রী ক'রে বুদ্ধিমতীর কাজই তো করছেন! নাহলে, সবই তো যেত উইয়ের গর্ভে!

—অবাক কাণ্ড!—সত্যব্রত বলল: প্রভাতী যে লাইন বেছে নিয়েছে, তাতে ইতিহাস পড়া যে বিশেষভাবেই দরকার।···আর ও কি না সচ্ছন্দে বেচে দিচ্ছে বইগুলো! মহা বোকা মেয়ে তো!

—বোকা বোধহয় তিনি নন্! সুব্রত মুচকে হেসে বলল: আমাদের দেশে গন-নেতা হ'তে হ'লে, নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়াটাই যথেষ্ট; বরং বেশী লেখা-পড়া শেখার অসুবিধে আছে!

সত্যব্রত মিনিট খানেক হাঁ করে চেয়ে রইল; তারপর একটু হেসে বলল: প্রভাতীর বিদ্যাবুদ্ধির কথাটা জানা গেলনা বটে, কিন্তু তোর কথাটা বুঝলাম!

সুব্রতও হাসল; কিন্তু এ সম্বন্ধে সত্যব্রতর অভিমতটা কী, তা জানবার চেষ্টা করল না।

সত্যব্রত আবার বলল: প্রভাতী এবার তাহলে, এখানে এসেছে মৎলব করেই! প্রশান্তর দলে লীডার-ই করাটা গৌণ; আসল মৎলব হ'চ্ছে পৈত্রিক যথাসর্ব্বস্ব বেচে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা।

—হয়তো তাই।

—কিন্তু, ওর বুড়ী মা-টা যে আজও স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে; তার কী হ'বে? তাকেও বেচে দেবে নাকি?

—শুনলাম, পেনসেন্ দিয়ে কাশী না বৃন্দাবন, কোথায় চালান দেবে!

—বেশ বেশ। কিন্তু এ সব ব্যাপারে প্রভাতীর দাদা, বাদল সেনের মত আছে তো?

—তা ঠিক জানি না!

—হুম্—

—তখন কী বলবার জন্যে আমাকে আটকালে যেন···

—ও: হ্যাঁ!—সত্যব্রত আবার তার আসল সমস্যায় ফিরে এল। বলল: আচ্ছা, তুই তো বহুকাল বিলেতে ছিলি—ওদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তোর নিশ্চয়ই কিছু আছে?

—তা হয়তো থাকতে পারে!

—আচ্ছা, ওদের ডি ভোর্সের রহস্যটা কী বলতে পারিস?

—কোন রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করছো?

—এই ধর—সত্যব্রত হঠাৎ যেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল। বলল: মেয়েগুলোর মন কেমন করেনা, পূর্ব্বস্বামীর জন্যে?

প্রশ্নটা সুব্রতকে বিস্মিত করলেও, বাইরে যাবার তাড়ায় সে একটা গতানুগতিক জবাব দিল। বলল: জ্ঞানী গুণীরা কেউ বলেন, ওরা

প্রহেলিকা, কেউ বা বলেন, কাদার ডেলা! দেবতারা যা জানতে পারলে না, আমি তা জানব কী করে!

—কাদার ডেলা? সত্যব্রত চিন্তিত হয়ে পড়ল!

—আচ্ছা আমি চলি। সুব্রত বেরিয়ে গেল!

কয়েক মিনিট পরে সত্যব্রতও উঠে পড়ে।—এইভাবে বসে বসে কাঁহাতক মেজাজ খারাপ করা যায়! তার চাইতে কোথাও গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে এলে বরং মাথাটা সাফ্ হ'লেও হ'তে পারে!

আড্ডার কথায় নীরু ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। বাল্যবন্ধু সে! পেট্রোল পুড়িয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে তার খবর নিয়ে যায়; অথচ, তার ওখানে বড় একটা যাওয়া হ'য়ে ওঠে না!—সত্যব্রত মনসাতলার উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়ল!

তেরো

গড়বাড়ী থেকে মনসাতলা, পাক্কা তিন পোয়া পথ শর্টকাটে। সোজা রাস্তায় দেড় মাইলেরও ওপর। সাইকেল রিক্সর্ বাঁধা দক্ষিণা চার আনা। বাস্‌ও পাওয়া যায় দশ পনেরো মিনিট অন্তর;—ভাড়া ছ' পয়সা। কিন্তু ট্যাঁকের কথা ভেবে সত্যব্রত হেঁটেই চলল।

এও আর এক সমস্যা!—দুশ্চিন্তা তার ভিন্নমুখী হয়ঃ এখানকার দৈনন্দিন জীবনে সাইকেল অপরিহার্য্য! কিন্তু বছর পাঁচেকের অব্যবহারে নিজের বাইক্‌টা তার একেবারে লড়্‌ঝড়ে হ'য়ে গেছে। অথচ, বর্ত্তমানে ট্যাঁকের যা অবস্থা তাতে, মেরামতী খরচ জোগান—অসম্ভব····

কিন্তু এ সমস্যা সমাধানেরই বা উপায় কী! সর্ব্বাগ্রে সব চাইতে সোজা উপায়টাই মাথায় আসে: রাঙাবৌয়ের কাছে হাত পাতলে কেমন হয়? সুব্রতর কল্যাণে রাঙাবৌয়ের সংসার এখন বেশ ভালই চলছে; সুতরাং সত্যব্রতর মাসোহারা থেকে যৎকিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত আশা করাটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবেনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে সে: যা কখনও সে করেনি, আজ তাই করবে সে কোন লজ্জায়? বড় সরীকের মাসোহারা,—রাঙাবৌয়ের হেফাজতে জমার ব্যবস্থা করেছে সে নিজে—ইজারাদারকে যথাবিহিত আদেশনামা লিখে দিয়ে! আর আজ নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই নাকচ করবে,—যেহেতু রাঙাবৌয়ের এখন সুব্রত জুটেছে···ছিঃ, তার চাইতে বরং একগাছা দড়ি জোগাড় করবে সে গলায় দেবার জন্যে!

অথচ, অর্থ সংগ্রহের একটা উপায় তাকে করতেই হবে! অবশ্য, কিছু উপাদান সে সংগ্রহ ক'রে রেখেছে; কিন্তু প্রবীর না ফিরলে লেখাগুলোর তো ব্যবস্থা হ'তে পারে না! ভাল নমস্কারীর প্রত্যাশা করলে—লেখাটা জানা-শোনা লোকের হাত দিয়ে পাঠানোই বাঞ্ছনীয়! কিন্তু প্রবীর যদি তাড়াতাড়ি না ফেরে? তাহলে কী করবে সে?

সঠিক পন্থা খুঁজতে গিয়ে চিন্তার বিষয় বস্তু তার আরও এলোমেলো হ'য়ে যায়: সে কী করবে, ভাবতে গিয়ে, মনে পড়ে যায়, সে কী করেছে! বছর পাঁচেক পূর্ব্বেও টাকার অভাব তার ছিলনা! স্বনামে বেনামে অসংখ্য গণ-সাহিত্য তর্জ্জমা করেছে সে। তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, জবরদস্ত নকল-নবিশ হিসাবে সে শুধু সুনাম-ই অর্জ্জন করেনি,—প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করেছে। বছর পাঁচেক পূর্ব্বেও, মাসে দেড়শো থেকে দু'শো টাকা পর্য্যন্ত ঘরে এসেছে তার—দৈনিক মাত্র ঘণ্টা তিন চার পরিশ্রমের বিনিময়ে। তার ওপর—

লোকে কি আর সাধে বলে: খোদা যব্ দেতা ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা!—আশাতীতভাবে সে প্রায় আঠার হাজার টাকা পেয়ে গিয়েছিল, পিতার মৃত্যুর পর। টাকাটা হস্তগত হ'য়েছিল স্বর্গতা জননীর অলঙ্কার বিক্রী ক'রে,—যে অলঙ্কার তার পিতা সযত্নে রক্ষা করে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রবধূর জন্যে!

ঘটনাটা পুরোণ; কিন্তু ব্যাপারটা মনে পড়লে আজকাল মুষড়ে পড়ে সে! স্বর্গত পিতার বিষয়-বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প ছিল বলেই, লোকে তাঁকে রায়-রাজা বলে অভিহিত করতো! এই রাজগী বজায় রাখবার জন্যে তিনি তাঁর অংশের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করে গিয়েছিলেন, কিন্তু পৈত্রিক

সম্পত্তি নষ্ট করতে পারলেও, যে সম্পত্তি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হ'ন নি, তা গ্রহণ করেন নি। নিদারুণ সঙ্কটের দিনেও স্ত্রীধন স্পর্শ করতে তাঁর অভিজাত্যে বেধেছিল। অনুরুদ্ধ হ'লে জবাব দিতেন: মায়ের সম্পত্তি বর্ত্তায় মেয়েকে। মেয়ে না থাকলে পুত্রবধূকে! ও সব অলঙ্কারের মালিক,—আমার সতুর বৌ!

কিন্তু হবু গণনেতা সত্যব্রত রায় তখন সংস্কারমুক্ত জীবন যাপন করছিল। ফলে, শুধু অলঙ্কারগুলোই নষ্ট হলো না, মরা মায়ের স্মৃতিচিহ্ন, সেকেলে বেনারসীগুলোও সে নষ্ট করে ফেলল সোনার তারের লোভে! সেও অল্প টাকা নয়!

কল্পনা বিলাসী সত্যব্রত সেদিন অনেক কিছুই স্বপ্ন দেখেছিল। সেই আঠার হাজারের মধ্যে, সামান্য আঠারটা টাকাও সে নিজের জন্যে খরচ করেছিল কি না সন্দেহ! হাজার আষ্টেক গিয়েছিল জনকল্যাণে; বাকিটা গেছে জনৈক দেশপ্রেমিক স্বদেশী ব্যাঙ্ক-ওয়ালার গর্ভে! কিন্তু যথাসর্ব্বস্বর বিনিময়ে পেল কী সে?

শীকারপুরের গণনেতৃত্ব লাভ ক'রে লোভ বোধ হয় তার আরও বেড়ে গিয়েছিল—আরও বড় রকমের কিছু একটা হবার আশায়। সুযোগও মিলেছিল কিছুদিন পরে। দুঃস্থ গণ-দেবতার দুঃখ মোচনের অজুহাতে সে সেদিন সাড়ম্বরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তদানীন্তন বাঙ্গালার উজীরে আজম্ খাজা স্যার নাজীমুদ্দীনের বিরুদ্ধে। প্রায় দু'শো ছেলের দলপতি হ'য়ে, মিছিল করে, সে আটক করতে গিয়েছিল গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় শস্যভাণ্ডার—যে ভাণ্ডারের অন্ন খাওয়ার ফলে, শীকারপুরে কলেরা দেখা দিয়েছিল মহামারীরূপে! তার আশা পূর্ণ হয়েছিল। খবরের

কাগজের হিরো সেজে সে গিয়েছিল জেলে। তারপর, কারাকূপের অন্ধকারে বসে, বিধর্ম্মীদের ঘৃণিত পরিবেশের মধ্যে বাস করেও, সে ভেবেছে ওই গণদেবতারই কথা। কল্পনা করেছে, স্বাধীন সরকার গঠিত হ'লে, সে কী কী করবে। আশা করেছে—

আশা সে অনেক কিছুই করেছিল। উপলব্ধি করেছিল, রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থার বহুবিধ রূপ! বুঝেছিল, সমাজতন্ত্রী শাসনের বিভিন্ন প্রণালী, জেনেছিল, অনেক রকমের বৈপ্লবিক সত্য! শুধু ভাবতে পারে নি—

যাদের জন্যে এত কাণ্ড, সেই গণদেবতার স্মৃতিশক্তি কত ক্ষীণ! মাত্র পাঁচটি বছরের হেরফেরে—শীকারপুরের গণদেবতা নিঃসংশয়ে বিস্মৃত হ'য়েছে তার সাবেক পরিচয়। আবার যদি তাদের স্মরণশক্তি ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে প্রয়োজন—আঠার হাজার নয়—আরও হাজার হাজার টাকার। কিন্তু—

এতদিন পরে আজ কেন তার বুকের মধ্যে কান্না গুমরে উঠছে! ভুল করেছে সে। কিন্তু এই কি তার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ! সুদীর্ঘ বন্দীজীবনের মধ্যে যে সম্ভাবনার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল করেনি তাকে, সত্যকার স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা-ই তার জীবনে দেখা দিল বিড়ম্বনারূপে! প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু সেই বেদনাটাকে তুচ্ছ করতে পারাটা কি সত্যই অসম্ভব! এ কি অভিশাপ! স্মৃতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে এইভাবে সে শুধু পরের ছিদ্র অন্বেষণ করেই জীবন কাটাবে!—সত্যই কি সে এমনই অপদার্থ। —অপদার্থকে কেউ কি কখনও ভালবাসতে পারে? বিশেষতঃ করুণার মতো মেয়ে—

পূর্ব্বাপর

পাশ দিয়ে একটা মোটর সবেগে চলে যেতেই সত্যব্রতর হুঁস্ হ'লো। দেখল, পথভুলে ইতিমধ্যে কখন সে ফিরিঙ্গি-বাগানে ঢুকে পড়েছে এবং সামনেই করুণাদের বাড়ী।

কী আশ্চর্য্য! ব্যাপারটা কল্পনা করে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা সত্যব্রতর! এত অন্যমনস্ক সে! এ কী হ'লো তার!—সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রলোভনও জাগে: পথ ভুলে এসেই যদি পড়েছি করুণার ভুলটা ভেঙ্গে দিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু এগোতে গিয়েও পেছিয়ে আসে সে: তার কি উচিত এ বাড়ীতে ঢোকা? স্বর্গীয় পিতার নির্দ্দেশ মনে পড়ে—

করুণার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব শুনে প্রথমটা তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন; তারপর ইজারাদারকে বলেছিলেন: সতুর তরফে জমীদারীর আয় যে কত অল্প তা তো তুমি ভাল করেই জান! ওই সামান্য আয়ের ওপর ভরসা করে, তোমার মতো বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করাটা কি তার ভাল হ'বে?

হৃদয়গোপাল বলেছিলেন: আমার জামাইকে আমি আপাতত লক্ষ টাকার সম্পত্তি যৌতুক দোব!

—কিন্তু, বিনিময়ে যেটা কেড়ে নেবে,—সেটার দাম যে টাকায় মাপ করা যায় না!

—কী কেড়ে নোব আমি?

—একজন ভদ্র সন্তানের মনের শান্তি!

—আপনার কথা আমি ঠিক্ বুঝতে পারছিনা!

—এর মধ্যে বোঝাবুঝির তো কিছু নেই! চাঁদির জুতো মেরে সামাজিক সমতা রক্ষার পরিণাম যে কত মারাত্মক হয়—তোমার মতো

বুদ্ধিমানের তা নিশ্চয়ই জানা আছে! তোমার মতো এক পুরুষে অ্যারিষ্টোক্র্যাটের সঙ্গে সতুর মতো বনেদীঘরের ছেলে কি কখন তাল্ রেখে চলতে পারবে?—মনে তো হয়না!

শুনে হৃদয়গোপাল গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলেন!

শুভব্রত রায় আবার বলেছিলেন: দুনিয়াটা চাকার মতো ঘুরছে! সুতরাং, সতু বড় হ'য়ে তার মরা-বাপের কথা মনে রাখবে কি না, আমি জানিনা! কিন্তু, আপাতত, যখন বেঁচে আছি, তখন, ছেলের প্রতি বাপের কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হ'বে! সতু কাল থেকে আর তোমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় যাবে না!

অথচ, করুণার ভুল ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার: একটা সাবেকী বাড়ীতে সে বাস করতে বাধ্য হ'চ্ছে বটে কিন্তু সত্যিই সে কোন রকম সাবেকী মনোবৃত্তি পোষণ করেনা। সে যখন সেদিন ইজারাদারের ম্যানেজারকে পত্র লিখেছিল, তখন সত্যিই তার মনে ছিলনা, এই ম্যানেজারের মনিবের মা, একদিন তাদের বাড়ীর মাস্ মাইনের রাঁধুনী ছিল—

—কাকে চাই বাবুজী?—নীরস কণ্ঠের দেহাতী হিন্দী শুনে, সত্যব্রত চমকে উঠল। দেখল, প্রশ্নকর্ত্তা ইজারাদারেরই ফটকওয়ালা! অগত্যা, তাকে বলতেই হলো: রায় বাহাদুর আছেন?

—জী।

—বিকাশবাবু?

—জী!

—ইয়ে—সত্যব্রত ঢোক গিলে প্রশ্ন করল: ইয়ে, করুণা আছে?

দারোয়ান এইবার চটে গেল। বলল: হ্যায় তো সব কোই, মগর, আপ মাঙ্গতে হেঁ কিস্‌কো? আপ কোন হ্যায়, কহিয়ে তো পহলে—

—আমি?—সত্যব্রত সভয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে বলল: আমি সতু—মানে—সত্যব্রত রায়—

—ওমা, দেবতা যে গো—সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধ দারোয়ানকে সচকিত করে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এল—নিথর ঠাকরুণ—সেই ভানুমতীর মা!

—এসো বাবা এসো, এও তো তোমারই রাজত্বি!—নিথর ঠাকরুণ একগাল হেসে সত্যব্রতকে অভ্যর্থনা করল!

কী আপদ! এ আবার কোত্থেকে এসে জুটল! সত্যব্রত তাড়াতাড়ি সরে পড়বার চেষ্টা করল; কিন্তু নিথর ঠাকরুণ ধমকে উঠল—দারোয়ানটাকে: বেয়াক্কেলে মিন্‌সে হাঁ করে দেখছিস কী? বাবুকে খাতির করে নিয়ে যা ভেতরে—

—এ বাবু কে? দারোয়ানটাও ব্যাপার দেখে ভড়কে গিয়েছিল।

—ওরে মুখপোড়া, এ যে তো'র বাবার বাবা, ওর রাজত্বিই তো ভোগ করছে তোর মনিব মিনসে।—বলেই, নিথর ঠাকরুণ আবার সত্যব্রতকে আপ্যায়িত করল: এসো বাবা এসো।

—ইয়ে—সত্যব্রত উল্টোমুখে চলতে চলতে বলল: এখন কাজ আছে, পরে আসবো'খন—

—ওমা আমার কী হ'বে! নিথর ঠাকরুণ নাছোড়বান্দার মতো সঙ্গে চলতে চলতে বলল: এও যে তো'মারই রাজত্বি গো! এ বাড়ীর বামনী যে একদিন তোমাদেরই রাঁধুনী ছিল গো—

কী সর্ব্বনাশ! আবার সেই কথা! চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে সত্যব্রত চট্ ক'রে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল: তুমি এখানে কী করছিলে?

—আমি? আমি এসেছিনু ভানু আসেনি বলে! তার দেহটা একটু খারাপ হয়েছে কিনা—

—ভানু আসে কী করতে?

—গেরোর ফের বাবা,—সত্যব্রতর প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনটা কাজে লেগে গেল। নিথর ঠাকরুণ অনর্গলমুখে তার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করল: কেমন করে দেওর তার বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করেছে; কত দুঃখে আজ তাকে পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতে হ'চ্ছে পেটের জ্বালায়! অর্থাৎ ভানুমতী হৃদয়গোপালের বাড়ীতে ঠাকুরের পাট্ করে, চাল বাছে, কুটনো কোটে!—বামুনের মেয়েকে দিয়ে ওরা অবশ্য এঁটো পাড়ায় না, কিন্তু আসলে সে বাড়ীর ঝি!

—বড়ই আপশোসের কথা—

—তুমি বাবা এখন ঘরে ফিরেছো—নিথর ঠাকরুণ সখেদে বক্তব্যর উপসংহার করল: তবুও আমাদের দাসীবৃত্তি করতে হ'বে? দেওর মুখপোড়া আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করে বসে আছে,—তুমি দেখবে না?

—দেখব বৈকি, নিশ্চয়ই দেখব! মোড়ের মাথায় এসে সত্যব্রত নিথর ঠাকরুণকে নিরস্ত করল। বলল: সব ঠিক হয়ে যাবে'খন এখন তুমি কাজে যাও!

—ওমা, আবার কাজে যাব কী গো? কাজ তো সেরেই এনু—

—ওঃ তবে তুমি বাড়ীতে যাও; আমিও একটা কাজ সেরে আসি! —বলেই, সত্যব্রত ছুটে রাস্তা পার হ'লো।

উদ্দেশ্যটা প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধ হ'লোনা বটে কিন্তু পরোক্ষ ফলাফলের কথা ভেবে সত্যব্রত একটু স্বস্তি পেল : নিথর ঠাকরুণের কাছ থেকে তার আসার খবরটা শুনলে করুণা নিশ্চয়ই তার মত বদলাতে বাধ্য হবে। তাকে স্বীকার করতেই হ'বে—সত্যব্রত দাম্ভিক নয়; কোন রকম আভিজাত্যের ধার ধারেনা সে। সেদিন সে অসুস্থ ছিল বলেই ম্যানেজারকে রূঢ় পত্র লিখে ফেলেছিল; কিন্তু সুস্থ হয়েই ছুটে এসেছে তাদের বাড়ী। ইজারাদার-জমীদারের মান মর্য্যাদার ছোট-বড়ত্ব সম্বন্ধে সত্যিই তার কোন সংস্কার নেই। কিন্তু—

ভবিষ্যতে এ রকম ভুল যাতে আর না হয়, তারও ব্যবস্থা করা দরকার তাড়াতাড়ি! আর গড়িমাসি করলে চলবে না, অসুখটা তাকে সারাতেই হ'বে। অবশ্য, ব্যাপারটা খরচা সাপেক্ষ! হয়তো এক্সরে করাতে হবে; এ'দিকে ট্যাঁকের অবস্থা একেবারে গড়ের মাঠ। কিন্তু আপাতত নীরু ডাক্তারের পরামর্শ নিলে কেমন হয়? যদিও নতুন ডাক্তার সে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই যে রকম পসার করেছে তাতে তো মনে হয়—ডাক্তার হিসাবে একেবারে অনভিজ্ঞ সে নয়। আর, যদিও বা তার নিজের বিদ্যাতে না কুলোয়, পুরোণ দিনের কথা স্মরণ করে নীরু কি সত্যব্রতর জন্যে, অভিজ্ঞ প্রফেসারের পরামর্শ গ্রহণ করবে না? নিশ্চয়ই করবে! নীরু অনেক বিষয় তার কাছে কৃতজ্ঞ। গত বেয়াল্লিশের কলেরা এপিডেমিকের সময়ে সে তাকে মাসিক দু'শো টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করেছিল,—তাদের সেবা-সঙ্ঘের ডাক্তার হিসেবে—যদিও নীরু তখন ছিল ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র! গরীবের ছেলে ট্যুইশানী ক'রে সংসার চালাতো, অধিকন্তু ডাক্তারী পড়তো—এই সব বিবেচনা করে অযাচিত

ভাবেই সত্যব্রত তাকে তখন অর্থ সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া বার দু'য়েক তার পরীক্ষার ফিস্‌ও দিয়ে দিয়েছে সত্যব্রত।—এ সব কথা নীরু নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি!—মনস্থির করে সে নীরুর ডাক্তারখানার দিকেই চলল।

ডাক্তারখানাটাকে তখন আড্ডাখানায় রূপান্তরিত করেছিল নীরেনের জন তিনেক বন্ধু। চা সিগারেটের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল পরচর্চ্চা আর পলিটিক্‌স্। একই সঙ্গে অতি-পরিচিত প্রতিবেশী ও অপরিচিত দেশনেতাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আবিষ্কার ক'রে সকলে চীৎকার করে চলেছিল। সকলেই সখের সমালোচক। তাই, যে যত যুক্তির অভাব বোধ করছিল, সে তত উগ্র হ'য়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিল, প্রতিপক্ষের বক্তব্যগুলো একেবারে অর্থহীন।—ঠিক এই পরিবেশের মধ্যে ঘরে ঢুকল সত্যব্রত। সকলে হৈ হৈ ক'রে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে অজস্র প্রশ্ন:

হ্যারোর জহরলাল থেকে আরম্ভ ক'রে অভয় আশ্রমের প্রফুল্ল ঘোষ পর্য্যন্ত সকলেরই শিক্ষা-দীক্ষা-দোষ-ত্রুটির উল্লেখ ক'রে, সমালোচকরা মন্তব্য করল: এরা কেউই দেশ শাসনের উপযুক্ত নয়! তোর কী মত?

সত্যব্রত সাফ্‌ জবাব দিল: আমি ও সব ছেড়ে দিয়েছি।

ভোম্বল ভট্টচায বলল: সেই জন্যেই তো তোর মতামতের মূল্য বেশী! এককালে তুই হাতে কলমে পলিটিক্‌স্ করেছিস্। ওর আদি অন্ত হজম করে তুই তো একেবারে ঝানু মেরে গিয়েছিস রে। আমরা তো সব এ্যামেচার......

আড্ডায় আপনি-সম্পর্কিত কেউই ছিলনা; সকলেই তুই-তুকারির দলে; তাদের দাপটে সত্যব্রতর অ-পলিটিক্যাল আদর্শবাদ ভেসে যাবার উপক্রম করল। অধিকন্তু, যেহেতু সে নেশা করেনা, তাই তার জন্যে আনানো হ'লো বিশুদ্ধ বনস্পতিতে ভাজা ভিটামিনযুক্ত সিঙ্গাড়া। ব্যাপার দেখে সত্যব্রত হেসে ফেলল। বলল: সমস্যার সমাধান তোরা নিজেরাই তো সব করে ফেলেছিস,—আমি নতুন আর কী বলবো?

সৌম্য বলল: সমাধান করে ফেলেছি, মানে?

সত্যব্রত বলল: ঘোষ-বোস-নেহেরু-প্যাটেল এণ্ড কোম্পানীর সবই খারাপ—কারুর কোন গুণ নেই—এ সম্বন্ধে তোরা সকলেই তো এক মত। তবে আর তর্ক কিসের?

বাধা পড়ল! নীরেন ডাক্তার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল: কিন্তু, এদিককার ব্যাপার কী রে সতু?

—কোনদিককার ব্যাপার?

নীরেন চোখ টিপে বলল: করুণাদের বাড়ীর সামনে অমন করে দাঁড়িয়েছিলি কেন?

সত্যব্রত ঘাবড়ে গেল। ঢোক গিলে বলল: অমন করে দাঁড়িয়ে ছিলাম মানে?

—মানে, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েছিলি—নীরেন নাক চুলকে বলল: দেখে মনে হচ্ছিল, যেন, বাড়ীটাকেই গিলে খাবি!

—কী বাবা! ভোম্বল টিপ্পনী কাটল: **Sinking sinking drinking**-নাকি···

—তোরা কী আরম্ভ করলি? রাধেশ বাধা দিয়ে বলল: হচ্ছিল একটা Important কথা—

—তুই থাম্! ভোম্বল ধমক দিয়ে বলল: এটাও কম Important নাকি........

—কিন্তু, ব্যাপার কী বলতো সতু? নীরেন আবার বলল: সজোরে হর্ণ মেরে আমি তোর পাশ দিয়ে এলুম,—অথচ তুই ফিরেও দেখলি না—এত অন্যমনস্ক—

বাইরেও সঙ্গে সঙ্গে হর্ণ বেজে উঠল। সকলেরই নজর পড়ল রাস্তার দিকে। দেখা গেল, গাড়ীর মেশিন বন্ধ করে বিকাশ এই দিকেই আসছে—

—ওহে ডাক্তার, মামা তোমাকে একবার ডেকেছেন, ভয়ানক দরকার, একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হ'বে!—বিকাশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তার কর্ত্তব্য শেষ করল; তারপর সত্যব্রতর দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল: একি সূর্য্যটা আজ কোন দিকে উঠেছে?

—কলাপোড়া খেলে যা! বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো বিকাশের আবির্ভাবে রাধেশ রাগে একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল। বলল: কী সব রাবিস্ আরম্ভ করলি তোরা? সতু তো তোদেরই বাড়ীতে গিয়েছিল। এর মধ্যে আবার সূয্যি উঠবার কী হলো রে ষ্টুপিড্?

সংবাদটা পরিপাক করতে কিছু সময় লাগল বিকাশের! অবশ্য, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে করুণার ভাবভঙ্গির রহস্যোদ্ধার করতে গিয়ে সেও জানালা দিয়ে দেখতে পেয়েছিল সত্যব্রতকে; কিন্তু সে যে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল, এ কথা বিশ্বাস করতে পারল না। সত্যব্রত সত্যিই যদি ও বাড়ীতে ঢুকত, তাহলে একটা সাড়া পড়ে যেত নিশ্চয়ই।

—কতক্ষণের মেয়াদ রে?—সৌম্য বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল: চা-টা চলবে?

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখেই সত্যব্রত তাড়াতাড়ি বলল: মেয়াদ কিসের?

—গাধাবোটের—নীরেন বুঝিয়ে দিল: স্বাধীনতার মেয়াদ।

—গাধার কথা রেখে কাজের কথা ক' সত্তু!—রাধেশ বিরক্ত হয়ে বলল: বল্, ঠিক কী রকম শাসন পদ্ধতি হ'লে, এ রাম-রাজত্বের হিল্লে হতে পারে—

—বল তো ভাই সতু—সৌম্য মুচকে হেসে বলল: ঠিক্ কী রকমটি হলে, রাধেশচন্দ্রকেও বোকা বানানো যায়!

—আমার কথা হচ্ছে না!—রাধেশ গর্জ্জে উঠল।

—ওই হ'লো!—সৌম্য বলল: সতু তুই বল ঠিক কোন Ism-টা আমাদের থাপ খাবে—গান্ধী-ইজম্ সুভাষ-ইজম্, নেহেরু-ইজম্, এ্যাংলো আমেরিকান-ইজম্ না প্রশান্ত-ইজম্...

—ভাল কথা—ভোম্বল হঠাৎ চীৎকার করে উঠল: প্রশান্তর খবর শুনেছিস? বাছাধনের লীডার হওয়ার স্বপ্ন এবার বোধহয় সত্যিই ভাঙ্গল—

—কী রকম?

ভোম্বল সোৎসাহে বলল: ওর যথাসর্ব্বস্ব সোরাবজীর কাছে বাঁধা ছিল—জানিস তো? পার্শী-নন্দন উকীলের চিঠি দিয়েছে—শীগ্‌গীরই মাম্‌লা করবে। প্রশান্ত নাকি সোরাবজীকে ভয় দেখিয়েছিল, বেশী তাগাদা করলে, কম্‌রেডদের ডেকে এনে তার কারবার

লাটে তুলে দেবে। পার্শীর বাচ্ছা, তাই গোড়া ধরে কোপ মেরেছে!

সৌম্য বলল: তা যদি হয়, তাহলে পোয়া-বারো প্রভাতী সেন-এর।

—কেন?

—রমনদাস-টা যে রকম ভুগছে, তাতে তো শীগ্‌গীরই টেঁসে যাবে; তখন শ্রমিক-সঙ্ঘের সর্ব্বে-সর্ব্বা হ'বে প্রভাতী! সতু কী বলিস্? ঠিক্ নয়?

—না, প্রভাতী এখানে থাকবে না! সত্যব্রত সুব্রতর কাছে যা শুনেছিল সব বলল।

—কিন্তু তা কি করে হ'তে পারে! নীরেন চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল: এত কাণ্ড হ'লো আর রায় বাহাদুর জানতে পারলেন না—এও কি কখন হয়?

—এও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! সৌম্য বলল: প্রশান্তর মৎলব তবু বোঝা যায়; কিন্তু হৃদয়গোপাল একেবারে দুর্ব্বোধ্য।

—Exactly! ভোম্বল বলল: গোপালটি আমাদের গভীরজলের মাছ……

—এই এই এই—বিকাশ ব্যস্ত হ'য়ে বলল: আমার সামনে মামার নিন্দে করিস নি, চাকরী যাবে……

—শুধু চাকরী। নীরেন সহাস্যে বলল: অবর্ত্তমানে, বিষয়ের ছিটে ফোঁটাও মিলবে নিশ্চয়—

—কী আশ্চর্য্য মাইরী! ভোম্বল একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল: লোকটার এত টাকা, অথচ ছেলে নেই।—সব লুটে পুটে খাবে জন জামাই-ভায়ে!

—জামাইটা মাসে কত ক'রে বাগায় রে বিকাশ ?

—তোরা কী আরম্ভ করলি বল তো ? বিকাশ উৎকণ্ঠিতভাবে বলল : এখনও বিয়ে হলোনা—

—আহা হবে তো !—ভোম্বল আবার একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল : ওফ্ একেই বলে বরাৎ মাইরী ! একখানা রাজকুমারীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একটা রাজত্ব ! ওফ্ বিয়ের নেমন্তন্নটা কবে পাচ্ছি বল্—

—ভদ্রলোক ফিরলেই পাবে।

—কবে ফিরছেন তিনি ?

—ফেরা তো উচিত ছিল গত মাসে।....এ সব ব্যাপার ভাই মামার Private file-এর।

—এই তোমরা সব করছো কী ?—সশব্দে টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে সৌম্য বলল : পরের মেয়ের বিয়ে নিয়ে তো হৈ চৈ করছো, এদিকে সতু কী রকম গুম্ মেরে আছে লক্ষ্য করেছো ?

—Exactly ! ভোম্বল আবার নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল : ওস্মানের নাকের ওপর বসে, এ ভাবে আয়েষার বিয়ের ফর্দ্দ করাটা very very bad ! বুঝলি সতু, আমরা very very sorry—

সকলেই হেসে উঠল ; কিন্তু আলোচনা বন্ধ হ'লোনা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল !

সত্যব্রত কিন্তু সত্যিই গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল।—করুণাকে নিয়ে আলোচনার জন্যে সে যতটা না অস্বস্তিবোধ করছিল, তার চাইতেও বেশী বিরক্ত হচ্ছিল নীরেনের ওপর। আড্ডাধারীরা সকলেই বড়লোকের ঘরের বেকার দুলাল ; সুতরাং এ ধরণের প্রবৃত্তি তাদের পক্ষে

অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু প্রকাণ্ড ডাক্তারখানায় বসে নীরেন এ সবকে প্রশ্রয় দেয় কোন বুদ্ধিতে? এ বুদ্ধি তো উন্নতিশীল ডাক্তারের নয়! নীরেন সম্বন্ধে সত্যব্রতর ধারণা বদলে যাবার উপক্রম করল। আড্ডার ধরণ দেখে সে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, এ ব্যাপার আকস্মিক নয়, নিত্য নৈমিত্তিক! কিন্তু রুগীর দেখা তো একটাও মিলল না এতক্ষণের মধ্যে। ব্যাপার কি?—বিরক্তি চেপে সে উঠে পড়ল। বলল: আজ উঠি—বেলা বাড়ছে—

—আমারও মেয়াদ হয়ে গেছে!—বিকাশও সত্যব্রতর সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। তারপর নীরেনের উদ্দেশে বলল: তুমি কিন্তু দেরি করোনা ডাক্তার! মামা বসে আছেন তোমার জন্যে।

বাইরে এসে সত্যব্রতকে বলল: তুমি এখন বাড়ী যাবে তো? চলো তোমাকে একটা Lift দিয়ে দি'।

—না না,—সত্যব্রত ব্যস্ত হয়ে বলল: আমার জন্যে পেট্রোল পোড়াতে হ'বেনা।

—পেট্রোল পোড়াব কেন, আমাকে তো ওই দিকেই যেতে হ'বে।

—তা হোক্, আমি হেঁটেই যাব! সত্যব্রত অগ্রসর হ'লো!

—কী আশ্চর্য্য! গাড়ী যখন ওইদিকেই যাবে তখন হেঁটে যাবার দরকার কী? এদিকে বেলাও তো অনেক হ'য়ে গেছে!

—চটিস্ নি, শোন! একটু হাসবার চেষ্টা করে সত্যব্রত বলল: তোর যখন নিজের গাড়ী হবে, তখন আমি জোর করে চড়ে বেড়াব। কিন্তু, এখন পারবো না, বুঝলি?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না!—বিকাশ আশ্চর্য্য হয়েই বলল: সেদিন

ষ্টেশন থেকে তো দিব্বি গাড়ী চড়ে বাড়ী গেলে! আজ আবার উল্টো গাইবার মানে?

—মানে? সত্যব্রত ইতস্ততঃ করে বলল: ক্ষুণ্ণ হবি না তো? শোন, সেদিন আমি কিছুই জানতাম না; কিন্তু, আজ বুঝছি, করুণার কাছে আমার সদ্ভাবের কোনই মূল্য নেই! সুতরাং বুঝতেই তো পারছিস......

—কিস্যু পারলাম না।

—পারলি না?

—কী করে পারবো বল? বিকাশ একটু গম্ভীর হয়েই বলল: গেরস্থর পয়সা থাকলে, সময়মত মেয়ের বিয়ে দিয়েই থাকে; কিন্তু তার জন্যে তোমার সঙ্গে অসদ্ভাব হ'বে কেন, তা তো বুঝতে পারছি না। তোমরা রাজি হওনি বলেই তো করুণার আজ অন্যত্র বিয়ে হ'চ্ছে।

—কী সর্ব্বনাশ! সত্যব্রত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল: তুইও ওদের মতো পাগল হলি নাকি? করুণার অন্যত্র বিয়ে হচ্ছে, তাতে আমার কী?

—তোমার কিছু নয় তো চটছো কেন?

—চটলুম আবার কোথায়? বাঃ—

—বাঃ, অসদ্ভাবের কথা তো তুমিই তুললে?

—নাঃ, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে সত্যব্রত অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল। বলল: নে নে গাড়ীতে ওঠ, আর রদ্দুর লাগাস নি!

—তুমি আগে ওঠো, তবে তো!

—ছাড়বি নে কিছুতেই?

—না।

অগত্যা সত্যব্রতকে গাড়ীতে উঠে বসতেই হলো।

—এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো কাজ—

—কাজটা কিন্তু অন্যায় হ'লো—

—হক্ কথা বলেছো।—বিকাশ ফার্ষ্ট গীয়ারে গাড়ী ছাড়ল।

গাড়ী ছুটল ; কিন্তু গড়বাড়ীর দিকে নয়—ষ্টেশনের দিকে। সত্যব্রত আশ্চর্য্য হয়ে বলল : এ কী রে?

বিকাশ সহজ ভাবেই বলল : তুমিই তো বারণ করলে অকারণ পেট্রোল পোড়াতে। গড়বাড়ী ঘুরে ষ্টেশনে যেতে গেলে ছটাক্ দুয়েক তেল বেশী পুড়তো।

বেলার দিকে তাকিয়ে সত্যব্রত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিল : রাঙাবৌ নিশ্চয় উপোষ করে বসে আছে তার জন্যে ; অথচ বিকাশটা...

—বোধোদয় পড়েছো তো? বিকাশ আবার বলল : মানুষের চোখ থাকিলে দেখিতে পায়! মাথা থাকিলে সব বুঝিতে পারে! চলো না দেখবে, কী সব কাণ্ড করছি আমরা।

রসিকতা ভাল লাগছিল না সত্যব্রতর। সে বিরক্তি চেপে চুপ করে বসে রইল।

কিন্তু বিকাশ তাকে বসে থাকতেও দিলনা। ষ্টেশন ইয়ার্ডে পৌছে, জোর করে নামালো তাকে। তারপর অযাচিতভাবে, অনর্গলমুখে বলে যেতে লাগল—করুগেটেড সীটের মাহাত্ম্য! ২২ গেজী সীট, মোটা টেঁকসই,—দাম বেশী। ২৪, ২৬, ২৮ গেজী, ঠুন্‌কো পাতলা—দাম কম।

এই গেজ-এর তফাৎটা গোলা-চোখে চট করে ধরা পড়ে না; কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই সরু-মোটা বোঝা যায়!...তিন হন্দর মাল এসেছে। এ মাল এখন থাকবে ভাগবানবাবুর গুদোমে; তারপর কাল-পরশু নাগাৎ চালান যাবে হলুদপুর রিফিউজী কলোনীতে। এ ব্যবস্থা কেন বলতো?

বিকাশের বকবকানি সত্যব্রতর কানে যাচ্ছিল বটে; কিন্তু মনে পৌঁছচ্ছিল না! সে যত বেলার দিকে তাকাচ্ছিল মেজাজও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তত! দিনটা আজ নিতান্তই বৃথা গেল: করুণার চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পাঁচজনের কাছে লজ্জায় পড়ল; অথচ, তার শাড়ীর আঁচলটুকুও চোখে দেখতে পেলনা! চিকিৎসার জন্য নীরুর কাছে গেল; ফিরে এল বিরক্তি নিয়ে। বাড়ীতে রাঙাবৌ শুনিয়ে রাখল বিরিয়ানীর কথা; এদিকে পাল্লায় পড়ে গেছে বিকাশচন্দ্রের···

—বলতে পারলে না তো?—নিজের প্রশ্নের উত্তর অগত্যা নিজেই দিল বিকাশ: এ ব্যবস্থা গাড়ী-ভাড়া বাঁচাবার জন্যে! কাজের চাপ একটু কম থাকলেই ভগবানবাবু আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় লরী ছেড়ে দেন, বুঝেছো?

—বুঝিছি! সত্যব্রত বিরক্ত হয়ে বলল: এখন, আমায় নিষ্কৃতি দিবি কি না বল্?

—এই যে হয়ে এল।

কাজ সেরে, ফিরতি-মুখে বিকাশ আবার আরম্ভ করল: একদিন চল না হলুদপুরে—দেখে আসবে, আমরা কী সব কাণ্ড করছি। রিফিউজীদের ওপর দরদ নাই বা থাকল; তোমার সেকেলে সাকরেদরা কী রকম কেলেবর হয়ে উঠেছে, সেটাও তো দেখা উচিত···

—হুম্ !

—নাঃ তুমি একেবারে গোঁজিয়ে গেছো !—বিকাশ হাল্ ছেড়ে দিয়ে মন্তব্য করল : কোথাকার কে আমেরীকান লায়ন সাহেব—সেও গিয়ে ঢুঁ মারে। আর, তুমি পাড়ার লোক হয়ে পাড়া মাড়াবে না—এ কী রে বাবা !

—লায়ন, মানে ?—সত্যব্রত এবার একটু সচেতন হলো। বলল : সেই বিক্রমাদিত্য ?

—বিক্রমাদিত্য নয়, তার ভূত।—বিকাশ বলল : সেদিন দেখি, বৃদ্ধও শ্লেট্ পেন্সিল নিয়ে করুণার সাগরেদী আরম্ভ করে দিয়েছে— দাগা বুলোচ্ছে !

—করুণা কী করে রে সেখানে ?—সত্যব্রত এবার ঘুরে বসল।

—পাঠশাল্ তদারক্ করে—কাঁথা তদ্বির করে,—কাজ কি একটা !

—কবে কবে যাস্ রে তোরা ?

—তোমার বাড়ী এসে গেছে।—বিকাশ সশব্দে ব্রেক কসল।

সত্যব্রত নামল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করতে গেল, করুণা কবে কবে যায় হলুদপুরে ; কিন্তু মুখ খোলবার পূর্ব্বেই বিকাশ বাই-বাই বলে হুস্ করে বেরিয়ে গেল !

বাইরে করুণা—বাড়ীতে রাঙাবৌ !—এ এক জ্বালা হয়েছে তার !

অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়েই সত্যব্রত অন্দরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার থামতে হলো তাকে। দেখল—সেই উদ্বাস্তু বৃদ্ধ—এবারে বাড়ী ফেরবার দিন, যাঁর জন্য সে হৃদয়গোপালের মোটর চড়তে বাধ্য হয়েছিল,— তিনি ন' তরফের অন্দর থেকে বেরিয়ে আসছেন্—

—আপনি এখানে ?

—অগত্যা! সেই প্রথম দিনের মতোই বিনীতভাবে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ: ভাইটার রোজগার নেই, তার ওপর দুটো বেকার ছেলে-মেয়ে বসে বসে খাচ্ছে, তাই এক সঙ্গে বাস্ করে, কিছু সাহায্য করবার মৎলবেই উঠে এলাম এখানে!

—কুলদাবাবু আপনার ভাই হ'ন নাকি?

—আপনার নয়, সম্পর্কে ভাই হয়।

—ওঃ বেশ বেশ। সত্যব্রত প্রস্থানোদ্যত হয়ে বলল: আচ্ছা, আবার দেখা হবে—

—এলাম আপনাদের আশ্রয়ে,—একটু স্নেহচক্ষে দেখবেন—

—অবশ্য অবশ্য! আচ্ছা নমস্কার—

সত্যব্রত অন্দরে গেল। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্নান সেরে নিয়ে বসল খেতে!

ভোজ্যগুলো রাঙাবৌ দমে বসিয়ে রেখেছিল; সত্যব্রত আসনে বসতেই সে সেগুলো পরিপাটি করে সাজিয়ে দিল; কিন্তু কোন কথা কইল না।

সত্যব্রত আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বলল: সত্যি, বিকাশটার পাল্লায় পড়ে বড্ড দেরি হয়ে গেল। তুমি এখনও খাও নি তো?

—না।

—তাহলে আর দেরি করছো কেন,—এই সঙ্গেই বসে পড়ো না?

—না।

—না কেন? সত্যব্রত একটু হেসে বলল: তুমি তো আজকাল এ সব খাও! খাও না?

—আসছি !—বলে, হঠাৎ রাঙাবৌ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে

বেরিয়ে না গিয়ে তার উপায়ও ছিল না।—কথা কওয়া তো দূরের কথা, সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকাতেও তার যেন বিশ্রী লাগছিল : সকালবেলার ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না !

সত্যব্রতর তালাক প্রসঙ্গটাকে, প্রথমে সে একটা সাময়িক ছেলেমানুষী বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে দিল সুব্রত।

ঠাকুর ঘরে কে রে ? না,—আমি তো কলা খাই নি !

রাঙাবৌ বেশ ফলাও করেই ঘটনাটা বলতে গিয়েছিল সুব্রতকে : কিন্তু সে যেন কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না, নিরুৎসুকভাবে একটু হাসল মাত্র !

—তুমি হাসছো ! রাঙাবৌ আবার বলল : কিন্তু ও বেচারার অবস্থা দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে ! করুণার জন্যে কী রকম হন্যে হয়ে উঠেছে—দেখনি তো !

—তুমি গোড়ায় গলদ করছো !—সুব্রতর বেলা হয়ে গিয়েছিল ; তাই ডিভোর্স প্রসঙ্গটা আর তুলল না। কিন্তু বিশেষভাবে তাকে ডেকেই ওই প্রসঙ্গটা তোলার জন্য, সে রীতিমত বিরক্ত হয়েছিল সত্যব্রতর ওপর। ফলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সে রাঙাবৌয়ের ভুল ভেঙ্গে না দিয়ে পারল না। বলল : ডিভোর্স বা তালাকের প্রশ্ন ওঠে বিয়ের পর—আগে নয় ! সতু করুণার কথা মনে করে ও কথা বলেনি !

—তবে ?

—বলেছে, অন্য কাউকে লক্ষ্য করে।

—কাকে? আমাকে নাকি?

—হ'তেও পারে।—সুব্রত গম্ভীরভাবে বলল: পুঁথিগত-বিদ্যা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করতে পারে না!

—কী বলছো, খুলেই বল না বাপু?

—বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এসে সব বুঝিয়ে দোব'খন্!

—না, এক্ষুনি বলতে হবে—আমার ভাল লাগছে না।

—তোমার এই নতুন জীবন দেখে, পাড়ার আর পাঁচজনে যা বলে, সতুও তাই সন্দেহ করেছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করেছিল: তোমরা পূর্ব্ব স্বামীকে ভুলে গিয়ে কেমন করে অপরকে ভালবাসতে পারো!

এই সব সন্দেহের কথা শুনে শুনে রাঙাবৌয়ের মনে কড়া পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু, তবুও সে যেন আজ স্তম্ভিত হয়ে গেল: সতুও আর পাঁচজনের মতো—ইতর....

এদিকে বেলা পড়ে আসছিল, ওদিকে সংসারের সব কাজ পড়ে রয়েছে।—সত্যব্রতকে খেতে দিয়ে রাঙাবৌ আবার গিয়ে রান্নাঘরেই ঢুকল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও মনকে সে বিশ্রাম দিতে পারলনা; ঘুরে ফিরে কেবলই তার কানে বাজতে লাগল সত্যব্রতর সেই প্রশ্ন: ওদের সমাজের না হলেও, তুমিও তো মেয়ে রাঙাবৌ! বল না, সত্যিই কি তোমরা ভুলে যেতে পারো অমন করে?

অমন করে! কেমন করে? কাকে ভুলে গেছে সে?—একটা মদ্যপ চরিত্রহীন খুনীর কথা শুনেছে সে! কিন্তু শুভদৃষ্টির সময়েও যার

মুখের দিকে সে চাইতে পারেনি, আজ তার সম্বন্ধে কথা ওঠে কেন? যাকে সে কখনও দেখলে না, চিনলে না, তাকে ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন এতদিন পরে?

কেন—কী অপরাধ করেছে সে? কোন রকম বিদ্যার অনুশীলন করাটা কি অন্যায়? শরীরের যত্ন নেওয়াটা কি অবৈধ? মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মানটা কি অপরাধ?

কেন, মেয়েরা কি মানুষ নয়? তাদের মন বলে কি কিছু থাকতে নেই? দু'খানা গয়না পরলেই সে হয়ে যাবে খারাপ? পরণে ভাল শাড়ী থাকলেই প্রশ্ন উঠবে—একজনকে ভুলে যাওয়ার?

নিজের পূর্ব্বাপর অবস্থার তুলনা করে মন তার আরও বিষিয়ে ওঠে।—খাটো বহরের মোটা শাড়ী পরে, সে বড় সরীকের গৃহিনীপনা করেছে বছরের পর বছর। উপযাচক্ হয়ে না জানালে, সত্যব্রত অযাচিতভাবে তাকে কখনও কিছু এনে দেয়নি। সখের জিনিষ তো দূরের কথা,—তার যে অন্তত একখানাও পোষাকী শাড়ী থাকা দরকার—এই সাধারণ কথাটাও কখনও মনে পড়েনি সত্যব্রতর। অথচ, মরা মায়ের গয়না বেচে হাজার হাজার টাকা উড়িয়েছে সে নিজের খেয়াল-খুশীতে। আর সুব্রত—

তার দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। কাপড়-চোপড় সে নিজে কিনে আনে নি—তাকেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ভ্যারাইটি ষ্টোর্স-এ—পছন্দ মতো জিনিষ কিনে নেবার জন্য।

রাঙাবৌ সসঙ্কোচে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল : না না, আপনি কিনে আনলেই হবে।

সুব্রত সহাস্যে উত্তর দিয়েছিল : মেয়েদের রুচির কথা তো আমাদের জানবার নয়! কেন আমাকে অপরাধী করবেন বলুন তো?

অগত্যা যেতে হয়েছিল সঙ্গে।—জন্মদুঃখিনী সে। সারাটা জীবন পরমুখাপেক্ষী হয়েই কাটিয়েছে, কখনও কোন ভাল জিনিষ ব্যবহার করতে পায়নি; অথচ, সামাজিক নিমন্ত্রণে, সার্ব্বজনীন পূজামণ্ডপে দেখেছে সে অনেক কিছুই। সম্ভবত তাই—সেদিন সে কৌতূহল চাপতে না পেরে, একটু বেশী করেই তাকিয়ে ফেলেছিল দোকানের শো-কেস্‌গুলোর দিকে। ফলে, সুব্রত সেদিন সওদার চূড়ান্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল।

সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও তার গায়ে কাঁটা দেয়! এদিকে দেখতে শান্ত-শিষ্ট নিরীহটি হলে কী হবে, সুব্রতও তো এই রায় বংশেরই ছেলে! গোঁয়ার্ত্তুমী যাবে কোথায়? রাঙাবৌকে সে সেদিন, জর্জ্জেট জড়িয়ে, স্যাণ্ডেল পরিয়ে, ফটো তুলিয়ে, তবে বাড়ী ফিরতে দিয়েছিল! কিন্তু এর মধ্যে অন্যায় কী দেখল সত্যব্রত?

—আজ হ'লো কী তোর? ভাল করে ঝাঁট দে না—রান্নাঘরের কাজ সেরে ঘর ধোয়াচ্ছিল রাঙাবৌ। দাসী ঝাঁটা চালাচ্ছিল, জল ঢালছিল সে নিজে। বাঁ-হাত দিয়ে শাড়ীটাকে হাঁটুর ওপর বাগিয়ে ধরে, ডান-হাতে বালতি চালাচ্ছিল সে। উত্তেজনাবশে সেই জল ঢালছিল দরকারের চাইতে বেশী; কিন্তু ঝাঁঝিয়ে উঠল দাসীর ওপর।

—করছো কি বৌদি,—ভাসিয়ে দেবে নাকি? —দাসী মুখ তুলে কথা বলতে গিয়েই হঠাৎ সন্ত্রস্তভাবে ঘোমটা টানল। সঙ্গে সঙ্গে

রাঙাবৌয়েরও দৃষ্টি পড়ল দরজার বাইরে। দেখল, তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে, দাঁড়িয়ে রয়েছে সত্যব্রত।

রাঙাবৌয়ের মুখের অবস্থা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। ঝপ্ করে বাঁ-হাতে-ধরা শাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে সে ঘরের বাইরে এল।

—এখানে কী? অসহ্য ক্রোধে রাঙাবৌয়ের গলা দিয়ে ভাল করে আওয়াজ বেরুল না। সে জোর করে বলল: কী চাই এখানে?

সত্যব্রতর অভিভূত ভাবটা কেটে গেল; কিন্তু কথা কইতে পারল না। বরং আবার তাকিয়ে ফেলল রাঙাবৌয়ের পায়ের দিকে।

রাঙাবৌও আর সহ্য করতে পারল না; দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চলে গেল সেখান থেকে। দেখে, সত্যব্রতও সচেতন হলো। সে এসেছিল রাঙাবৌকে জিজ্ঞাসা করতে: তখন আসছি বলে আর এলে না কেন?—কিন্তু নির্জ্জন রান্নাঘরের মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই সে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল—এত সুন্দর রাঙাবৌয়ের পায়ের গোছ!

কিন্তু রাঙাবৌ যেন বেশ রেগে-মেগেই চলে গেল! কী করেছে দাসীটা?

আসল ব্যাপারটা একেবারেই মাথায় এলনা সত্যব্রতর!—অন্যমনস্ক রাঙবৌয়ের কাছে এ ধরণের আত্মপ্রকাশ তার নতুন নয়!—আগেকার দিনে এ ধরণের ঘটনা ঘটলে দুজনে খুব হাসাহাসি করতো। সুতরাং কার্য্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েই সে রাঙাবৌয়ের মন মেজাজের কথা ভাবতে লাগল; শুধু, একটা সন্দেহ কিছুতেই তার মনে এলনা: শুভ্রতর কল্যাণে, রাঙাবৌ নিজের দেহ সম্বন্ধে এমন অনেক কিছু নতুন কথা জেনেছে—যা আগে সে বুঝতেও পারতো না

অদ্ভুত—বিচিত্র এই রাঙা'বৌ—

নাহলে, একটা অপদার্থ অর্দ্ধোন্মাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে কালহরণ করাটাকেও সে অসম্মানকর মনে করে!

নিজেকে সামলে নিতে তার বেশীক্ষণ সময় লাগেনা! মনস্থির করে সে হঠাৎ সেতার নিয়ে বসে।

জহর প্রায় দু'হপ্তা আসেনি। শিক্ষকের অনুপস্থিতির জন্য শিষ্যাটিও এ'কদিন বেশ ফাঁকি দিয়েছে রেওয়াজে। তাই—বিশেষভাবে আজই যেন তার একাগ্রতা জাগল, এ'কদিনের ক্ষতি সুদ সমেত পুষিয়ে নেবার জন্য!

অনুরাগের অভাবে রাগের রূপ খোলেনা। কিন্তু সেও নিরস্ত হ'বার পাত্রী নয়। জবরদস্ত মেজাজে ডিরি ডিরি সেধে চলল সে দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে।—শুনে সত্যব্রতও অবাক হয়ে গেল!

লাইব্রেরী ঘরের ডিম্বাকার টেবিলটার ওপর দু'পা তুলে দিয়ে সত্যব্রত মৃতাক্ষরীন্ নিয়ে বসেছিল। কিন্তু মাথায় তার এক বর্ণও ঢুকছিল না। বহুবারের পড়া বই! স্মৃতিশক্তিও তার অনেকের চাইতে ভাল। তবু বইয়ের অক্ষরগুলো যেন পিছ্‌লে যাচ্ছিল চোখের ওপর দিয়ে।—দু'একটা অক্ষর যা-ও বা নজরে পড়ছিল, তারও জন্যে বিরক্তি ধরছিল ইংরাজ অনুবাদকের ওপর। লোকটার কী বুদ্ধি! Double "O"র জায়গায় ইংরাজী 8 অক্ষর ব্যবহার করেছে; অথচ পাঠকের অসুবিধার কথা ভেবে, টেক্‌নিক্‌টার অর্থ বুঝিয়ে দেবার দরকার মনে করেনি! আশ্চর্য্য লোক—

কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য্য মেয়ে এই রাঙাবৌ!—একেবারে দুর্ব্বোধ্য—

যে রাঙাবৌ একদিন গৃহস্থালীর রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু জানতো না,—সে আজ অবিশ্রাম তিন-চার ঘণ্টা সেতার সাধে—ভবিষ্যতের আশায়। যে মেয়ে তখন, বদ্ধগাড়ীতে চড়ে দু'একবার রামরাজতলায় যেতে পেলেই কৃতজ্ঞতায় গলে পড়তো, সে আজ তুচ্ছ কারণে মেজাজ দেখাতে সাহস পায়—সত্যব্রতকে!

রূপান্তরটা দুর্ব্বোধ্য নিঃসন্দেহ! কিন্তু বড় কষ্টকর! সালঙ্করা সুবেশিনীর চঞ্চল গতি-ভঙ্গী, রহস্য-তরল কণ্ঠস্বর, বিচিত্র ব্যবহার প্রভৃতি লক্ষ্য করে সে শুধু ব্যথিতই হয় না,—নিত্য গুমরে মরে অভিমানে! অদ্ভুত সে জ্বালা!—জ্বালাতন হয়েই সে সংকল্প করে, এদের সংশ্রব ত্যাগ করবে: অতি আপনার জন যখন অত্যন্ত পর হ'য়ে যায়, তখন আশা করবার আর কী থাকতে পারে! সুতরাং, যতদিন এ বাড়ীতে থাকতে সে বাধ্য হবে, ততদিন অনধিকার চর্চ্চাকে সে প্রশ্রয় দেবেনা! কিছুতেই না!……সত্যই তো—স্বাধীনা জেনানার যা খুশী তাই করবার অধিকার আছে; কিন্তু সে বাধা দেবার কে? তার যদি সহ্য না হয়—চলে গেলেই পারে এ বাড়ী থেকে! কিন্তু. তবুও—

সেতারের দ্রুত গতির মতোই হু হু করে মনে পড়ে যায় কত শত পুরোন কথা! অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন তার উদগ্র হয়ে ওঠে পূর্ব্বাপর ঘটনার তুলনামূলক আলোচনায়—

মনে পড়ে যায় গৃহস্থঘরের একটি লক্ষ্মী প্রতিমাকে। আজকেকার

মতো সেদিনও সে ছিল দেহের সৌষ্ঠবে, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, রমণী সমাজের বিস্ময়। শুধু তফাৎ এই যে, নিজেকে প্রকাশ করবার এই উৎকট প্রবৃত্তিটা সেদিন তার একেবারেই ছিল না। শাঁখা-সিঁদুর মাত্র সার, মামুলী মিলের শাড়ী পরা রাঙাবৌয়ের মধ্যে সংযত জীবন-যাপনের যে শান্তশ্রী পরিলক্ষিত হতো, আজ তার চিহ্নমাত্রও নেই। রাঙাবৌ আজ আপাত মনোরমের মোহে প্রতিবেশীর অশ্রদ্ধাকেও অগ্রাহ্য করতে সাহস পেয়েছে। ভুলে গেছে, আগে পাড়ার মেয়েরা কত আসতো এ বাড়ীতে! কত বন্ধু ছিল তার! কত তুচ্ছ অজুহাতে তারা সরগরম করে তুলতো বড় সরীকের অন্দর। অথচ, আজ তাদের কেউ ছায়াও মাড়ায় না, তার কারণ—

কারণটা মনে পড়লেই গায়ে কাঁটা দেয় তার। মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের সেই লুকিয়ে দেখা। ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে সুব্রতর সঙ্গে রাঙাবৌয়ের সেই রহস্যময় কথাবার্ত্তা! দুজনের সম্বন্ধটা কী পরিমাণ ঘনিষ্ঠ হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটা স্থূল চিত্র কল্পনা করবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই গা গুলিয়ে ওঠে তার, নিজের মনের গতি উপলব্ধি করে। আশ্চর্য—

তাকে বিস্মিত বা বিচলিত করতে পারে, এমন কিছু আছে নাকি এ জগতে! পলিটিক্যাল দলাদলি; দলগত হানাহানি; গুপ্তহত্যা; নারী-ধর্ষণ; ধর্ম্মান্তরিত করণ—সব রকম নোংরামীরই চরম পরিচয় পেয়েছে সে। নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রত্যক্ষ করেছে সে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনেকগুলো অধ্যায়। এ সব ব্যাপারে অনেক খ্যাতিমানের চাইতেও সে বেশী অভিজ্ঞ! অনেক কিছু নোংরামীর নরককুণ্ড দর্শন

করেই আজ সে অগ্নিশুদ্ধ! তবুও কেন বিচলিত হয় সে বিশ্বাস করার ব্যাপারে!—ব্যাপারটা নিজের বাড়ীর বলে?

পুঁথির অক্ষর মারফৎ জেনেছে সে অনেক রকমের বৈপ্লবিক কাহিনী। মহাপাপের ভিত্তিতে পরম কল্যাণ আনার অনেক কিছু তথাকথিত দার্শনিক যুক্তি। তবুও, বহুকাল পূর্ব্বে 'যোগাযোগ' মারফৎ যে রূঢ় সত্যের চিত্র এঁকেছিলেন বিশ্বকবি—নিজের ঘরে তার প্রত্যক্ষ উদাহরণের কথা ভাবতে পারলেও—বিশ্বাস করতে পারছে না কেন সে?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের সন্দেহ-দোলায় দুলতে দুলতে হঠাৎ একটা সমাধানের ইঙ্গিত পায় সে: রাঙাবৌয়ের ভাল-মন্দ রুচি-অরুচি নিয়ে এইভাবে দিনের পর দিন মনের শান্তি নষ্ট করছে সে—সে কি এতই সস্তা লোক!

কিন্তু, জীবনের এই ক্ষয় ক্ষতির পরিণাম সম্বন্ধে রাঙাবৌ নিজে যে সচেতন—সে যে স্বেচ্ছায় ফলাফল বিবেচনা করেই বরণ করে নিয়েছে এই ভোগবিলাসের জীবন—এ কথাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তার! রাঙাবৌ আজকাল অবশ্য অনেক বড় বড় গালভরা বুলি আওড়াতে শিখেছে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস, আধুনিক দুনিয়ার গতি-প্রগতি সম্বন্ধে রাঙাবৌয়ের নিজের কোন বিচার বিবেচনা নেই; সবই সে আওড়ায় সুব্রতর মুখের ঝাল খেয়ে। সুতরাং এ সমস্তর জন্য দায়ী, রাঙাবৌ নয়—

আক্রোশটা গিয়ে পড়ে সুব্রতর ওপর। সে-ই সর্ব্বনাশ করেছে রাঙাবৌয়ের। সে-ই মেম্ সাহেব করে তুলতে চায় রায়বাড়ীর বৌকে! কিন্তু পরের বৌকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, নিজে একটা বিয়ে

করে ফেললে কি ঢের ভাল কাজ হতোনা? ছোঁড়াটা বিয়ে করেনা কেন? সুস্থ স্বাস্থ্যবান উপার্জ্জনশীল ছেলে বিয়ের নামে এত ডরায় কেন? কারণ জিজ্ঞাসা করলে কেন এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা অন্য কথা পেড়ে? কী ওর রহস্য?

দুর্ব্বোধ্য রহস্য! মামার অন্নে মানুষ হলেই কি ভুলে যেতে হয় পিতৃবংশের মর্য্যাদা? শিক্ষার অজুহাতে বিলেত গেলেই কি হারিয়ে আসতে হয় মনুষ্যত্ব? সুব্রত কি এই বংশেরই ছেলে নয়?

চৌদ্দ

বাইরে মোটর গর্জ্জে উঠল। পরমুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকল সুব্রত।—অন্দরে ডিরি ডিরি তখন দাপটে চলছিল। শুনে, সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল: জহর এসেছে নাকি?

সত্যব্রত সংক্ষেপে বলল: জানি না।

সুব্রত তাড়াতাড়ি অন্দরে গেল; কিন্তু একেবারে রাঙাবৌয়ের ঘরে ঢুকল না। আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, রাঙাবৌ একলা,—ভুরু কুঁচ্‌কে একাগ্রমনে সেধে চলেছে।

রাঙাবৌকে আর বিরক্ত না করে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল পোষাক ছাড়তে; কিন্তু ব্যাপারটার আকস্মিকতায় বিস্মিত না হ'য়েও পারল না! জহরের সেতার শেখাতে আসা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌয়েরও সেতার নিয়ে বসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; হঠাৎ আজ আবার হ'লো কী?

সুব্রতর সাড়া পেয়ে রাঙাবৌ সেতার রেখে উঠে এল।—রেওয়াজের কল্যাণে, সত্যব্রতর ব্যাপারটা মন থেকে মুছে গিয়েছিল; হাসিমুখেই বলল: বেশ ছেলে যা হোক। কখন এসেছো? আমাকে ডাকলে না কেন?

—দেখলুম, তুমি একমনে সাধ্‌ছো—সুব্রতও হাসিমুখে বলল: তাই আর বিরক্ত করলাম না। কিন্তু, হঠাৎ আজ হ'লো কী? এতদিন পরে আবার সাধ্‌তে বসলে যে?

—বাঃ না সাধ্‌লে যে সব ভুলে যাব!

—ভুলতে তাহলে তুমি চাও না!—সুব্রত বলল: আমি তো ভেবেছিলাম, তোমার সখ বুঝি মিটে গেল!

—সখ! রাঙাবৌ মাথা নেড়ে বলল: তোমার বুঝি ধারণা, আমি সখ করে সেতার শিখছিলাম?

—সখ নয়?

—আজ্ঞে না মশাই! আমার মতো সাধ্‌তে হ'লে ও সব সখ দেশ ছেড়ে পালাতো—

—I am sorry, সুব্রত মাথা নেড়ে বলল: সঙ্গীতটা যে সাধনার বস্তু—তা মনেই ছিল না।

—শুধু সঙ্গীত সাধনা?—রাঙাবৌ বলল: আমার সাধনা তো ডবল-সাধনা!—বাবাঃ যা মাষ্টার যোগাড় করে দিয়েছো,—একটু ভুল হ'লেই গজগজ করবে,—আপনার সাধনা স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা! সাবধান—

—কিন্তু, মাষ্টার তো নি-পাত্তা!

—হ্যাঁ কী হ'লো বলতো তাঁর?—রাঙাবৌ একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই জিজ্ঞাসা করল: কোন কারণে আসতে না পারলে, আগে আগে তো খবর পাঠাতেন! কিন্তু এবার তাঁর হ'লো কী বলতো?

—তাই তো ভাবছি!—সুব্রত চিন্তিত মুখেই বাথরুমে গেল।

সুব্রত চিন্তিত হ'লো বটে; কিন্তু অন্য কথা ভেবে: রাঙাবৌ যে রকম অভিমানী মেয়ে, তাতে খোলাখুলি ভাবে সব কথা তাকে বলা উচিত কি না—

ঘটনাটা ঘটেছিল সত্যব্রত যেদিন বাড়ী ফেরে সেইদিন! এমনি কথায় কথায় রাঙাবৌ তাকে বলেছিল: তোমার ওই বন্ধুটার কাছে আমি আর শিখবনা—খালি হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে!

সুন্দর মেয়ে দেখলে পুরুষ মাত্রেই আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। সুতরাং অভিযোগটার কোন গুরুত্ব দেয়নি সুব্রত। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত বোধহয়, গুরুতর হ'য়েই দাঁড়িয়ে গেছে।

জহর তার বাল্যবন্ধু। তাই, পরের বার শেখাতে আসতে, সুব্রত তাকে রসিকতা করেই শুনিয়ে দিয়েছিল রাঙাবৌয়ের অনুযোগটা। শুনে, জহর বিন্দুমাত্রও অপ্রতিভ না হ'য়ে উত্তর দিয়েছিল: নারীর এত রূপ—এত মেধা—আমি কল্পনাও করতে পারি না। তাই, আমি তাঁকে দেখি—প্রাণভরে দেখি। কিন্তু, কখনও তো লুকিয়ে দেখি না।

—কিন্তু, তোমার ছাত্রী যে বড্ড লজ্জা পায়।

—লজ্জা পান?—জহর আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিল: কিন্তু লজ্জা পাবার মতো কোন কাজ তো আমি করি না—করিনি। তিনি সুন্দর—এটা কি লজ্জার কথা?

—নিশ্চয়ই নয়! তবে—

সঠিক কথাগুলো সুব্রত ভুলে গেছে; তবে এটুকু মনে আছে: আলোচনাটা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজগত হয়ে পড়েছিল এবং জহরের যুক্তি সে খণ্ডন করতে পারেনি। ফলে—

পরের দিন থেকেই বন্ধুবর নি-পাত্তা হ'লেন।—সুব্রত ব্যাপারটাকে প্রথমে গ্রাহ্যই করেনি, সেদিনকার কথাবার্ত্তার জন্যে জহর যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি তার ব্যবহারে। তারপর

দেখতে দেখতে যখন পনেরো দিন কেটে গেল, তখন সে সন্দিগ্ধ না হ'য়ে পারলনা। সন্দেহটা দৃঢ় হ'লো আরও একটা কথা ভেবে: বন্ধুবর সঙ্গীত শিক্ষকের পেষা গ্রহণ করলেও কাজে-কর্ম্মে একেবারেই সুবিধে করে উঠ্‌তে পারছেন না, কারণ, পূর্ব্বজীবনের আভিজাত্য বোধটা তাঁর এখনও উগ্র রয়েছে। এই বোধটার অসাধ্য কিছু নেই। তাই হয়তো, পরে, ভেবে-চিন্তে সে এই ট্যুইশানী ছেড়ে দেওয়াই উচিৎ বিবেচনা করেছে। এবং—

উচিত বিবেচনা করেই সুব্রত এ সম্বন্ধে কোন কথা রাঙাবৌকে জানায়নি। জহর তার যতবড় বন্ধুই হোক না কেন, এ ধরণের ছেলে-মানুষীকে সে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। বন্ধুবর তার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পেরেছেন হাত পেতে—পারলেন না শুধু ট্যুইশানী ছাড়ার সিদ্ধান্তটা জানাতে।—এই যে পনেরো দিন যাবৎ রাঙাবৌয়ের শিক্ষা বন্ধ রয়েছে, এর জন্যে দায়ি কে? জহর ছাড়া আর মাষ্টার নেই নাকি বাজারে? এ কী দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক!

সুব্রত একটু যেন বিরক্ত হ'য়েই বাথরুম থেকে ফিরল; তারপর রাঙাবৌকে ঘরে না দেখে ধুতি পাঞ্জাবী পরে তৈরী হ'য়ে নিল।

রাঙাবৌ জল-খাবার নিয়ে এলো মিনিটখানেক পরে। তারপর সুব্রতকে বেরুবার জন্যে একেবারে তৈরী দেখে, বিরক্ত হ'য়ে বলল: এক্ষুনি আবার কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে শুনি?

সুব্রত একটু হেসে জলযোগে মনোনিবেশ করল।

—চুপ ক'রে রইলে যে? রাঙাবৌ আবার বলল: প্রভাতীর সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম এখনও মেটেনি বুঝি?

—আরে না না, সুব্রত ব্যস্ত হ'য়ে বলল : প্রভাতী দেবী নয়—যাচ্ছি ইজারাদারের ওখানে—

রাঙাবৌ আরও বিরক্ত হ'য়ে বলল : কিন্তু, সেখানেই বা তোমার এত কি কাজ শুনি, যে, বাড়ীতে দু-দণ্ড থাকবার সময় হয় না ?

সুব্রত যুক্তি দেখাল : দুদিন যেতে পারিনি, অথচ, রিহার্শালের দায়িত্বটা ভদ্রলোক আমার ঘাড়েই চাপিয়েছেন।

—ভদ্রলোক না ভদ্র মহিলা ?

—এই রে,—সুব্রত হেসে ফেলল। বলল : তুমিও শেষে জেলাস্ হ'য়ে উঠলে নাকি ?

—জেলাস্ আবার কী ? রাঙাবৌ আরও চড়া গলায় বলল : আমি জানিনা নাকি তোমার মনের কথা !....বেশ তো বিয়ে করো গে যাওনা করুণাকে...এত ভনিতা কেন...

—ছিঃ রাঙাবৌ !—সুব্রতর হাসি মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছিল ; রীতিমত অসন্তুষ্ট হ'য়েই সে বলল : তুমি একজন ভদ্রমহিলা ! আর একজন ভদ্র মহিলাকে নিয়ে, এ ধরণের রসিকতা করা অন্তত তোমার সাজে না !

রাঙাবৌ থমকে গেল। কিন্তু, এও এক দুর্ব্বোধ্য রহস্য তার কাছে। খোলাখুলি আলোচনার ব্যাপারে—সুব্রত তার সঙ্গে যৌন-সমস্যা নিয়ে কথা কইতেও কুণ্ঠিত হয় না ; অথচ, এই ধরণের একটা অতি-সাধারণ রসিকতা করলে—বিবাহের ইঙ্গিত মাত্রেই সে যেন মরমে মরে যায়। এ যে কী ব্যাপার—কী রহস্য, কিছু বুঝতে পারে না সে।—দুদিন পূর্ব্বেও, প্রভাতীকে নিয়ে এই রকম একটা কাণ্ড হ'য়ে গেছে। কিন্তু

আজকের মতো এতখানি বিরক্ত হ'তে তো দেখা যায়নি সেদিন।... বেশ, কাজের কথা ছাড়া সে আর কোন কথাই বলবেনা সুব্রতর সঙ্গে—

রাঙাবৌ গম্ভীরভাবে প্রস্থানোদ্যত হলো; কিন্তু সুব্রত বাধা দিল। ব্যস্ত হ'য়ে বলল: অমনি রাগ হ'লো তো—

—নাঃ রাগ কিসের! ভারি তো মানুষ আমরা, তার আবার রাগ......

—ওই তো বেশ রেগেছো!—সুব্রত এবার রাঙাবৌয়ের হাত ধরল। তারপর তাকে জোর ক'রে বসিয়ে দিয়ে বলল: লক্ষ্মীমেয়ের মতো এবার একটু হাসো তো। হাসো বলছি শীগ্‌গীর, নাহলে সেদিনকার মতো কাণ্ড করবো—

—ছি-ছি, সুব্রতের এই এক বিশ্রী অভ্যাস। সোজা কথায় বাগাতে না পারলেই, ফট্ ক'রে পা জড়িয়ে ধরবে। রাঙাবৌ তাড়াতাড়ি বলল: তোমার কি ঘেন্না-পিত্তি কিছু নেই···

—আমিও তো সেই কথাই বলছি।—রাঙাবৌকে নকল ক'রে সুব্রত বলল: তোমার কি ঘেন্না-পিত্তি কিছু নেই? কথাটা ভাবতে পারলে কী ক'রে? তোমার দেওর কি এমনই অধম্—এতই ইতর যে, অপরের বাগদত্তাকে কামনা করবে!

অভিনয়টা কার্য্যকরী হ'লো; রাঙাবৌয়ের থম্‌থমে মুখে যেন একটু হাসির আভাষ দেখা গেল। ভ্রূভঙ্গি করে সে বলল: ইস্, একেবারে মহাপুরুষ এসেছেন।

—এই তো মহীয়সীর মতো কথা।—সরে পড়বার এমন সুযোগ

আর নষ্ট করল না সুব্রত ; সজোরে হেসে উঠে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাঙাবৌও উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে : সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে, রান্নার ব্যবস্থা করতে হ'বে। কিন্তু, ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়ে, অদূরে সুকৃতিকে আসতে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হ'লো : পূর্ব্বের মতো আজও, সুব্রত চালাকী ক'রে বিয়ের কথা এড়িয়ে গেল। —নিজের স্বল্পবুদ্ধির জন্যে নিজেরই ওপর রাগ ধরল রাঙাবৌয়ের : আজ ক'দিন ধরে সে চেষ্টা করছে, একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে সুব্রতর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে! অথচ, রোজই একটা না একটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার উঠে পড়ে, আসল বক্তব্যটা তার অ-বলা থেকে যাচ্ছে। এদিকে সুকৃতি বেচারা তারই ভরসায় দিন কাটাচ্ছে···

সমস্যাটা গুরুতর এবং তার সমাধানের পন্থাটা আরও বিচিত্র।—ঠাণ্ডা মাথায়, অনেক কিছু ভেবেচিন্তেই রাঙাবৌ খুঁজে বার করেছে এই সম্ভাব্য পথ। কিন্তু এগোবার পূর্ব্বে তাকে যে জানাতেই হ'বে—কেন বিয়ের নামে কথা এড়িয়ে যায় সুব্রত? কী তার আসল কারণ? কী হ'তে পারে?—সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকমের সন্দেহ জাগে রাঙাবৌয়ের মনে—

সুকৃতি ঘরে ঢুকল। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে সে একেবারে বসে পড়ল রাঙাবৌয়ের পাশে।

—এসো!—বাবা ভাল আছেন তো আজ?

অন্যান্য দিন সুকৃতি ভাল-মন্দ যা হোক কিছু একটা উত্তর দেয়, কিন্তু আজ কথা কইল না; শুধু মুচকে একটু হাসল।

হাসিটা একেবারেই ভাল লাগলো না রাঙাবৌয়ের। বলল: হাসলে যে? কী হ'য়েছে? খরচ পত্র কম পড়েছে? কিছু টাকা এনে দোব?

—না না। সবেগে ঘাড় নেড়ে, সুকৃতি যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল: টাকা আর নয়—

—তবে?—রাঙাবৌয়ের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। বলল: কী হ'য়েছে? বাবা ভাল আছেন তো?

—ভাল আছেন বৈকি!—বলে সুকৃতি আবার হাসল।

রাঙাবৌ তার জীবনে অনেক রকম হাসি দেখেছে, কিন্তু এ হাসির যেন তুলনা নেই—এ যেন কান্নার চাইতেও অসহ্য। সে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলল: সুকৃতি, কী হয়েছে বলবে না আমাকে?

—ওই তো বললাম!—সুকৃতি হাসিমুখেই বলল: তিনি ভাল আছেন···আরও ভাল থাকবেন এবার থেকে···তাই তো দেখে যেতে এলাম আপনাকে···

স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পারলেও, একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় রাঙাবৌয়ের মুখ মলিন হ'য়ে গেল। সে আবার বলল: সুকৃতি, আমি তোমার দিদি হই—আমার কাছেও লুকোবে? বল কী হ'য়েছে—

সুকৃতি এবার হুম্‌ড়ি খেয়ে রাঙাবৌয়ের কোলে মুখ লুকোলো।

রাঙাবৌয়ের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। সুকৃতিকে মিনিটখানেক কাঁদবার সুযোগ দিয়ে, সে জোর করে তার মুখ তুলে ধরল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ধর্ষিতা নারী,—তাই তার কান্নায় আওয়াজ ছিল না; শুধু প্রাকৃতিক কারণে, চোখের শিরা উপশিরাগুলো বর্ষণের বিনিময়ে ক্লেদমুক্ত হচ্ছিল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে রাঙাবৌ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: সুকৃতি, কেঁদোনা ভাই—

প্রকৃতিস্থ হ'তে আরও কিছুক্ষণ লাগল সুকৃতির। কিন্তু কান্না থামতে না থামতেই, আবার পূর্ব্বেকার সেই দুর্ব্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল: আমি তো আর কাঁদি না বৌদি!

কী যে ছিল সুকৃতির কণ্ঠস্বরে,—রাঙাবৌয়ের বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। সে চেষ্টা ক'রেও আর সুকৃতির মুখের দিকে তাকাতে পারল না!

—একটা জিনিষ দেখবেন বৌদি?—সুকৃতি হঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়াল; তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল: দাঁড়ান নিয়ে আসি—

রাঙাবৌ অভিভূতের মতোই বসে রইল। সুকৃতির আজকের ব্যবহারটা তাকে যেন একেবারে দিশেহারা করে দিয়েছিল।...টাকার দরকার নেই...বাবা ভাল আছেন—তবে? এমন কান্না তো সুকৃতি কখনও কাঁদেনি তার কাছে! এমন সর্ব্বনেশে হাসিও তো হাসেনি কখনও সে! তবে—

সুকৃতির ফিরতে প্রায় মিনিট সাতেক লাগল—সঙ্গে আর একটি মেয়ে।

ময়লা শাড়ী-পরা বয়স্থা মেয়ে; চাল-চলন কুণ্ঠাহীন; কিন্তু চোখের

দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে রাঙাবৌয়ের কেমন যেন সন্দেহ হ'লো। বলল: এ কে সুকৃতি?

—কুন্তী—মানে কুন্তলা—

—কিন্তু, মেয়েটি কে?

—তালুকদারের ভাইপো-বৌ।

—তালুকদার আবার কে?

সুকৃতি এবার কুন্তলার দিকে চাইল। তারপর তার গায়ে হাত দিয়ে বলল: শুনছো, তালুকদার কে বলতে পারো?

কুন্তলা রাঙাবৌয়ের ভাঁড়ার দেখছিল, সুকৃতির স্পর্শে মুখ ফিরিয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল: ওই তো পাঁউরুটি—

সুকৃতি রাঙাবৌয়ের দিকে চেয়ে হাসল। বলল: বুঝতে পারছেন কিছু?

রাঙাবৌয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি একটা পাঁউরুটি এনে দিল কুন্তলার হাতে; তারপর ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল: পাগল?

কুন্তলা সঙ্গে সঙ্গেই পাঁউরুটিতে কামড় মেরেছিল। দেখে, সুকৃতি একটা নিশ্বাস ফেলল! বলল: তালুকদারের স্নেহ সহ্য করতে পারলে না—বেচারা!

—কিন্তু তালুকদারটা কে?

—তালুকদারটাকে দেখেন নি আপনি? কদ্দিন ধরে যাতায়াত করছিল—কাল থেকে একেবারে চেপে বসেছে এখানে—

রাঙাবৌয়ের মনে পড়ল। বলল : ও সেই গোবেচারা গোছের বুড়ো লোকটি? তিনি তো তোমাদের আত্মীয় হন—

—শুধু আত্মীয়? পরমাত্মীয়—

—আত্মীয় নন্? তবে কে তিনি?

—তিনি? সুকৃতি আবার হাসল। বলল : তিনি আমাদের গাঁয়ের লোক—স্বনামধন্য পুরুষ। শুনেছি, পুলিশের খাতায় নাম আছে তাঁর।

—স্বদেশী করেন বুঝি?

—না, তার চাইতে ঢের বড় কাজ! দালালী করেন।

—কিসের দালালী?

—বৌদি আপনি কি?—সুকৃতি এবার ভেঙে পড়ল। বলল : বুঝতে পারছেন না কিসের দালাল সে? কেন চেপে বসেছে এখানে?

যার খবর অনেক খ্যাতনামা সমাজসেবীও রাখেন না, সে সংবাদ রাঙাবৌ জানবে কী করে? বিগত মন্বন্তরের সময়ে জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলোতে অনেক রকম ভদ্রলোকের, অনেক রকম লাল হওয়ার খবর পত্রস্থ হ'তো; কিন্তু তালুকদারের মতো ভদ্রলোকেরা কিসের দালালী ক'রে লাল হয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে কোন খবর কোথাও পড়েছে বলে স্মরণ করতে পারল না রাঙাবৌ!

যুদ্ধ আজ মিটে গেছে। স্বাধীন হয়েছে দেশ। দুর্ভিক্ষর হিড়িকও তেমন আর কানে আসে না। কিন্তু তার জন্যে, তালুকদারের মতো ভদ্র সন্তানদের কাজ-কারবার কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। সমাজের বুকের ওপর নিশ্চিন্তে বিচরণ করে, পূর্ব্বের মতোই নির্বিঘ্নে, এরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে!

পরাধীনতা আর নেই! মন্বন্তর নিশ্চিহ্ন! মিলিটারীরাও চলে গেছে যে যার নিজের দেশে! কিন্তু, তাতে হয়েছে কী? মন্বন্তর আর মিলিটারীর স্থান গ্রহণ করেছে প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম আর কালো-বাজারী!...পরার্থে যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন সমস্তদিন ধরে, রাত্রের অন্ধকারে তাঁদের অনেকেরই যে দালাল দরকার হয়...এনার্জ্জী সঞ্চয়ের জন্য। এনার্জ্জীর অভাবে তাঁরাই যদি ঝিমিয়ে পড়েন, তাহলে আর দেশ স্বাধীন ক'রে ফল হ'লো কী? স্বাধীনতাটা ভোগ করবে কে?

সুব্রতর শিক্ষায় রাজাবৌ ভাবতে শিখেছিল! সুকৃতির কাছে এই অভিনব দালালীর অত্যদ্ভুত ইতিহাস শুনে, তার অনুশোচনা হলো: আগে সে ছিল ভাল। অশিক্ষিত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন, এই ধরণের সমস্যা নিয়ে অশান্তি ভোগ করবার দুর্ভোগ তো তাদের জীবনে আসে না।

ব্যাপারটা কল্পনা ক'রে শিউরে ওঠে রাঙাবৌ। তালুকদার লোকটা দেখতে গোবেচারী—বয়সেও বৃদ্ধ! কিন্তু কী অদ্ভুত তার অর্থোপার্জ্জনের কৌশল। গত মন্বন্তরের সময়ে তার ব্যবসার মূলধন ছিল, চাষী শ্রমিক শ্রেণী ও বিত্তহীন ভদ্রঘরের মেয়েরা। উপার্জ্জনের আশায় বাইরে বেরিয়ে, তারা ঘরে ফিরতো না আর কেউ! এ ছাড়া, অল্প খরচে তীর্থ করিয়ে আনবার অজুহাতে, লোকটা মধ্যবিত্তদের দ্বারাও কার্য্যোদ্ধার করতো!—পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে, মেয়েগুলো নিজেরাই নারাজ হ'তো সমাজের ভয়ে বাড়ী ফিরতে। সঙ্গের পিসী-মাসীরাও ঘরে ফিরে ডুক্‌রে কেঁদে ঘোষণা করতো—তাদের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর সংবাদ! তালুকদারের ষড়যন্ত্রটা

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রয়ে যেত উহ্য।—আর জানাজানি হ'লেই বা ক্ষতি কী। ঘর আছে তার দেশে দেশে। তবে শোনা যায়, একবার নাকি, এক নৌকা মেয়েশুদ্ধ ধরা পড়ে সে শ্রীঘরে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্যে।

তারপর, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তালুকদারও তার বিজ্‌নেস্‌ পলিসী বদ্‌লেছে! মন্বন্তর মিলিটারী গেছে,—এসেছে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আর স্বাধীনতা। তাই এখন সে বিতাড়িত দেশের লোকদের খোঁজ-খবর নিয়ে উপকার ক'রে বেড়ায়—যেমন সুকৃতিদের উপকারে এসেছে। একাধারে পেয়িং-গেষ্ট ও সাব-টেনাণ্ট হ'য়ে চপে বসেছে একেবারে ঘরের মধ্যে; তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে ভাইঝি!

সুকৃতির পিতা বৃদ্ধ বেকার এবং রুগ্ন। কিন্তু স্মৃতিশক্তিহীন উন্মাদ নন্! তিনি জানেন—তালুকদারের কৃপায় অমন কত শত ভাইঝি ভাগ্নী বিক্রীত হ'য়েছে সুদূর বেলুচিস্থানে, সিন্ধ-এ, পাঞ্জাবে! কতজন আজ বিরাজ করছে সহর বাজারের নরককুণ্ডে। কিন্তু, তবুও, দু'বেলা দু'মুঠো নিশ্চিত অন্নের প্রলোভনে তিনি তালুকদারকে গ্রহণ করেছেন—সাদরে, উপকারী বন্ধু হিসাবে। সুকৃতি—যে এতদিন ছিল তাঁর অন্ধের নুড়ি,—আপত্তি জানাতে গিয়ে, তাকেও আজ শুনতে হ'য়েছে: ঘাড়ের বোঝা কুলের কলঙ্ক, তুই মরিস্‌ না কেন? তোর জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা?

রাঙাবৌ আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: তোমার বাবার মতো নিরীহ লোক,—বলতে পারলেন ওই কথা?

—পারলেন বৈকি! সুক্তি হাসিমুখেই বলল: তাইতো আমিও ঠিক করেছি,—তাঁকে নিশ্চিন্তই করবো—

—নিশ্চিন্ত করবে?—রাঙাবৌ সন্দিগ্ধ হ'য়ে বলল: তার মানে?

সুকৃতি অন্যদিকে মুখ ফেরাল,—উত্তর দিল না। দেখে, রাঙাবৌয়ের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলল: সুকৃতি, কী হ'য়েছে বলো। নিশ্চিন্ত করবে মানে?

—বৌদি, আপনি কী!—সুকৃতির চোখদুটো আবার সজল হ'য়ে আসছিল; রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে সে বলল: কেন আপনি আর সকলের মতো নন? কেন এত ভাবেন আমার জন্যে?

—ও সব বাজে কথা রাখ।—রাঙাবৌ ধমক দিয়ে বলল: সত্যি ক'রে বলো, কী মৎলব করেছো তুমি?

—মৎলব আমায় কেন করতে হ'বে দৌদি—সুকৃতি রুদ্ধকণ্ঠে বলল: ওঁরাই তো সব ব্যবস্থা করেছেন।

—কী ব্যবস্থা করেছেন?

—বুঝতে পারছেন না?—সুকৃতির রুদ্ধকণ্ঠও কেমন যেন তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। বলল: আমাকে ধুইয়ে মুছিয়ে, বাবাকে নিশ্চিন্ত করবে তালুকদার

ছোট্ট একটা মেয়েলী ইঙ্গিত; কিন্তু রাঙাবৌ যা বোঝবার তা বুঝল। কুন্তী মেয়েটা পাগল হ'য়ে গিয়ে কাজের বার হ'য়ে গিয়েছে; অথচ, তালুকদারও লোকসান সহ্য করবার পাত্র নন্! সম্ভবত তাই, কুন্তীর বদলি হিসাবে দরকার পড়েছে সুকৃতিকে। কিন্তু—

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাঙাবৌয়ের গায়ে কাঁটা দিল। সুকৃতি এবাড়ীতে এসেছে আজ প্রায় মাসাবধি কাল হ'তে চলল;

কিন্তু এখনও যে আসেনি, তার বয়স যে ইতিমধ্যে চার মাস পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে !···ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে রাঙাবৌয়েরই কাছে। তারই কাছে সুকৃতি স্বীকার করে—অনাগতের পিতৃ-পরিচয় সে জানেনা।—জানবার কথাও নয়! তারই উপদেশে সুকৃতি প্রথম উপলব্ধি করে হিন্দু সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তির কথা—সামাজিক পবিত্রতার অজুহাতে যে সমাজ তার মতো কুমারী মাতাকে চিরকাল ত্যাগই করে এসেছে—কখনও গ্রহণ করেনি! কিন্তু রাঙাবৌয়েরই জবরদস্তিতে সে অবহেলা করতে পারেনি—পেটের শত্রুটাকে। সম্প্রদায়-বিশেষের মহাপাপের ভ্রূণ হ'লেও, নিষ্পাপ প্রকৃতির দানকে অনাদর করতে পারেনি সে;—সেই অবাঞ্ছিত অনাগতের কল্যাণের জন্যই এতদিন সযত্নে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে সুকৃতি। কিন্তু এতদিন পরে, দারিদ্র্যের জ্বালায়, গর্ভবতী যদি আবার কুমারী সাজতে বাধ্য হয়?··· তাহলে····?

ভ্রূণহত্যার সামাজিক শাস্তি হয়তো সে এড়াতে পারবে তালুকদারের কৌশলে। লোকটার অন্যান্য ভাইঝি ভাগ্নিদের মতো সুকৃতিও হয়তো কোন দূরদেশের বিদেশীর কাছে বিক্রীত হ'য়ে বিপদমুক্ত হ'বে; কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করবে সে কেমন ক'রে? সে তো সত্যিই পুরুষের হাতের খেলার পুতুল নয়—নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ নয়!

হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করবে সে আত্মহত্যা করে!

কিন্তু আত্মহত্যার মহাপাপ-ই বা সে করতে যাবে কেন? কার স্বার্থে—কিসের জন্যে? কী দরকার তার স্বধর্ম্মীদের মুখ চাইবার? বিধি ব্যবস্থায়, বর্ত্তমানের মূল্য নেই যার কানাকড়ি,—ভবিষ্যতের

আশায় মহাপাপ করবে সে, সেই সমাজেরই একজন হবার প্রলোভনে —প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হাঁড়ি-কাঠে দেহবলি দিয়েও ফিরে এসেছিল সে কিসের আশায়? আশাহত হ'য়ে আত্মহত্যা করবার জন্য? না, জীবনটা তার অত সস্তা নয়। স্বধর্মীদের ক্লীবত্ব তার কুমারী জীবন কলঙ্কিত করেছে—নিত্য প্ররোচনা দিচ্ছে আত্মহত্যায়—ভ্রূণ হত্যায় কিন্তু কেন সে করতে যাবে এত বড় পাপ?—সত্যিই কি তার কোন উপায় নেই?…ধর্ষিতা নারীকে যারা বিবাহিতা স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে পারে—শুধু বিধর্ম্মী হওয়ার অজুহাতেই তাদেরকে সে এড়িয়ে চলবে? হলই বা অ-হিন্দু—অমানুষ তো তারা নয়…

কিন্তু, এখনই এই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ওঠে কেন? এত বড় একটা হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন কেউ-ই কি নেই, যে, সুকৃতির মেহেরুন্নেসা হওয়া রোধ করতে পারে! রাঙাবৌ আশ্বাস দিয়ে বলে: এখনই ওই সব বিশ্রী কথা ভাবছো কেন? আমি তো এখন মরি নি!

সুকৃতি মাথা নাড়ে। বলে: এখানে থাকলে, মরণ ছাড়া আমার গতি নেই।

—মরণ নয়—রাঙাবৌ দৃঢ়স্বরে বলে: তোমার জীবনে যা আসছে তা মরণ নয়—এয়োতী!

কিন্তু—সুকৃতির যে আর ভরসা হয়না! এ ধরণের আশ্বাস সে পূর্ব্বেও পেয়েছে। পেয়ে, বিশ্বাস করেছে, নির্ভর হ'য়েছে। কিন্তু, আজ যে তার জীবনে দেখা দিয়েছে আর এক আতঙ্ক…তালুকদার—

তবুও, আত্মবিশ্বাসে অটল হ'য়ে রাঙাবৌ আবার তাকে ভরসা দেয়: ভয় নেই!

আত্মবিশ্বাসও অকারণে জন্মায় না! নিজে কী ছিল রাঙাবৌ? আর, আজ কার সাহসে সাহসী হয় সে সুকৃতিকে সাহস দিতে?

হতভাগিনী সে নিজেও ছিল। স্বামীহীন-সন্তানহীন জীবনে তার আশা করবার কিছুই ছিলনা! কেউ ছিলনা তার আপনার বলতে তিনকুলে! কেউ কখনও শোনায়নি তাকে কোন আশার বাণী! অমানিশার নিশ্ছিদ্র কালোর মতোই জীবনটা ছিল যেন তার জীবনী-বিহিন। বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও, জানতো না সে বিধির বিধান! বুঝতো না মস্তিষ্কের মূল্য। সমাজের ক্রীড়ণক হ'য়ে—সংস্কারের মান বাড়িয়ে, সে শুধু বেঁচে থাকবার আশা করেছিল আ-মৃত্যু!···ইচ্ছা জাগলে, সে সসঙ্কোচে ঝেড়ে ফেলতো যত কিছু মনের বালাই। তারপর এল একজন—

সে এসে শোনাল নতুন কথা: সমাজ সংস্কার ধর্ম্ম বিধাতা কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার জন্যেই তো ওরা আছে!—তুমিই তো সৃষ্টি করেছ বিধাতাকে!—তুমিই যদি মিথ্যে হ'য়ে যাও, তাহলে ওদের সার্থকতা কতটুকু!

সার্থকতা!

স্বামী-সন্তানহীন জীবন····তার আবার সার্থকতা!

কিন্তু তার নিজের জীবনটাই কি একমাত্র জীবন? নিজের জীবনে যা সে পায়নি, তাই যদি দেখা দেয় অপরের জীবনে, অবাঞ্ছিতরূপে, সে ক্ষেত্রে সে কি কিছুই করতে পারেনা? নিজে সে বিড়ম্বিত বলে অপরকে কি সে সার্থক করে তুলতে পারেনা।

পারে, নিশ্চয়ই পারে। জীবন-দর্শনের দীক্ষা তার অল্পদিনের

হ'লেও ভিত্তি তার ভঙ্গুর নয়। সঞ্চয় তার স্বল্প হ'লেও মেকী সে নয় নিশ্চয়ই। শুরু তার নবীন হলেও, গুরুত্ব তার অপরিসীম নিঃসন্দেহ। —সুব্রত অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীন নয়—

কিন্তু বিবাহ?

এতাবৎকালের মধ্যে যতবার চেষ্টা করেছে সে, ততবারই কৌশলে কথাটা এড়িয়ে গেছে সুব্রত; অথচ সুকৃতির একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে?

শত চেষ্টা করেও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা রাঙাবৌ। যে সুব্রত পরস্ত্রী সম্বন্ধে এত উদার—এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, কারুকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব সে সহ্য করতে পারেনা কেন? কী সে রহস্য?

রহস্যটা যে কী, তা অবশ্য সে জানে না; কিন্তু কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়েও পারে না সে। নিজের বুদ্ধিতে বিচার বিবেচনা করেই সে অনুমান করে: একনিষ্ঠ প্রেম ছাড়া এমন সৃষ্টিছাড়া ঔদাসীন্য কারুর থাকতে পারে না। সুব্রত উচ্চশিক্ষিত বিলেত ফেরৎ লোক;—অসংখ্য প্রগতিশীলা আধুনিকার কামনার পাত্র সে। কিন্তু, তবুও বাঁধা সে কোথাও পড়েনা, কারণ,—বন্ধন তার সামান্য নয়, সাধারণ নয়। কামনাকে জয় করেছে সে, কামনার নিষ্ঠায় একনিষ্ঠ বলেই। তাই, যাকে সে ভালবাসে না, তাকে বিবাহ করতে পারে না; যাকে সে বিবাহ করতে পারে না, তাকে কামনাও করেনা—মুহূর্ত্তের ভুলেও না। অথচ, তার ব্যবহারিক জীবনের সরলতা দেখে সন্দিগ্ধচেতারা বিষোদ্গার ক'রে—ঘি-আগুনের নজীর দেখিয়ে! কিন্তু, পর তো দূরের কথা, রাঙাবৌ যে নিজেকে দিয়েই বুঝেছে—কত বড় সে। নীলকণ্ঠ কি

বিষকে ডরায়। নিজে যে অগ্নিশুদ্ধ, আগুনে তার কী ভয়। কিন্তু, বিবাহ......

রাঙাবৌ নিজের কাছেই কেমন যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে!—অজানা অচেনা একটা ভিন্ন বর্ণের ধর্ষিতা মেয়েকে আচম্‌কা বিবাহ করতে বলাটা....কেমন যেন অদ্ভুত নয় কী? যদি সুব্রত সম্মত না হয়... যদি সে সশব্দে হেসে উঠে প্রমাণ ক'রে দেয় : রাঙাবৌ একটা ছেলেমানুষ...

হিন্দুর বিবাহ তার ধর্ম্ম-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। সাক্ষী থাকেন ভগবান। এই ধরণের বিবাহকে নিছক মৎলব-সিদ্ধির জন্য কাজে লাগানোটা কি অপরাধ নয়? ভগবান কি এতে রাগ করবেন না?—কথাটা ভাবতে গিয়ে বিচলিত হ'য়ে পড়ে রাঙাবৌ। কেবলি মনে পড়ে যায় কয়েকদিন পূর্ব্বেকার একটা কথা! ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সুব্রত সেদিন তাকে বলেছিল, ঋষিরা অগ্নিকে আহ্বান করেছিলেন কল্যাণের প্রয়োজনেই—ধ্বংসের কারণে নয়। সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েও দিয়েছিল সে : বিধ্বংসী বাড়বানলের তাৎপর্য্যগত সার্থকতা ; কল্যাণ-প্রসূ স্বাহা মন্ত্রের যথার্থ সংজ্ঞা ; ঐতিহ্যপূর্ণ বৈদিক বিবাহের যজ্ঞ কিসের প্রয়োজনে সাগ্নিক—কিসের জন্য হোতারা সাক্ষী মানেন অগ্নিদেবতাকে।

ওসব বড় বড় কথা রাঙাবৌ কোনদিনই ভাল বুঝতে পারে না ; কিন্তু বক্তার বক্তব্যগুলো যে উপলব্ধিগত সত্য,—একথা বিশ্বাস করে সে তৃপ্তি পায়! এবং এই বিশ্বাসটাই যেন টলিয়ে দেয় তার সংকল্পের দৃঢ়তাকে।

কিন্তু মন-মরা হয়েও বেশীক্ষণ থাকতে পারেনা সে—আবার মনে পড়ে যায় সুকৃতির মুখখানা। তখন, আবার নতুন করে কল্পনার জাল বোনে সে! আবার তার মনে হয়—সুকৃতির মতো মেয়ের দুর্ভোগ দূর করতে পারে একমাত্র সেই পুরুষই—নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা যার আর পাঁচজনের মতো কথার কথা নয়—একান্তই সত্য। সুতরাং···আবার ফিরে আসে রাঙাবৌয়ের আত্মবিশ্বাস! সংকল্পে অটল হ'য়ে আবার সে স্থির করে তার কর্ত্তব্য! কিন্তু আসল কথাটা শেষ পর্য্যন্ত আর বলতে পারা যায় না—

অন্যান্য দিনের মতো রান্নাঘরের কাজ সেরে, সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়তে যায় সুব্রতর কাছে। পাঠ্যটা ছিল পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর চরিত্র! আলোচনার জের টেনে সুব্রত বলল: নিছক খারাপ বা ভাল বলে পৃথিবীতে কিছু নেই! আলাউদ্দীনের মতো লোকও গুণের কদর বুঝতো, গুণীর সম্মান দিতো! প্রমান, আমীর খসরু, গোপাল নায়ক, বৈজু। আলাউদ্দীনের আমলেই সেতারের মতো সঙ্গীত যন্ত্রের সৃষ্টি হয়—কাওয়ালী ঢংয়ের গান প্রচলিত হয়। আলাউদ্দীনও, আর পাঁচজন মুসলমানের মতো হিন্দুকে ঘৃণা করতো; কিন্তু ব্যাভিচারী রাজকর্ম্মচারীদের শাস্তি দেবার সময় হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ করতো না। আলাউদ্দীন তার রাজত্বে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দিয়েছিল; কিন্তু যদি কোন civil supply অফিসার বা কালোবাজারী ব্যবসায়ী ধরা পড়তো—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রকাশ্য স্থানে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো—ক্ষমা ছিল না। বুঝতে পারছো?

—হুঁ, কিন্তু—রাঙাবৌ আর সামলাতে পারল না, বলে ফেলল : একটা সত্যি কথা বলবে ?

—নিশ্চয়ই বলবো। ভুল বুঝে সুব্রত উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। বলল : অবশ্য, যদি পারি—

—পারি আবার কী! রাঙাবৌ বলল : এতো শুধু তুমিই পারবে—অপরে পারবে কেন ?

—ও বাবা! সুব্রত হেসে ফেলল। বলল : আমাকে প্রকাণ্ড বিদ্বান ঠাউরেছো দেখছি! বলো শুনি তোমার প্রশ্ন—

—কিন্তু ঠিক্ বলবে তো ? কথা এড়িয়ে যাবেনা ?

—কী আশ্চর্য্য! সুব্রত এবার একটু সন্দিগ্ধ হ'য়ে বলল : ক্ষমতায় কুলোলে, বলবো না কেন ?

—তবে বলো—রাঙাবৌ এক নিশ্বাসে বলে ফেলল : কেন তুমি আজও বিয়ে করোনি ?

সুব্রত একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

—লক্ষ্মীটি ঠাকুরপো—রাঙাবৌ অনুনয় ক'রে বলল : আমাকে সত্যি ক'রে বলো আজ—কেন তুমি বিয়ে করোনি ?

উত্তর তো মিললই না বরং সুব্রতের মুখ চোখের অবস্থা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

রাঙাবৌও আর উৎকণ্ঠা দমন করতে পারলনা; হঠাৎ তার হাত দুটো মুঠো করে ধরে বলল : আমাকেও বলবে না ?

সম্ভবত স্পর্শগুণেই সুব্রতর অভিভূত ভাবটা একটু কমল; অস্পষ্ট-ভাবে বলল : কী সব বাজে কথা আরম্ভ করলে তুমি···?

—বাজে কথা নয়! রাঙাবৌ অধীর হ'য়ে বলল: আজ তোমাকে বলতেই হবে! কেন,—আমি কি তোমার কেউ নই? শুনছো—চাও আমার দিকে! বলো··

সুব্রত চাইতে পারল না,—দৃষ্টি নিবদ্ধ করল অদূরে রক্ষিত রাইটিং ডেস্কটার দিকে। তারপর. কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল: বলবো, যদি কাউকে বলি, তোমাকেই বলবো।

—তাহলে বলো—

—আজ নয়। অত্যন্ত অসহায়ের মতো বিছানার ওপর হেলে পড়ে সুব্রত বলল: আজ আমি বড় ক্লান্ত।

আজ না হলেও—রহস্যটা কাল জানতে পারবে রাঙাবৌ। একটু আশ্বস্ত হ'য়ে সে তখন জিজ্ঞাসা করল: শরীর খারাপ করছে নাকি? মাথা টিপে দোব?

—না না। সুব্রত ব্যস্ত হ'য়ে বলল: ও কিছু নয়, একটু ঘুমোলেই সব সেরে যাবে'খন। তুমিও শোওগে যাও আজ।

অগত্যা রাঙাবৌ শুতে গেল নিজের ঘরে; কিন্তু ঘুমোতে পারলো না। আশ্বস্ত সে হয়েছিল; কিন্তু অস্থিরতা দমন করতে পারল না।—অসাধ্য সাধনের মতোই আজ সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছে: সুব্রত স্বীকার করেছে, আজ না হ'লেও কাল সে বলবে সব কথা। যে কথা আর কেউ জানেনা—যে দুঃখের পাষাণ ভার এতকাল একলা বয়ে বেড়িয়েছে সে উৎকট নীরবতায়—আগামীকাল তার অংশীদার হবে রাঙাবৌ—একমাত্র রাঙাবৌ। কিন্তু—

রহস্য-ভেদের আশায় অপেক্ষা করার অস্বস্তিটাও কম অদ্ভুত নয়!

অস্বস্তি, অথচ যেন অস্বস্তিকর নয়। কাল সে সব জানতে পারবে জেনেও আজ সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনা। বিনিদ্র চোখে স্বপ্ন দেখে....নির্জ্জন নিশীথে, নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে, বিনিদ্র চোখে স্বপ্ন দেখে সে—সুব্রতর সেই স্বপনচারিণীকে! তারই মতো একটি স্বামী-সন্তানহীনা হতভাগিনীকে। (কিন্তু সধবা সে নয় নিশ্চয়ই! সুব্রত নিশ্চয়ই এত বড় অপরাধ করতে পারে না!) নির্জ্জলা একাদশীর কল্যাণে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য তার সম্ভবত নিশ্চিহ্ন। অধর্ম্মের আশঙ্কায় বোধ হয়, ইতুপূজোও বাদ দিতে পারে না। সতীত্বহানির ভয়ে হয়তো, সহোদরকেও এড়িয়ে চলতে হয় সসঙ্কোচে! কিন্তু ধর্ম্মের নাগপাশে ইহজন্ম তার ব্যর্থ হ'লেও পরজন্ম সম্বন্ধে সে বোধ হয় নৈরাশ্যবাদী নয়! তাই সমাজের নিষ্ঠুর শাসনে সতীত্ব তার নিশ্ছিদ্র হলেও, নারীত্ব বোধ হয় তার মোহগ্রস্ত নয়। সে শুধু বিধবা সেজে বেড়ায় পুরুষ-শাসিত সমাজের অত্যাচারে, কিন্তু বিশ্বাস করে না তার সার্থকতায়। সে বিশ্বাস করেনা এমন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র যা বিধির বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রতিনিয়ত। নারী হ'য়ে জন্মেছে সে বিধাতারই ইচ্ছায়; কিন্তু জীবনটা তার বিড়ম্বিত কার অভিপ্রায়? বিধাতা সৃষ্টি করেছেন তাকে মা হওয়ার জন্যে; কিন্তু তাকে সন্তান-ভাগ্যে বঞ্চিত করবার অধিকার—পুরুষেরা পেয়েছে কোন বিধাতার কাছ থেকে? তাই, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে মানুষকেই ভয় করে চলতে বাধ্য হয় সে। যে সমাজ ব্যবস্থায় জননীর জন্য উৎপীড়িত হ'তে হয় জাতককে,—সে সমাজের নারীর পক্ষে, ভয় করে চলা ছাড়া আর উপায় কী? তাই হয়তো সে তার প্রেমাস্পদকে ফিরিয়ে দিয়েছিল—অনাগতের অমঙ্গল আশঙ্কায়! হয়তো

বলেছিল: আমাদের সাধনা ব্যর্থ হ'বেনা গো। আসছে জন্মে আমরা নিশ্চয়ই পাবো পরস্পরকে।

রাঙাবৌ যেন স্পষ্ট অনুভব করে তার অস্তিত্ব: বহ্নিশিখা সে, কিন্তু কুসুমাবৃত! প্রেমাস্পদের চির আরাধ্য সে, কিন্তু দেহের কারণে নয়—প্রেমের নিষ্ঠায়। সুব্রতর জীবনকে যা আজ মহান করেছে, তা কোন প্রস্ফুটিতের ক্ষণস্থায়ী রূপ নয়—তার অন্তর্নিহিত সুবাস—তুলনায় তা আত্মার মতোই অবিনশ্বর! মেয়েদেরকে কতখানি শ্রদ্ধা করতে পারলে তবে এমন সাধনার মাততে পারে পুরুষ! কিন্তু—

কল্পনার পক্ষীরাজ হঠাৎ হোঁচট্ খায়। রাঙাবৌ যেন একটা যন্ত্রনা বোধ করে মনের মধ্যে: সুব্রতর জীবনে সত্যই কি এমন একজন কেউ থাকতে পারে, যে, রাঙাবৌয়ের চাইতেও তার আপনজন?

এও কি সম্ভব? সুব্রতর জীবনে আর একজন নারী থাকলে, রাঙাবৌয়ের মন কি তা জানতে পারতো না? এতদিনকার ঘনিষ্ঠতার ফলে সে যতটুকু জেনেছে তার মনের খবর—সে খবর ছাড়াও কি আর কিছু থাকতে পারে সুব্রতর মনের গহনে?

মনে মনে অনেক কিছু ভাঙ্গে গড়ে রাঙাবৌ; কিন্তু মন তার অ-মনের মতো কথা মেনে নিতে চায় না। শেষে, মনের জ্বালা তার, যেন চোখে এসে বাসা বাঁধে। অন্যমনস্ক হবার আশায় জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় সে। দেখতে দেখতে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে, অদূরের রাধাচূড়ো গাছটার ওপর—গুচ্ছগুলোতে যেন তার লালের আভা। বিস্মিত হ'য়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে সে পাতার ফাঁক্ দিয়ে। দেখে, ইতিমধ্যে রঙ ধরেছে পূবের আকাশে। অস্পষ্ট সেই রহস্যলোকের দিকে

তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, সে বিচিত্র অনুভূতিতে। শেষ-শরতের হিমেল আমেজ যেন স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয় তার উত্তপ্ত ললাটে। বিনিদ্র চোখে, এতক্ষণ পরে ঘনিয়ে আসে রাত্রি জাগরণের অবসাদ! তন্দ্রাতুর রাঙাবৌ শয্যা গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভোরের বাতাস, যেন ভোরের স্বপ্নর মতোই কানে কানে তার শুনিয়ে যায় আশার বাণী: সহধর্ম্মিনীও নয়—শয্যা-সঙ্গিনীও নয়,—সামান্য একটা স্বীকৃতি মাত্র। সুকৃতির মতো মেয়ের জন্য, সুব্রতর মতো ছেলে একটু ত্যাগ স্বীকার নিশ্চয়ই করবে।

পনের

পরদিন রাঙাবৌয়ের ঘুম ভাঙল করুণার চীৎকারে। সজোরে দরজা ধাক্কা দিতে দিতে সে বলছিল : ও বৌদি, আজ আপনার হ'লো কী ?—এদিকে যে ন'টা বাজে—

রাঙাবৌ বিছানার ওপর উঠে বসেও মিনিটখানেক নড়তে পারল না। তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে : গত রাত্রে, শুতে তার ভোর হ'য়ে গিয়েছিল! কিন্তু, তাই বলে এমনি বে-আক্কেলের মতো ঘুমোবে....

করুণা আবার ডাকল : ও বৌদি—

এইবার রাঙাবৌ ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল। তারপর সশব্দে দরজা খুলেই ডাক দিল : টেঁপীর মা—

আওয়াজের তীক্ষ্ণতায় করুণা সভয়ে দু' পা পেছিয়ে গেল; কিন্তু রাঙাবৌ লক্ষ্য করল না। নিদারুণ বিরক্তিতে করুণাকে অভ্যর্থনা করবার কথাটাও তার মনে এল না; বরং তাকেই সাক্ষী মেনে বলে উঠল : দেখছো এদের আক্কেল! আমাকে একেবারে পাগল ক'রে দিতে চায় ?

দাসী ঘরে ঢুকল।

—কী মৎলব তোদের ?—রাঙাবৌ ঝাঁঝিয়ে উঠল : এত বেলা হ'য়ে গেছে, ডাকিস্ নি কেন ?

দাসী বলল : বড় রায় যে বারণ করলেন।

—বারণ করলে? কেন শুনি?

—তাতো জানি না! বললেন : থাক্, ওদের ঘুমোতে দাও!

—ওদের মানে? রাঙাবৌ আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল : সেজ ঠাকুর-পো ওঠেনি?

—তিনিও তো এই সবে উঠে কলঘরে গেলেন!

রাঙাবৌয়ের মুখে আর কথা জোগাল না। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সে; তারপর হঠাৎ আঁচল থেকে চাবীর রিংটা খুলে দিল দাসীকে।

দাসী অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল। দেখে, রাঙাবৌ আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল : বাসী কাপড়ে ভাঁড়ার ছোঁব নাকি আমি? বামুনদিকে সব গুছিয়ে দিতে বলগে যা—

দাসী চাবী নিয়ে চলে গেল। কিন্তু রাঙাবৌয়ের ধাতস্থ হ'তে সময় লাগল আরও কিছুক্ষণ। আরক্তমুখে বলল : দেখ তো ভাই, কী রকম লজ্জায় পড়তে হয় এদের জ্বালায়। দিন বুঝে সেজ ঠাকুরপোও আবার বেলায় উঠল···

রাঙাবৌয়ের লজ্জা দেখে, করুণার গালদুটোও লাল হ'য়ে উঠেছিল। সুব্রতর সঙ্গে রাঙাবৌয়ের নাম জড়িয়ে পাড়ার রসিক ভদ্রলোকেরা যে সব রসালাপ করে থাকেন, তার কিছু কিছু সেও শুনেছিল। ঘটনা-চক্রে আজ আবার নিজের চোখেই দেখে ফেলল—রাঙাবৌয়ের লজ্জা ···লজ্জাজনিত বিরক্তি····

—বেশ মেয়ে যা হোক তুমি ভাই! রাঙাবৌ এবার আত্মস্থ হয়ে

অনুযোগ করল : সেদিন অত ক'রে বললাম, যা হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও মেয়েটার ; কিন্তু, তুমি একেবারে ডুব মারলে।

করুণার কিছুই মনে ছিল না। বলল : আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো ?

রাঙাবৌ বলল : বাঃ, সেদিন তো তুমি নিজেই দেখে গেলে সুকৃতিকে ! কত কথা হ'লো তার সম্বন্ধে…

করুণার এবার মনে পড়ল। কিন্তু রিফিউজী রিলিফের কল্যাণে, যাকে অফিসিয়ালী খবর রাখতে হয় হাজার গণ্ডা সুকৃতির, তার পক্ষে বিশেষ একজনের সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসর কোথায় ! সে লজ্জিত-ভাবে একটু হাসল।

রাঙাবৌ কিন্তু মুখ ভার করল। সুকৃতিকে উপলক্ষ্য করে, একটা অভাবনীয় কিছু করবার উন্মত্ততায়, এ ক'দিন সে যত কিছু চিন্তা করেছিল মনে মনে, আজ করুণাকে সামনে পেয়ে, সেগুলো যেন বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের মতোই বেরিয়ে পড়তে লাগল। দেখে করুণারও বিস্ময়ের অন্ত রইল না। যে রাঙাবৌ আগে গেরস্থালীর কাজ-কর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না, সে যেন বক্তৃতা দেওয়ার মতো কথা কইছে !—কথার সুরে যেন তার বিজয়লক্ষ্মীর অভিজাত্য ; অরুণা আলীর মতো চোখ-রাঙ্গানী আবেদন ; সরোজিনী নাইডুর মতো হাসি-মুখের শ্লেষাত্মক উপদেশ। অথচ—

আপাততঃ বক্তৃতা শুনে সময় নষ্ট করলে তার চলবে না। একটু ফাঁক পেতেই সে তাড়াতাড়ি বলল : মুখে হাতে জল দেবেন না বৌদি ?

—এই যে যাচ্ছি! রাঙাবৌ অগত্যা বক্তৃতার উপসংহার করল: হ'লেই বা আমরা মেয়ে মানুষ, তাই বলে একটা লোকেরও উপকারে আসবো না? একটা অসহায় হিন্দুর মেয়ে এই ভাবে মুসলমান হ'য়ে যাবে, আর আমরা তাই চোখ চেয়ে দেখবো! কিছুই করতে পারবো না?

—সব হ'বে বৌদি! করুণা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল: কিন্তু তার আগে যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে হ'বে! বুড়োকে অনেকক্ষণ বসিয়ে এসেছি…

—বুড়ো? বুড়ো আবার কে?

—লায়ন সাহেব। করুণা বলল: সম্পর্কে আমাদের আঙ্কল হন।

—ওঃ তিনি এসেছেন? রাঙাবৌ ব্যস্ত হয়ে বলল: তাঁর অনেক কথা সেজ ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি! তোমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন, না?

—হ্যাঁ! ওঁর মেয়েও নাকি আমারই মতো ছিল—

—শুনেছি। কিন্তু,—রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে রাঙাবৌ বলল: সাহেবকে আর কী দেওয়া যায় বলতো? রুটি-মাখম্ আর ডিম ভাজা?

—আপনারা পান খান না বৌদি?

—পান? কে খাবে?

—আর বলেন কেন! করুণা হেসে ফেলে বলল: একদিন সখ করে খেতে দিয়েছিলাম; তারপর থেকে চেয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলে। এখন তো রীতিমত নেশা লেগে গেছে আঙ্কল-এর।

—অবাক কাণ্ড! সাহেব মানুষ পান খায়! রাঙাবৌও হেসে উঠল। তারপর পাচিকাকে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ দিয়ে, গেল কলঘরে।

করুণাও আবার ফিরে চলল লাইব্রেরীর দিকে; কিন্তু ঘরে ঢুকতে ভরসা করল না—সত্যব্রতর ভয়ে।—অসভ্যটা তখন যে কাণ্ড ক'রে বসল···মাগো···

কথাটা মনে পড়তেই করুণার গাল দুটো আবার লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু, সত্যব্রতর ওপর রাগ করার চাইতেও বড় সমস্যা, আঙ্কল! বুড়ো কী ভাবলে তা কে জানে!···যদি সত্যিই কিছু বুঝে থাকে, তাহলে··· তাহলে আঙ্কল-এর কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে!

আঙ্কল-এর ওই এক দোষ, কাছে পেলে করুণাকে আর ছাড়তে চান না। সম্ভবতঃ নিজের মরা-মেয়ের কথা স্মরণ ক'রে একটু বেশীই ভালবাসেন তাকে। কিন্তু এই স্নেহাতিশয্যের ভয়ে, আজ যে কাণ্ড হ'য়ে গেল···সতুদার মনের খবরটা আর লুকোন রইল না আঙ্কল-এর কাছে! তারপর—খেয়ালী বৃদ্ধ কী যে রূপ ধরবেন তাই বা কে জানে! করুণাপ্রবণ লোকগুলোর তো অসাধ্য কিছুই নেই! প্রমাণ, আজকের সকালেরই ঘটনা—

বৃদ্ধ থাকেন নিকটেই, বালী-ওতোরপাড়ার মাঝামাঝি একটা ছোট বাগানবাড়ীতে। জন দুয়েক মাত্র খিদ্‌মদ্‌গার নিয়ে, একলা নির্জ্জন-বাস করেন তিনি। কিন্তু প্রতিদিন, একবার ক'রে দেখতে আসা চাই করুণাকে! আজও এসেছিলেন তিনি মোটরে মর্নিং ওয়াক করতে

করতে এবং এসেই শুনলেন : ব্যবসা সংক্রান্ত একটা গুরুতর কাজে, হৃদয় গোপাল খুব ভোরে উঠেই চলে গেছেন ধাপায় !

—ধাপায় ? সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধরও যেন টনক নড়ল। বললেন : আমিও ভাবছি একবার ঢাকায় যাব। তোরাও চল না আমার সঙ্গে !

—ঢাকায় ? বিকাশ আঁৎকে উঠে বলল : সেখানে কেন ?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন : হুঁ হুঁ বাবা, এতদিন পরে একজন খাঁটি লোকের সন্ধান পেয়েছি। ভদ্রলোক মুসলমান বটে কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান রাখেন। আমি তো ভাবছি, তাঁর কাছ থেকে দু-একটা টাকা চাইব।

—দু' একটা টাকা চাইবে ? বলো কী ?

—বলাবলির কিছু নেই বৎস ! বৃদ্ধ এক গাল হেসে বললেন : সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর নামাঙ্কিত সোনার টাকা ! তার একদিকে বীণাবাদনরত সম্রাটের চেহারা ; অপর দিকে....বোধ হয়....অশ্বমেধ ! হুঁ হুঁ সে টাকা আমার চাই-ই, যা দাম লাগে....

—বোঝার ওপর আবার শাকের আঁটি চাপল ! এবার করণা বলল : তোমার বিক্রমাদিত্যই তো বেশ ছিল ; আবার সমুদ্রকে নিয়ে টানাটানি কেন ?

—আরে পাগলী, সমুদ্রগুপ্তও যে একজন বিক্রমাদিত্য।

—আলবৎ না ! বিকাশ প্রতিবাদ করে বলল : আসল বিক্রমাদিত্যের সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। তাঁর নাম অগ্নি মিত্তির...

—What ?

আরম্ভ হলো যুক্তি-তর্ক। বেচারা বিকাশ সত্যব্রতর মুখের ঝাল

খেয়ে পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়েছিল ; তর্কে কাবু হয়ে, সব দোষ চাপিয়ে দিল সত্যব্রতর ঘাড়ে।

—Alright, এক্ষুনি চলো তার কাছে ! রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। করুণাকেও হুকুম করলেন : চল—তোদের বিপ্লবীর বিত্তের দৌড় দেখে আসি।

বৃদ্ধের পাল্লায় পড়ে যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়ার অভ্যাস করুণার ছিল ; কিন্তু আজ সসঙ্কোচে বিকাশের দিকে তাকাল।

বিকাশও মুস্কিলে পড়ল : সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকলেও, করুণার মেলামেশার গণ্ডী সম্বন্ধে মাতুলের ইচ্ছা-অনিচ্ছাটা তার অজানা ছিল না—বিশেষতঃ সত্যব্রত সম্বন্ধে। সেদিন তাকে খাতির করতে গিয়ে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন। তাছাড়া, তার বাপের প্রত্যাখ্যানের অপমানটা আজও ভুলতে পারেন নি তিনি। তাই একটু ইতস্ততঃ ক'রে সে বলল : করুণাকে আবার কেন ! চল না আমরা দু'জনে যাই—

—না না করুণাকে না হলে কখনও চলে ? ওঠ—

—কী দরকার ওকে নিয়ে টানাটানি করবার ? চল না আমরা দু'জনে যাই—

—But why ?—এদের তরফ থেকে এ ধরণের আপত্তি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কখনও ওঠেনি ; তাই বৃদ্ধ সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন : করুণার অসুবিধার কারণটা কি ?

অগত্যা বেফাঁস কিছু বেরিয়ে পড়ার ভয়ে করুণাই তাড়াতাড়ি বলল : অসুবিধে আবার কী—চল না যাচ্ছি—

বৃদ্ধের গাড়ীতেই সকলে রওনা হ'লো।

সত্যব্রত তখন লাইব্রেরীতেই ছিল, সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা ক'রে লায়নকে গ্রহণ করল।

বৃদ্ধ কিন্তু লৌকিকতার ধার দিয়েও গেলেন না; একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলেন: বিকাশের মুখে শুনলাম তোমার রিসার্চ্চের কথা; তাই নিজের ভুল সংশোধন করতে এলাম।

—রিসার্চ্চ! সত্যব্রত যেন মরমে মরে গেল। বলল: আমার মতো নগণ্য লোক, এই সামান্য লাইব্রেরীর ওপর নির্ভর ক'রে রিসার্চ্চ করবে কী? বিকাশ আপনাকে ভুল কথা বলেছে।

—ওয়েল! বিকাশের দিকে চাইতে গিয়েই বৃদ্ধের নজর পড়ল সামনের প্রকাণ্ড আলমারীটার ওপর। ফলে, একটু যেন সচেতন হ'লেন তিনি। এতক্ষণ তাঁর নজর ছিল সত্যব্রতর মুখের ওপর; এইবার তার লাইব্রেরীটার দিকেও একটু নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন।

—আপনি এদের এত আপনার লোক হয়ে—সত্যব্রত আবার বলল: বিকাশের ধাপ্পায় ভুললেন?

বৃদ্ধ ইতিমধ্যে উঠে পড়েছিলেন। সত্যব্রতর কথায় খেয়াল না করে তিনি গুটিগুটি সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরে এলেন। তারপর বললেন: আশ্চর্য্য! এই নিরেট পাড়াগাঁয়ে এত বড় একটা লাইব্রেরী রয়েছে, অথচ, তোমার যথার্থ পরিচয় কেউ জানেনা। তোমার সম্বন্ধে যে সব কথা শুনেছি এদের কাছে, তাতে তো আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি একজন বিপ্লবী মাত্র…

—অমন কথা বলবেন না! কল্পণার দিকে তাকিয়ে সত্যব্রত

লায়নের উদ্দেশ্যে বলল : আপনার সঙ্গীরা আপনার মস্তিষ্কের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হবে—

বৃদ্ধ রসিকতাটা শুনতে পেলেন কিনা সন্দেহ ! গম্ভীর ভাবে আসন গ্রহণ করে বললেন : ওয়েল, রিসার্চ্চ না হলেও হাইপথেসীস তো বটে। বলো, অগ্নি মিত্রের ওপর তুমি অত ভরসা করছো কেন ? কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র লিখেছিলেন বলে ?—এই, তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

করুণা এতক্ষণ জড়সড় হয়ে বসেছিল ; এইবার উঠে অন্দরে যাবার উপক্রম করতেই বৃদ্ধ বাধা দিলেন। বললেন : স্থির হ'য়ে বসো, Important কথা হচ্ছে। ওয়েল মিষ্টার রায়, এইবার বলো তোমার সন্দেহের কথা !

সত্যব্রত বিপদে পড়ল। নিছক রহস্য করে সে সেদিন বিকাশকে যা বলেছিল, তার পরিণাম যে এত গুরু গম্ভীর হ'য়ে দেখা দিতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি। করলে, হয়তো একটু প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারত। তবুও আরম্ভ করল : অবশ্য, পড়াশোনা আমার অল্প ! হয়তো আমি ভ্রান্ত ! কিন্তু, আমার সন্দেহ উদ্রেক করেছে রঘু—

—রঘুবংশ ? বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বললেন : ঐতিহাসিক অগ্নি মিত্রকে প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করবার জন্যে, প্রাগৈতিহাসিক রঘুকে টেনে আনতে চাও ? আশ্চর্য্য—

—আশ্চর্য্যই বটে ! সত্যব্রত হাসিমুখেই বলল : রঘুবংশ লিখতে বসে কালিদাস হঠাৎ Law of Escheatment এর স্বপক্ষে অত উদার হয়ে পড়লেন কেন, ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে বৈকি।

—Law of Escheatment ! সে আবার কী ? বৃদ্ধ এবার

যেন একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন : ব্যাপারটা একটু ফ্যালাও করে বোঝাও মিষ্টার রায়।

—আমাকে লজ্জা দেবেন না? সত্যব্রত কুণ্ঠিত ভাবে বলল : সত্য কী আমি জানিনা; তবে গোটা কতক Point আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। আপনিও বিচার বিবেচনা করে দেখুন, আমি ভ্রান্ত কিনা। Points গুলো হচ্ছে :

সত্যব্রত খাতার ওপর কলম বুলোতে আরম্ভ করল : কৌটিল্য ছিলেন খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তিনি Law of Escheatment-এর কথা বলে গেছেন। সে আইন সুঙ্গ বংশের শেষ আমল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের মৃত্যু হয়েছিল ২৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে। অশোকের পরে আরও দশজন মৌর্য্য রাজা দেশ শাসন করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে শেষ রাজা হচ্ছেন বৃহদ্রথ! এই বৃহদ্রথকে খুন করেই তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র 1st century B. C. তে সুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্রের ছেলে অগ্নিমিত্র। কিন্তু হুনারী চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছেন চতুর্থ খৃষ্টাব্দের লোক। এঁর আমলে কৌটিল্য অপ্রচলিত হয়ে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক প্রচলিত হয়েছিল। যাজ্ঞবল্কে মিতাক্ষরার দেখা মিলছে, কিন্তু Law of Escheatment এর ইঙ্গিত মাত্রও নেই। সুতরাং আমার ধারণা কালিদাস এমন এক সময় বর্ত্তমান ছিলেন, যখন ভারতবর্ষে Law of Escheatment এর মর্য্যাদা ছিল। অবশ্য, এক্ষেত্রে শুনে লেখার প্রশ্নও উঠতে পারে। যেমন, বিশাখ দত্ত সপ্তম শতাব্দীর লোক হ'য়েও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু—

—কিন্তু, Law of Escheatmentটা কী?

—যে আইনের বলে প্রজার সব কিছু রাজার হ'য়ে যায়।

—ওহো, মুসলমান বাদশাদের সময় যে আইন প্রচলিত ছিল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল: আপনিই বলুন না যে সময়ে মিতাক্ষরা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল সেই আমলের কারুর পক্ষে কি Escheatment এর মত আইনের গুণ গাওয়া সম্ভবপর? আজকের আমরা কি শাহী আইনের সুখ্যাতি করতে পারি?

—তা বটে! এই অপ...

করুণা উঠে দাঁড়িয়েছিল অন্দরে যাবার জন্যে; কিন্তু বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গেই ধমক দিলেন: অমন উস্‌খুস করছিস্ কেন? এমন Interesting Subject ভাল লাগছে না? শোন চুপ করে।

বৃদ্ধ আবার আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন; কিন্তু করুণা মুস্কিলে পড়ল! অন্য সময় হলে সেও বৃদ্ধকে ধমক দিত; কিন্তু আপাততঃ সত্যব্রতর উপস্থিতির জন্য সঙ্কোচ বোধ করছিল। অবশ্য, আলোচনাটা যে তার খুব বিরক্তিকর লাগছিল তা নয়। বরং সত্যব্রতর পণ্ডিত্য দেখে, কেমন যেন একটা গর্ব্ববোধ করছিল সে মনে মনে। কিন্তু, এ রকম আড়ষ্ট-ভাবে কাঁহাতক বসে থাকা যায়।—নিরুপায় হয়ে সে বসে পড়ছিল বটে, কিন্তু অস্বস্তিটাকেও গোপন করতে পারছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে একবার চেয়ে ফেলল সত্যব্রতর দিকে।

সত্যব্রতও পূর্ব্বে থেকেই তাকিয়েছিল। দুজনের চোখা চোখি হতেই সে হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। বৃদ্ধর উদ্দেশ্যে বলল: আপনি অকারণ কষ্ট দিচ্ছেন ভদ্র মহিলাকে। ছেড়ে দিন না ওঁকে—

আলোচনায় মধ্যে অবান্তর কথা এসে পড়ায় বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন। করুণাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তাই নাকি? তোমার এখানে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু কেন?

করুণার অস্বস্তিটা এবার বিরক্তিতে পরিণত হলো। সে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চাইল।

—ওঁকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। সত্যব্রত আবার বলল: একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে এ ভাবে বসে থাকাটা বাঙ্গালী মেয়েদের পক্ষে সত্যিই বড় অস্বস্তিকর।

—অপরিচিত! বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বললেন: কিন্তু, আমি যে শুনেছিলাম তোমাদের ঘনিষ্ঠতা দু'পুরুষের।

—ঠিকই শুনেছিলেন! সত্যব্রত হাসিমুখেই বলল: কিন্তু জানেন তো, আপন যখন পর হয়ে যায়, তখন বড্ড বেশী পর হয়ে যায়! কথাবার্ত্তা তো দূরের কথা—তখন তার উপস্থিতিটা পর্য্যন্ত অসহ্য মনে হয়!

—তাই নাকি! বৃদ্ধ এবার বিচলিত হলেন! করুণার দিকে তাকিয়ে বললেন: তাই বুঝি তখন তুমি গররাজি হচ্ছিলে এখানে আসতে? আশ্চর্য্য—

করুণার অবস্থা তখন কল্পনাতীত। ছুটে পালাতে গেলে আরও লজ্জায় পড়তে হবে; অথচ এ পাগলামী বন্ধ না করলেই নয়। কিন্তু কী করবে সে? ঘরে ঢুকে পর্য্যন্ত বিকাশ সেই যে শিব-চক্ষু হয়ে কড়িকাঠ গুণ্‌তে আরম্ভ করেছিল, সে চোখ আর নামল না; অগত্যা …আবার সে সত্যব্রতর দিকেই চেয়ে ফেলল।

চোখে চোখ পড়তে সত্যব্রত যেন আরও নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল। বলে

চলল : ব্যাপারটা আদৌ আশ্চর্য্যের নয় মিষ্টার লায়ন! আমাদের দেশটা তো শুধু বর পণের দেশই নয়, বিলেত-মুগ্ধর দেশও বটে!—তাই কোন ক্রোড়পতির কন্যার পক্ষে, শুধু এমন লোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করা বাঞ্ছনীয়, যে বিলেত ফেরৎ—যে ব্যারিষ্টার হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করবে। বুঝেছেন, আমাদের মতো নেটিভ্ নিম্ন-মধ্যবিত্তর সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় থাকাটাও করুণার-পক্ষে অপরাধ।

—তুমি থামবে কি? অসহ্য ক্রোধে করুণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল; তবুও সে গর্জ্জন করে উঠল : অসভ্য বদ্‌মাইস্ কোথাকার, বুড়ো মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কী করতে লজ্জা করে না···

—দেখলেন তো মিষ্টার লায়ন!—সত্যব্রত বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল : আমার কথা সত্যি কি না!

এর পর করুণার পক্ষে ছুটে পালান ছাড়া আর উপায় কী। কিন্তু পালিয়েও নিস্তার পেলনা সে। একটু দম নেবার জন্যে সে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছিল; হঠাৎ দেখল সত্যব্রত বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

করুণা তাড়াতাড়ি দোতলায় পালাতে গেল; কিন্তু তার পূর্ব্বেই সত্যব্রত তেড়ে এসে পথ আট্‌কাল। বলল : ওরে, তোর আব্বুল যে চা চাইছেন।····ওদিকে রাঙাবৌ ঘুমোচ্ছে—একটু ব্যবস্থা করতে পারবি বামূণীকে দিয়ে?

—পথ ছেড়ে দাও বলছি, অসভ্য বদমাইস্ কোথাকার—

—আস্তে! সত্যব্রত চাপা গলায় বলল : ও সব পরে করিস্, আগে ভাল করে অতিথি বিদায় কর···

—পারবো না আমি, পথ ছাড়ো···

—আবার রাগারাগি করে!—করুণার কাঁধে একটা হাত রেখে সত্যব্রত বলল: লক্ষ্মীটি, যা বললুম তাই কর...আমি ওদিক্ সামলাই গে, বুঝলি!

যথাকর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে সত্যব্রত আবার গিয়ে লাইব্রেরীতে ঢুকল। কিন্তু—তারপর থেকে প্রায় একঘণ্টা ধরে মাথা ঘামিয়েও করুণা ভেবে পেল না: এই ধরণের লোকগুলোকে কেমন ক'রে জব্দ করা যেতে পারে।

—লুকিয়ে লুকিয়ে কী দেখা হ'চ্ছে, শুনি!—করুণা চম্‌কে উঠে ফিরে দেখল—রাঙাবৌ! চায়ের সরঞ্জাম সমেত প্রকাণ্ড ট্রে দু'হাতে ধরে সে যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, করুণা একেবারেই বুঝতে পারে নি। আরক্তমুখে বলল: লুকিয়ে আবার দেখলাম কখন!

—ওঃ দেখছিলে না.—বাঁশী শুনছিলে?

—নাঃ আপনারা বড্ড অসভ্য হ'য়ে উঠ্‌ছেন বৌদি!

—ওঃ বাবা, শুধু অনুরাগ নয়, সঙ্গে রাগও আছে দেখছি! আচ্ছা এবার এগুলো দিয়ে এসো দেখি....

করুণা এবার মুস্কিলে পড়ল। বলল: আপনার ঝি পারবে না?

—ও বাবা, সাহেব দেখলে সে ভিরমী যাবে!

—তবে যার গরজ তাকে ডেকে পাঠান!—করুণা বিরক্ত হ'য়ে আবার বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠে দাঁড়াতে হলো; সুব্রত নামছিল ওপর থেকে।

—গুড্ মরনিং মিস্ মজুমদার! সুব্রত বলল: আপনি হঠাৎ এ গরীবখানায়? ও সব কী?

করুণা মুখে হাসি এনে প্রত্যাভিবাদন করল, কিন্তু রাঙাবৌয়ের মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল—সুব্রতর সাহেবী পোষাক দেখে!

—ব্যাপার কী! সুব্রত এবার রাঙাবৌকেই জিজ্ঞাসা করল: এ রকম লক্ষণের ফল ধরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কার ব্রেক্‌ফাষ্ট এ?

রাঙাবৌকে নীরব দেখে করুণাই জবাব দিল: লায়ন আঙ্কল-এর!

—তিনি এসেছেন নাকি? এতক্ষণ বলেন নি কেন? সুব্রত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল; তারপর রাঙাবৌয়ের হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে বলল: এরা সব গেঁয়ো লোক—এটা কিন্তু আপনাকেই সার্ভ করতে হ'বে। আসুন—

অগত্যা, মুখ কাঁচুমাচু ক'রে করুণা সঙ্গেই চলল। সুব্রতও আল্‌গোছে, আর একটা কর্ত্তব্য শেষ ক'রে নিল। রাঙাবৌকে শুনিয়ে বলে গেল: আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে,—গ্রেট্ ইষ্টার্ণে খেয়ে নোব'খন। বুঝলে?

শুনে রাঙাবৌয়ের ভারি মুখ আরও ভারি হ'য়ে উঠল।

লাইব্রেরীতে, ইতিমধ্যে, বিক্রমাদিত্য চাপা পড়ে গিয়ে সত্যব্রতর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। তার বন্দী জীবনের শেষ অধ্যায় বলছিল সে।—লায়ন সাহেব, করুণার সঙ্গে সব্রতকে ঢুকতে দেখে একবার মাথা নাড়লেন; তারপর সত্যব্রতর উদ্দেশে বললেন: হরিবল, তারপর?

সুব্রত যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল: বৃদ্ধ যে সত্যব্রতের

সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এটা সে একেবারেই আশা করে নি! তাই ভদ্রতা রক্ষার জন্য মিনিট পাঁচেক গল্প শুনে সে উঠে পড়ল। বলে গেল: দাসত্বের খাতিরে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হচ্ছে! দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

—কিছু না, কিছু না। কিন্তু তোমার ভদ্রতা-জ্ঞান আমাকে উৎকণ্ঠিত করে তুলছে।—বৃদ্ধ শেষ মন্তব্যটা করলেন করুণার উদ্দেশ্যে। বললেন: রায়কে যে চা দিলে না? ভেবেছো কি তুমি?

করুণা ইতিমধ্যে পরিবেশন শেষ ক'রে বিকাশের পাশে বসে পড়েছিল; ভুরু কুঁচকে আস্তে আস্তে বলল: ও চা খায় না।

—তাই নাকি? বৃদ্ধ এ নিয়ে আর মাথা ঘামানো দরকার মনে করলেন না। বললেন: কী সাংঘাতিক! তারপর?

—তারপর—সত্যব্রত তার কাহিনী শেষ ক'রে বলল: Same-side goleই বটে!

বৃদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারের ওপর হেলে পড়লেন। বললেন: but how sad!

—নিঃসন্দেহ! মন্তব্য করল বিকাশ!

শুনে, ঘরের সকলেই তার দিকে তাকাল। এতক্ষণের এত কিছু আলোচনার মধ্যে বিকাশ এমনই উৎকট নীরবতা অবলম্বন করেছিল যে, তার অস্তিত্বটা হঠাৎ যেন সকলকে সচকিত করে তুলল। বৃদ্ধ সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: কী নিঃসন্দেহ?

বিকাশ উত্তর দিল করুণার দিকে তাকিয়ে। গম্ভীর ভাবে বলল: দুঃখের ব্যাপারটা…

এবার করুণাও চমকে উঠল, নিজের অন্যমনস্কতার জন্য। —তখন অত কাণ্ড হ'য়ে গেল এখানে না বসার জন্তে; অথচ, এখন কারুর দ্বারা অনুরুদ্ধ না হয়েও বসে পড়েছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল আরক্ত মুখে।

—আবার কোথায় চললি?—বিকাশ বিরক্ত হয়ে বলল: বাড়ী-টাড়ী যেতে হবে না?

—ইস! বৃদ্ধও ঘড়ি দেখে বললেন: মর্ণিং যে আফ্‌টারনুন হ'তে চলল রে! চল্ চল্—

—একটু দাঁড়াও রাঙাবৌদিকে বলে আসি। বলে, করুণা আবার ভেতরে গেল।

রাঙাবৌ তখন রান্নাঘরে ছিল। করুণাকে দেখে বলল: বেশ, এতক্ষণে সময় হ'লো?

করুণা লজ্জিতভাবে একটু হেসে বলল: Same side goal এর গল্প শুনতে গিয়ে দেরী হ'য়ে গেল···

—সে আবার কী?

—সতুদার পা ভাঙ্গার গল্প।

—ও তো পুরোণ গল্প! তুমি শোন নি আগে?

—কী ক'রে শুনবো? আমাকে আর কে শোনাবে বলুন?

—যাক্‌গে! রাঙাবৌ কাজের কথা পাড়ল। বলল: সেজ ঠাকুরপোর আক্কেলটা দেখলে তো? পালাল।

—পালাল? কেন?

—ভয়ে

—কিসের ভয় ?

—বিয়ের ভয়ে !—রাঙাবৌ নিজের মৎলবের কথাটা খুলেই বলল করুণাকে।

শুনে, করুণা একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল ! সুব্রতর মতো ছেলের সঙ্গে সুকৃতির মতো মেয়ের বিয়ে ! রাঙাবৌ কি ক্ষেপে গেছে।

—তবু তো আসল কথাটা এখনও তাকে বলিনি।—রাঙাবৌ বলল : শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার বিয়ে না করবার কারণটা কী ! তাইতেই এই !—কিন্তু সত্যিই যদি ও রাজী না হয়, তাহলে উপায় ?

—উপায় কিছু একটা বার করতে হ'বে !—করুণা বলল : কিন্তু, আজ চলি ভাই বৌদি, বড্ড বেলা হ'য়ে গেল। বরং আর একদিন এসে দু'জনে পরামর্শ করবো'খন —কেমন ?

—আর তুমি এসেছো—

—সত্যি বলছি আসবো ! কিন্তু আপনিও তো আমাদের সে ব্যাপারটার কিছু করলেন না ?

—কী ব্যাপার ?

—জলসার ! সেদিন অত ক'রে বলে গেলাম—

—ওঃ সে এক মুস্কিল হ'য়েছে ভাই ! জহরবাবু আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন হ'তে চলল, আসছেন না ! কী যে হ'লো ভদ্র-লোকের, বুঝতে পারছি না।

—একটা চিঠি লিখলেই তো হয় !

কথাটা ইতিপূর্ব্বে রাঙাবৌও ভেবেছিল ; কিন্তু···লজ্জায় পারে নি।

বলল: কেমন যেন ইয়ে লাগে! কখনও তো তাঁকে চিঠি লিখি নি!

ইয়ের উল্লেখে করুণার মেজাজও আবার রসস্থ হ'য়ে উঠল; কিন্তু বেলার দিকে তাকিয়ে আর সময় নষ্ট করতে ভরসা করল না; প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে বলল: ছাত্রী মাষ্টারকে চিঠি লিখবে, তার মধ্যে আবার ইয়ে কিসের! তাঁর ঠিকানা জানেন তো?

—জানি। আমার গৎ-য়ের খাতায় লেখা আছে!

—তা হ'লে আজই চিঠি লিখে দিন তাঁকে! সত্যি, তাঁকে বড্ড দরকার আমাদের—

—তা না হয় লিখবো; কিন্তু তুমি কবে আসছো শুনি?

করুণা একটু ভেবে বলল: দিন পাঁচেক্ পরে আসবো।

রাঙাবৌ কথা রাখল। খেয়ে উঠেই চিঠি লিখতে বসল জহরকে। কিন্তু প্রথমেই মুস্কিল বাধল সম্বোধন নিয়ে। এদিকে মাষ্টার মশাই হ'লে কী হ'বে, বয়সে সে নিশ্চয়ই ছাত্রীর চাইতে বড় নয়! বোধ হয় কেন—নিশ্চয়—সুতরাং, তাকে কি শ্রীচরণেষু বলে সম্বোধন করা যায়।

কাগজ ছিঁড়ে ফেলে রাঙাবৌ শ্রীচরণেষুর পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধাস্পদেষু লিখল। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সুমুখে ভেসে উঠল জহরের মুখখানা! · তার টানাটানা চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি!

দূর! যে লোক অমন হাঁ করে চেয়ে থাকে সে শ্রদ্ধাস্পদেষু না ছাতা।—আবার কাগজ ছিঁড়ে ফেলে রাঙাবৌ ভাবতে বসল:

শুধু মাষ্টার মশাই বলে সম্বোধন করলে কেমন হয়? কিন্তু…যে রকম অভিমানী ছেলে, যদি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে তার ডাকে সাড়া না দেয়! তাছাড়া, সত্যিই বোধ হয় সে অভিমান করেই আসা বন্ধ করেছে! অবশ্য, সঠিক প্রমাণ সে কিছু পায় নি! কিন্তু সত্যব্রতকে তো সে চেনে! বয়স যাই হোক না কেন, মনোবৃত্তিতে সে একেবারে দেড়শো বছরের বুড়ো।—নিশ্চয়ই সে কিছু বলেছে জহরকে! ঘরের লোকের ওপর রাগ ফলাতে না পেরে, নিশ্চয়ই ঝাল ঝেড়েছে সেই গোবেচারীর ওপরে!

বেচারী সাধক প্রকৃতির আত্মভোলা লোক! কিছু জানে না, কিছু বোঝে না এই কুটীল সংসারের! তাই, সত্যব্রতর আকস্মিক আক্রমণে সে হয়তো স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল? প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে কেঁপে উঠেছিল শুধু তার ছোট্ট পাতলা ঠোঁট্ দুটি। উদাস করা স্বপ্নময় চোখদুটোতে ফুটে উঠেছিল—অপমান নয়—বিচ্ছেদের ব্যথা! তারপর, কোন অপরাধে অপরাধী না হয়েও চলে গিয়েছিল সে নীরবে!

ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে তিনটের ঘণ্টা বাজল। শুনে রাঙাবৌ ভাবনা রেখে লেখায় মনোযোগ দিল। আজকের ডাকে চিঠি তাকে পাঠাতেই হবে—

উত্তেজনা বশে অনেক কথাই লিখে ফেলল সে, তারপর নিশ্চিন্ত হ'লো, দাসীকে দিয়ে চিঠি ডাকস্থ করিয়ে।

ঘোল

বাড়ী ফিরে করুণা দেখল, অফিস ঘরে বসে আছেন স্বয়ং হৃদয়-গোপাল,—মুখের অবস্থা জলদ-গম্ভীর।

মাতুলের মেজাজ বুঝে বিকাশ গা-ঢাকা দিল; কিন্তু, করুণা এগিয়ে এল। বলল: তোমার তো ফেরবার কথা ছিল ওবেলায়; এরই মধ্যে ফিরলে যে?

—হুম্!—হৃদয়গোপালের হাতে ছিল একখানা বিলিতি টিকিট্ আঁটা খোলা চিঠি; সেখানা নাড়তে নাড়তে তিনি একবার করুণার আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন। তারপর বললেন: এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?

প্রশ্নের ভঙ্গিটা ভয় পাবার মতো হলেও করুণা ভড়্কাল না। কাজ-কর্ম্মে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরতে হ'লে পিতার মেজাজ প্রায়ই এমনি খারাপ হ'য়ে যায়। কিন্তু তার ফলে, বাড়ীর আর সকলে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লেও, করুণার গায়ে কখনও আঁচ্ লাগে না; চিরকালের আদুরে মেয়ে সে। তাই সে স্মিতমুখেই বলল: আর বলো কেন, আঙ্কল-এর খেয়াল।

—কোথায় সে?

—আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

—কিন্তু, গিয়েছিলে কোথায়?

—গড়বাড়ীতে।

—কেন? সেখানে কেন?

—জানি না।—বলে, করুণা মুখ কালো করে অন্দরে যাবার উপক্রম করল।

—দাঁড়াও।—হৃদয়গোপাল হঠাৎ গর্জ্জে উঠলেন: যাচ্ছো কোথায়? আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

করুণা থমকে গেল।—আজ পর্য্যন্ত সে অনেক রকম রূপ দেখেছে পিতার; কিন্তু আজকের ব্যবহার—বিশেষতঃ তার সম্বন্ধে—একেবারে যেন কল্পনাতীত।

—ইতিমধ্যে কতবার গিয়েছো গড়বাড়ীতে?—দাঁতে দাঁত চেপে হৃদয়গোপাল আবার বললেন: সতুর সঙ্গে রোজ তোমার কতবার ক'রে দেখা হয়?

এসব কী কথা!—এতক্ষণে করুণার চোখে জল দেখা দিল।

—তোমাদের মিড্‌ল্‌ম্যান্ হ'য়েছেন কে?—হৃদয়গোপাল যেন আরও নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠলেন। বললেন: লায়ন সাহেব? চুপ করে থাকলে হ'বে না। আমি জানতে চাই, ঘনিষ্ঠতাটা কতদূর গড়িয়েছে?

কী জবাব দেবে করুণা!—শুধু, কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝ'রে পড়ল মেঝের ওপর।

চোখের জলটা হৃদয়গোপালও দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটু সচেতন হ'লেন তিনি: মা-মরা মেয়ে…কষ্ট পাচ্ছে দেখলে, কষ্ট হয় বৈকি! অথচ, এদিকে এমনি গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে আছে যে তাঁর মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবার উপক্রম করেছে।—একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন: আচ্ছা তুমি এখন যাও।

করুণা কিন্তু নড়ল না। পূর্ব্বের মতোই মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা, তিনিই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইং-রুমে ঢুকলেন হৃদয়গোপাল; তারপর মন দিলেন কাজে। কাজ মানে চিন্তা। দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না তাঁর। প্রতিভাধর ব্যবসায়ী হিসাবে এতাবৎকাল তিনি অনেক কিছু ব্যাপারের অনেক রকম জট্ খুলেছেন। কিন্তু, আজ যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল: চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছে! তাঁর অতি-মানবিক প্রতিভা যেন ক্রমাগতই রূপান্তরিত হচ্ছে, অতি-সাধারণ বোকামিতে—কোন রহস্যময়ী ভাগ্যদেবীর বিদ্রূপ কটাক্ষে! না হলে, এমন অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে! লোক চিন্‌তে ভুল করেন তিনি! প্রমান—আজকেকার বিফলতা! দশ লক্ষ টাকার নির্ঘাৎ কন্‌ট্রাক্ট, ফসকে গেল! কে জানতো, অতবড় একটা লোক, নিজের মান-সম্মান, বয়সের কথা ভুলে গিয়ে, সামান্য একটা সিনেমা এ্যাক্‌ট্রেস্ পেয়ে কথার খেলাপ করবে!—হৃদয়গোপালের পরিবর্ত্তে কনট্রাক্ট পাইয়ে দেবে একটা (সত্যার্থে) মেয়েমানুষের দালালকে! তারপর—

করুণার ব্যাপারটাই ধরা যাক্। সত্যিকারের ভাল মেয়ে সে। কিন্তু, তার বরাতে একি অভিশাপ। নিজের প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রথমে তিনি স্থির করেছিলেন, বড়বংশে কন্যা-দান করবেন। কিন্তু প্রস্তাব শুনেই, সত্যব্রতর বাবা তাঁকে অপমান ক'রে বিদায় দিলেন। (ভগবান বোধহয় ভালই করেছিলেন; নাহলে ওই অপদার্থ-টার হাতে পড়লে মেয়েটার এতদিনে হাড়ির হাল্ হ'ত!) তারপর রাজকুমারবাবুর সৌজন্যে খোঁজ পেলেন দীপক চৌধুরীর! রূপে, গুণে,

ধনে, মানে, কোলকাতার তথা বাঙলা দেশের এক অতিখ্যাত বংশের ছেলে সে! ঘটক রাজকুমারবাবুর মধ্যস্থতায় ব্যবস্থা হয়েছিল, বিবাহের বিনিময়ে দীপকের ব্যারিষ্টারী পড়ার সব খরচ বহন করবেন তিনি। দীপকও বিবাহ ক'রে বিলেত যেতে রাজি ছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্মত হ'তে পারেন নি! বাধা দিয়েছিল তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি! বিলেত ফেরৎ অনেক শ্রীমানকেই জানেন তিনি। সুতরাং দীপকও যে বিলেত গিয়ে বাঁদর হ'বে না, তা'র নিশ্চয়তা কী! তার চাইতে বরং বছর তিনেক অপেক্ষা করার Risk নেওয়া ঢের ভাল। বলা বাহুল্য, speculation করেছিলেন তিনি! অজস্র টাকা খরচ ক'রে তিনি অনেক কিছুই স্বপ্ন দেখেছিলেন; কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত তার ফল হ'লো এই? কূলে এসে তরী ডুবল! ডোবাল তাঁরই সেই করুণা! —কিন্তু, speculation মানে কি একেবারে ঘোড়ার মাঠ? Consumers Surplus কথাটার কি কোন তাৎপর্য্য নেই?—তাঁর মতো লোককে বোকা বানানো কি এতই সোজা?—হুঙ্কার ছাড়লেন: বিকাশ—

বিকাশ এলো! তিনি গম্ভীরভাবে একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন: হাতের লেখাটা কার বলে মনে হয় তোমার?

চিঠিখানা পড়ল বিকাশ: শীকারপুর নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক, বিলেতের দীপক চৌধুরীকে খবর দিচ্ছে,—তার বাগ্‌দত্তাটি ইদানিং তার ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ী সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্টতা করছে। ইত্যাদি ইত্যাদি…

চিঠি পড়ে বিকাশ মুখ তুলল! হৃদয়গোপাল তখন আর একখানা

চিঠি দিলেন তাকে! চিঠি লিখছে স্বয়ং দীপক চৌধুরী, হবু-শ্বশুরকে। সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম হচ্ছেঃ আগামী সপ্তাহে আমি ভারবর্ষের জাহাজ ধরছি! কিন্তু, আপনার কন্যাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সঙ্গের চিঠিখানা উড়ো হলেও. ব্যাপার-টাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করতে আমি পারছি না, যেহেতু অন্য সূত্র ওকেথে আমি খবর নিয়েছি, আপনার কন্যা একদিন উক্ত সত্যব্রত রায়েরই বাগ্‌দত্তা ছিল এবং উভয়ের ঘনিষ্ঠতাও ছিল অত্যধিক। অপরপক্ষে, আমার যা শিক্ষা-দীক্ষা তাতে, কোন অন্যপূর্ব্বা রমণীকে জেনে শুনে, স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাটা আমি বর্ব্বরোচিত মনে করি। সুতরাং…

বিকাশকে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার সময় দিলেন হৃদয়গোপাল। তারপর বললেনঃ আজ তোমরা সতুর ওখানে গিয়েছিল কেন? এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথাটা কি তুমি জানতে না?

—জানতাম বলেই তো সঙ্গে গিয়েছিলাম কাজ ক্ষতি করে—বিকাশ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলঃ না হলে, আঙ্কল-কে অনেক কথাই খুলে বলতে হতো

—এই এক লায়ন জুটেছে আমার কপালে! হৃদয়গোপাল বললেনঃ নিজেদের মর্য্যাদার কথা ভুলে যেওনা। একবার ওই সত্যব্রতর জন্যে আমাকে শীকারপুর ছাড়তে হয়েছিল!—আবার দি…

—কিন্তু—বিকাশ হঠাৎ বলে ফেললঃ আর এখানে থাক্‌বার দরকার কী! এখন তালতলায় ফিরে গেলেই তো হয়—

—দরকার অ-দরকারের চিন্তাটা তোমার না করলেও চল্‌বে!—হৃদয়গোপাল ভ্রূকুটি ক'রে বললেন: এখন যা বলছি শোন! ওই সতু ছোঁড়াটাকে জানিয়ে দিও, আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না! বুঝলে,—তার এই আচমকা লায়ন-প্রীতির কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি! ও সব উড়ো চিঠি লিখে আর যা-ই করা যাক্, আমার মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না। বুঝলে,—অনেক টাকা ঢেলেছি দীপকের পেছনে! পৃথিবী উল্টে গেলেও—দীপক ছাড়া কারুর সঙ্গে বিয়ে হবে না করুণার। সে ছোঁড়াকে জানিয়ে দিও, আসছে অঘ্রাণের প্রথম লগ্নেই ওদের বিয়ে··

—আপনার কি ধারণা—বিকাশ বলল: এই উড়ো চিঠি সতুদা লিখেছে?

—তাছাড়া আর কে হ'তে পারে?

—কিন্তু, সকলে তো সব কাজ পারেনা! আমার সন্দেহ হ'চ্ছে, এ কাজ প্রশান্তর···

—প্রশান্তর! এতে তার স্বার্থ? কী motive থাকতে পারে বলো?

বিকাশ মুস্কিলে পড়ল; চট করে যুক্তি খুঁজে পেলনা।

—যাক্‌গে—হৃদয়গোপাল অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। বললেন: তোমাকে আরও একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে! লায়নকে জানিয়ে দিয়ে আসতে হ'বে, আমার পারিবারিক ব্যাপারে তার মাথা গলানোটা আমি একেবারেই পছন্দ করিনা! বুঝলে, কোন রকম মনোকষ্ট না দিয়ে, এই সত্যি কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়ে আসবে—আজই!

—আচ্ছা।

মাতুলের কাছ থেকে ফিরে বিকাশ স্নানাহার শেষ করল; তারপর নিজের ঘরে ঢুকল বিশ্রামের আশায়—অর্থাৎ ভাল করে ভাববার জন্যে!

মা ঘরে ঢুকলেন। বললেন: ওরে করুণা যে এদিকে বড় মুস্কিল বাধিয়েছে! বাড়ী ফিরে সেই যে শুয়েছে, কিছুতেই উঠ্‌ছে না!

—সেকি? কেন?

—কেন আবার, বাপের ওপর রাগ করে! মা বিরক্ত হয়ে বললেন: একি অনাছিষ্টি বাপু! এত বড় মেয়েকে কেউ অমন করে বলে?

—চল চল আমি দেখছি! করুণার ঘরে গিয়ে বিকাশ বলল: —এই ওঠ্, কী পাগলামী করছিস!

করুণা আরক্ত চোখে তাকাল। বলল: কেন বার বার বিরক্ত করছো! একটু শুয়ে থাকবার স্বাধীনতাও কি আমার নেই?

—লক্ষ্মী মা আমার! বিকাশের মা বললেন: পিত্তি পড়লে অসুখ করবে যে! বাপের কথায় কি রাগ করতে আছে! তোর ভালর জন্যেই তো তিনি—

—কিন্তু, আমি যে নিজে খারাপ। বাধা দিয়ে করুণা বলল: ভাল লোকের ভাল কথা বুঝবো কি করে!

বিকাশ আস্তে আস্তে বলল: তখন, লুকোচুরীটা না করলেই ঠিক্ হতো!

—কী লুকোচুরী তোমাদের সঙ্গে করেছি, শুনি? করুণার দু' চোখে জল ভরে এল। বলল: আমাকে বাইরে বেরুতে হয়

তোমাদেরই হুকুমে! কিন্তু, কখনও কোনদিন এক মিনিটের জন্যেও আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছো তোমরা! দিন রাত সি-আই-ডির মতো সঙ্গে থেকেছো, তবুও, আজ আমাকে এই কথা শুনতে হ'বে! আমার কোন চুলোয় কেউ নেই বলে, আমাকে এমনি করে অপমান করবে তোমরা?

—আমি কী বললুম আর তুই কি বুঝলি!—বিকাশ অপ্রস্তুত হয়ে বলল: আমি বলছিলুম, আঙ্কলকে তখুনি তোর সব খুলে বলা উচিত ছিল—

—লজ্জা করলনা তোমার কথাটা বলতে?—করুণা রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: তুমি যা পারলে না, আমি মেয়ে হ'য়ে তাই পারবো?

নির্জ্জলা সত্যি কথা! মায়ের জিম্মায় করুণাকে রেখে, বিকাশ তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে মুখ লুকোল! কিন্তু—

লুকিয়েই বা সে থাকবে কতক্ষণ! দুর্ম্মুখের চাক্‌রী তার। চাক্‌রী বজায় রাখবার জন্যে আজই তাকে জানিয়ে আসতে হবে আঙ্কলকে —মাতুলের হুকুম! না হলে, কালই হয়ত এসে হাজির হবে বৃদ্ধ!

শুনে, বৃদ্ধ কী করবে? কথা নিশ্চয়ই বলতে পারবে না, শুধু চেয়ে থাকবে তার দিকে! কিন্তু সে দৃষ্টি বিকাশ সহ্য করতে পারবে তো?

ভাবতে ভাবতে কূল-কিনারা পায়না সে! তখন, হঠাৎ অভিমান হয় আঙ্কল-এর ওপরেই: কেন এরা জন্মায় বিংশ শতাব্দীর এই ঘোলাটে যুগে! এ যুগে, এদের আন্তরিকতার মূল্য কেউ দেবেনা!

মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা বিশ্বাসই করবেনা কেউ! হৃদয়গোপালের দোষ কী!

বেচারা জন্মাবধিই কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্থ উচ্ছ্বাস-প্রবণ! সম্পত্তির মধ্যে ছিল লাখ্ পঞ্চাশ ডলার আর একমাত্র সন্তান য়্যান। জীবনের পঞ্চাশটা বছর দিব্বি হেসে খেলে খেয়াল-খুসী চরিতার্থ করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ। তারপর আত্মহত্যা করল য়্যান! প্রত্যক্ষ-ভাবে পিতার প্রতি অভিমানবশেই আত্মহত্যা করেছিল সে। সে ভাল-বেসেছিল একটি ইংরাজ যুবককে। কিন্তু খেয়ালী পিতার কঠোর নির্দ্দেশ ছিল: বিবাহের পূর্ব্বে প্রেম করো ক্ষতি নেই; প্রেম করে বিবাহ করো আপত্তি নেই; কিন্তু কোন ইংরেজ বা ইয়াঙ্কীকে বরমাল্য দিতে পারবে না। ফলে, কন্যা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে ধ্বংস করেছিল নিজের জীবন।—তখন, বৃদ্ধ যেন উন্মাদ হ'য়ে গেলেন। টাকা-কড়ি সব চার্চ্চে দান করে মৎলব করলেন সন্ন্যাস নেবার; মদের মাত্রা দিলেন মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে। দেখে, নতুন ওয়ারীসন্ ভাইপো ভার নিলেন আঙ্কল-এর। তাঁকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে নিয়ে এলেন ভারতবর্ষে! নিজে ছিলেন তিনি এখানকার ব্রাঞ্চ অফিসের চার্জ্জে; কাকাকেও ঠেলে বার করতে লাগলেন অফিসে। তারপর একদিন, অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে এ বাড়ীতে এসে বৃদ্ধ দেখলেন করুণাকে! ওঃ মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে সেদিন কী সে কান্না আঙ্কল-এর! তাঁর য়্যানও নাকি ছিল এমনি শান্ত, স্বল্পবাক, লজ্জাশীলা, পিতৃভক্ত—এমন কি দু'জনের মুখের কাট্ও নাকি অবিকল এক।

করুণা বুঝল এই সম্মানহারার ব্যথা। কিন্তু হৃদয়গোপাল? তিনি উঠে পড়ে লাগলেন একটা মেশিনারীর সোল এজেন্সী বাগাবার জন্যে!

তারপর থেকে দেখা গেল, দিনান্তে, অন্ততঃ একবার করেও করুণাকে দেখা চাই আঙ্কেল-এর। করুণাই ওঁকে পান খেতে শেখালো। পান চাই তাঁর প্রত্যহ; কিন্তু করুণার হাতের সাজা হওয়া চাই! চায়ে চিনি কম হলে বৃদ্ধ ক্ষেপে গিয়ে কটুক্তি করেন করুণাকে,—বহুমূত্রের কথা শুনতে চান্ না। আবার মেয়ের চোখের জল সামাল দেবার জন্যে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলেন: আচ্ছা, তুইও না হয় আমার গোটা কতক গোঁফ ছিঁড়েনে! কিন্তু—

হৃদয়গোপালের কাছে এ সবের কিছু মূল্য আছে কি! আজন্মের বাসনা তাঁর বড় বংশের ধনী পরিবারের কুটুম্ব হওয়া। তাঁর ইচ্ছার মূল্য কন্যাকে জোগাতেই হ'বে। দরকার হ'লে, য়্যানের মতো জীবন দিয়েও পিতৃভক্তির নজীর রাখতে হ'বে করুণাকে। অথচ—

য়্যানের পিতা উল্টো কথা বললেন সব শুনে। সহাস্যময় বৃদ্ধের প্রকৃতিই যেন বদলে গেল বিকাশের দৌত্যে! রুদ্ধ স্বরে' বললেন: তোমরা কী? এততেও বিদ্রোহ জাগেনা তোমাদের মনে?

—দূত অ-বধ্য আঙ্কল! বিকাশ সহাস্যেই উত্তর দিল: আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়োনা; বিদ্রোহ করবার মতো অবস্থা আমার এখনও আসেনি!

বৃদ্ধ আত্মসংবরণ ক'রে বললেন: তোমাকে আমি বলিনি; তোমার

আর্থিক অবস্থা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু, এই মেয়েগুলো কী? কী দিয়ে গড়া এদের হৃদয়? যাক্‌গে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক বিকাশ, তোমাদের বাড়ীর ছায়াও আর কখনও মাড়াবনা আমি। কিন্তু…

—বলো আঙ্কল—

—সত্যিই কি মেয়েটা পাথরে গড়া? আমি বোধ হয় ওর মনের কথা টের পেয়েছি বিকাশ। কিন্তু বুঝ্‌তে পারছিনা, অতি সহজ সমাধান থাকা সত্বেও, সে সুযোগ নিচ্ছেনা কেন—

—ও যে তোমার হ্যানের মতো আঙ্কল।

—ওঃ তাও তো বটে!

সতের

কাজ সেরে বাড়ী ফিরে বিকাশ চেষ্টা করল, পাঁকাল মাছের মতো অভিমান ত্যাগ করতে; কিন্তু আকল-এর বুকের জ্বালাটা যেন সংক্রামক ব্যাধির মতোই পেয়ে বসল তাকে। কেন এ এক তরফা নিষ্ঠা? কে শেখাল এই অবাঞ্ছিত কর্ত্তব্য-কথা? জন্মদাতা, অন্নদাতা যদি পিতার কর্ত্তব্যে উদাসীন্ হয়, তবে কন্যার পিতৃ-ভক্তির বজায় থাকে কী করে? জাতিগত সংস্কারের বালাই কি একেই বলে?

প্রশ্নটা করুণার মাথাতেও ঘুরছিল অন্য সমস্যার রূপ ধরে: সংস্কার না ভাগ্য? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং। এই কি তার ভাগ্যে লেখা আছে সত্যি সত্যি? দেওয়ালে টাঙানো মরা-মায়ের ছবি-খানার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল: তুমিও অনেক দুঃখ পেয়ে গিয়েছ! কিন্তু তোমার মতো ভাগ্য আমি পেলুম না কেন? তুমি তো নিষ্কৃতি পেয়েছিলে আমারই মতো বয়সে! তবে আমাকে কেন দিন গুন্‌তে হচ্ছে ফাঁসীর আসামীর মতো····

মৃত্যু-পথ-যাত্রীর দিন গোণার কথায় আর একজনের কথাও মনে পড়ে যায় করুণার! সেও এমনি পল গুণেছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে:

ছে'চল্লিশ সালের পনেরই আগষ্ট মুক্তি পেয়ে সত্যব্রত ষোলই আগষ্ট দুপুরে দ্বিজব্রতর মেসে ওঠে! সেই রাত্রেই—মেস-এর সকলেই জীবন দিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের হাতে, শুধু বেঁচে গেল

সত্যব্রত। মেস্-বাড়ীর এক পাশে রক্ষিত রাবিস্-স্তূপের মধ্যে একাদিক্রমে বাহাত্তর ঘণ্টা আত্মগোপন ক'রে থেকে রক্ষা পেল সে। রক্ষা করল একদল বেসরকারী খৃষ্টান স্বেচ্ছাসেবক....

ঘটনাটা মনে পড়লে এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় করুণার! স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একটি তরুণী মেম্-সাহেবও ছিল। মেয়েটি রাবিস্ স্তূপের মধ্যে লাঠির খোঁচা দিচ্ছিল মৃতদেহ আবিষ্কারের আশায়; হঠাৎ স্তূপ্ ঠেলে একটা অক্ষত অনাহত মানুষকে সটান উঠে দাড়াতে দেখে, মেয়েটি Oh God বলে ঢলে পড়েছিল পাশের ফাদারটির গায়ে! বেচারার আর দোষ কী! গুপ্ত-হত্যার গলিত শবের পরিবর্ত্তে একটা জীবন্ত মানুষের দেহ ভয়াবহ বৈকি!

তারপর, সেই তরুণী সিস্টারটিই সত্যব্রতকে বাহু ধরে অতি যত্নে এ্যাম্বুলেন্স্-এ তুলেছিল। ফ্লাস্ক খুলে খেতে দিয়েছিল গরম দুধ। জিগ্যেস করেছিল: তুমি কি আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাবে, না, নিজের দায়িত্ব নিজে নেবে?

সত্যব্রত বলেছিল: সেণ্ট জেম্স স্কোয়ারে আমার এক ভাই থাকে। আমাকে ন্যাড়া গীর্জ্জের মোড়ে পৌঁছে দিলেই অনুগৃহীত হবো।

তাই হলো। কিন্তু, কূলে এসেও তরী ডুবল। মেজ সরিক বাণীব্রতর বাড়ীটা ছিল একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে। হঠাৎ সেই গলি থেকেই বেরিয়ে এল জনকতক ডাণ্ডাধারী লোক। কোন রকম হৈ হল্লা না করে, শুধু ঘিরে ফেলে. তারা প্রশ্ন আরম্ভ করল: তুম্ কোন্ হায়· বাড়ী কোথায়···বাপের নাম কী···কী জাত···কী গোত্র···পৈতা কোথায়···

সত্যব্রত সব ঠিক্ ঠাক উত্তর দিল; কিন্তু ঘেমে উঠল শেষ প্রশ্ন শুনে। পৈতের খবর সে বহুকাল রাখে না। সভয়ে বলল: সত্যি বলছি, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ···

—বিপদে পড়লে অমন হিন্দু সাজে সব শালা!—

সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল ডাণ্ডা। মাথাটা চট্ করে সরিয়ে নেওয়ার ফলে আঘাতটা লাগল উরুতে। তারপর—তারা তাদের ভুল বুঝতে পারল। আহত সত্যব্রতকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দলপতি বলল: এ শালা সত্যিই হিন্দু যে রে! এখন কী করি একে নিয়ে?

মিনিট পাঁচেক ধরে পরামর্শ করলে সকলে। তারপর চ্যাং-দোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল সত্যব্রতকে। ভুল ভেঙে যেতে লোকগুলোর মনে বোধহয় সৎ মৎলবের উদয় হয়েছিল; তারা তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল ক্যাম্পবেল হাসপাতালের দিকে স্থুঁড়ি লেনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু সারকুলার রোডে পড়ে বেশীদূর এগোতে ভরসা করল না; একটা গ্যাস পোষ্টের তলায় তাকে শুইয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। সত্যব্রত সেইখানে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কোন দরদী ভদ্রলোকের, যে তাকে হাসপাতালে দিয়ে আসবে! তারপর—

লোক এল। একজন নয়—একগাড়ী মুসলমান। মোটর হাঁকিয়ে সবেগে যাচ্ছিল তারা মৌলালীর দিকে; গ্যাসের আলোয় হঠাৎ তাকে তারা দেখতে পেয়ে গাড়ী থামাল! প্রথমে নামল দু'জন যুবক।

সত্যব্রতর তখন দেহ নাড়বার ক্ষমতা ছিল না বটে, কিন্তু

চোখ দুটো খোলা ছিল। দেখে একজন চেঁচিয়ে উঠল : বাপ্‌জান, এ মুর্দ্দা নয়, জ্যান্ত রয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনও বলে উঠল : বাপ্‌জান্, এ ব্যাটা মুসলমান নয়—হিন্দু··

—ক্যা তাজ্জব! বলতে বলতে গাড়ী থেকে নেমে এলেন এক বৃদ্ধ।

—কে তুই বটে রে? প্রশ্ন করল যুবকদের একজন।

সত্যব্রত উত্তর দিল না : মৃত্যু তখন আবশ্যম্ভাবী তখন কৈফিয়ৎ দিয়ে আর লাভ কী!

—বলো··কে তুমি? এবার প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। ভদ্রলোকের প্রশ্নের ভঙ্গিটা ছেলেদের মত উগ্র নয় দেখে, সত্যব্রত বলল : আমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ।

—এখানে কি করছো?

—মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছি।

জবাব শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেলেন। বললেন : কোন মহল্লার লোক তুমি? নাম কী? লেগেছে কোথায়?

সত্যব্রত যথাযথ উত্তর দিল।

—সত্যব্রত রায়? শীকারপুরের? বৃদ্ধ যেন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন! আবার বললেন : কোন শীকারপুরে তোমার বাড়ী? গুতোরপাড়ার কাছে? বাপের নাম কি?

—রায় শুভব্রত চৌধুরী।

—তোবা তোবা! বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদের হুকুম করলেন : তুরন্ত গাড়ীতে উঠাও···

ব্যাপারটা আর কিছু নয়,—স্বরোদ নেওয়াজী মহীউদ্দিন খাঁ সাহেব একসময়ে শুভব্রত রায়ের অন্ন খেয়েছিলেন; অনেকদিন চাকরী করেছিলেন তিনি গড়বাড়ীতে। তাই, সুযোগ পেয়ে ভূতপূর্ব্ব মনিবপুত্রের উপকার করলেন। সত্যব্রতকে হাসপাতালে দিলেন না তিনি দ্বিবিধ কারণে, চিকিৎসা করালেন নিজের বাড়ীতে রেখেই। কিন্তু, বৃদ্ধের প্রতিবেশীরা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না! প্রথম প্রথম তারা মহীউদ্দিনের অসুস্থ ভতিজার কথাটা বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু ধরা পড়ল সত্যব্রত একটু সামলে উঠ্‌বার পর! তখন বিপদ বুঝে বৃদ্ধ খবর পাঠালেন পুলিশে! কিন্তু পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ কী কায়দায় যে তাকে একেবারে ঢাকায় চালান দিলেন, একটা খুনী মামলার আসামী করে—সে এক অন্য উপন্যাস…। মুক্তি পেল সত্যব্রত দেশ স্বাধীন হবার পর!

বিকাশ ঘরে ঢুকে বলল: সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এবার কিছু মুখে দে!

—আচ্ছা বিকাশদা—ক্রমাগত নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে গিয়ে করুণার কাণ্ডজ্ঞান বলতে তখন আর কিছু ছিল না। বলল: আজ বাদে কাল যার ফাঁসী হ'বে, সে খেতে পারে কী করে বলতে পারো?

—পারি! বিকাশ গম্ভীরভাবে বলল: মৃত্যুর সঙ্গে যোঝ্‌বার জন্যে। তাকে জয় করবার জন্যে! যেখানে যত ইতর প্রাণী আছে, খোঁজ নিয়ে দেখিস্‌, তারা সকলেই আশাবাদী! যুদ্ধ না

করে হার মানে না। বিনা যুদ্ধে হাল্ ছেড়ে দেয় শুধু বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জানোয়াররা। তাই তো তোকে বলছি, এমনি ক'রে শরীর নষ্ট করিস্ নি! শরীর ঠিক না থাকলে বুদ্ধি ঠিক্ থাকে না। ওঠ্ তুই···

করুণা এবার সত্যই উঠ্ল।

সেইদিনই—

হৃদয়গোপাল ফিরলেন রাত দশটার পর। ফিরে সর্ব্বাগ্রে খবর নিলেন: করুণা খেয়েছে কি না!

বিকাশের মা সংক্ষেপে বললেন: খেয়েছে।

শুনে তিনি নিজের ঘরে গেলেন। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না। এতক্ষণ, কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকলেও, মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারেন নি, মেয়েটা খুব কষ্ট পেয়েছে এবং নিঃসন্দেহে না খেয়ে পড়ে আছে। কিন্তু উদগ্র উৎকণ্ঠা তাঁর শেষ পর্য্যন্ত দূর হ'লেও, আর এক রকমের অস্বস্তি মন জুড়ে বসল: তাঁর করুণা আর আগের মত নেই! আজকাল আর সে কথায় কথায় অভিমান করে না বুড়ো বাবার ওপর—খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে. কথা লুকোয়, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে নীরব বিদ্রোহে; ভুলেও ভাবতে পারে না,—তার জন্যে তার বুড়ো বাবা কত কষ্ট পাচ্ছে; কত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে তারই মঙ্গলের জন্যে! হয়তো, একেই বলে বয়সের ধর্ম্ম! না হলে, বাপ তার কাছে আজ এতখানি পর হয়ে যায়! কী বিচিত্র মন এই মেয়ে জাতটার! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ধারণা বদলে দিলে! এতদিন তো তাঁর ধারণা ছিল—ছেলেবেলার ছেলেখেলা ভুলে গেছে মেয়েটা। অথচ ··

কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঠাণ্ডা করে তিনি একটা টেলিগ্রামের খসড়া করে ফেললেন: স্নেহের দীপক, একটা উড়ো চিঠি যে তোমার মত উচ্চ শিক্ষিত ছেলের কাছে এতখানি মর্য্যাদা পাবে, আশা করিনি। তুমি যখন এই দেশেরই ছেলে, তখন নিশ্চয়ই জান, বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনেক বাপ-মা অনেক স্বপ্ন দেখে; আবার সেই সব স্বপ্নের অপমৃত্যুও ঘটে। সুতরাং...

অস্বস্তির জন্যে রাত্রে ভালো করে ঘুম হ'লো না তাঁর। সকালে পুষিয়ে নেবার মতলব করলেন; কিন্তু বাদ সাধলেন সোরাবজী, দর্শনপ্রার্থী হয়ে!

—কী ব্যাপার? সর্ব্বাগ্রে টেলিগ্রামটার ব্যবস্থা করে হৃদয়গোপাল সোরাবজীর প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

সোরাবজী সবিনয়ে কুশল সংবাদ গ্রহণ ক'রে কাজের কথা পাড়লেন: প্রশান্তর দেনাটার একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু শমন পেয়ে কেঁদে এসে পড়েছে প্রশান্তর বিধবা মা। বাড়ীর অংশ হাতছাড়া হ'লে তাঁকে একেবারে পথে বসতে হ'বে। পৈত্রিক যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর ছেলে স্বদেশী করে। আছে শুধু বসত বাড়ীর আধখানা। তারই একাংশ ভাড়া দিয়ে পেট চলে তাঁর। নাহলে, ছেলে তো এক পয়সাও ঘরে আনে না। তাই, হৃদয়গোপাল যদি একটু অনুগ্রহ করেন।

—এ ব্যাপারে, আমি কী করতে পারি বলুন।

—প্রশান্ত আপনার কর্ম্মচারী। তার মাইনে থেকে প্রতি মাসে যদি কিছু করে কেটে নিয়ে...

—বুঝেছি! হৃদয়গোপাল বাধা দিয়ে বললেন: কিন্তু, আপনি গোড়ায় গলদ করেছেন। প্রশান্ত আমার ওয়েল্‌ফেয়ার অফিসার। অর্থাৎ ওর চাকরীর মেয়াদ নির্ভর করছে কুলী মজুরদের মন মেজাজের উপর। যে কোন মুহূর্ত্তেই ওর চাকরী যেতে পারে।

—তা আমিও জানি। কিন্তু দেখুন, প্রশান্তর একটা সুরাহা কি আপনি করতে পারেন না? ওর বাপ আমার বন্ধু ছিলেন। ভদ্রলোক অনেক টাকা দিয়ে গেছেন আমার দোকানে! ওর মাও আমাকে বাবা ডেকে কেঁদে পড়েছে। দেখুন, সুদ আমি কিছু ছেড়ে দিতে পারি আসলের ভরসা পেলে। আপনিও কারবারী লোক, বুঝতে তো পারছেন, রাজত্বটা এখন আর ইংরেজের নেই। দেশী গবর্ণমেণ্টের যা মৎলব দেখছি, তাতে, আমাদেরকেও যে কোন মুহূর্ত্তে পাত্‌তাড়ি গোটাতে হ'তে পারে। কিন্তু, অতগুলো টাকা তো আর এ দেশে ফেলে রেখে যাবার জন্যে রোজগার করিনি। সুতরাং—

—সুতরাং ওদেরকে পথেই বসতে হবে। হৃদয়গোপাল মুচকে হেসে বললেন: তাছাড়া, আমার ধারণা, স্বয়ং ভগবান এসেও প্রশান্তকে সুবুদ্ধি দিতে পারবে না। আপনি বৃথা চেষ্টা করছেন।

—কিন্তু, আপনি তো ইচ্ছে করলে ওকে একটা permanent চাকরীও দিতে পারেন?

—না আমি পারিনা।—হৃদয়গোপাল সাফ্‌ জবাব দিলেন: বোধ হয় কোন সুস্থ মানুষই পারবে না। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে মিষ্টার সোরাবজী! জেনে শুনে কেউ কাল-কেউটে পোষে না।

এতেও কিন্তু সোরাবজী নিরস্ত হ'লেন না; চেপে বসে বললেন:

আপনি বুদ্ধিমান লোক! কাল-কেউটেকে খোঁচাবার বিপদটাও নিশ্চয়ই জানেন।

এবার হৃদয়গোপাল ভাল করে চাইলেন সোরাবজীর দিকে। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে তাকিয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে। তারপর গলা ঝেড়ে হৃদয়গোপাল বললেন: বেশ, তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। এখানে নয়, কোলকাতার অফিসে।

—অসংখ্য ধন্যবাদ! কিন্তু, আরও একটা নিবেদন ছিল আপনার কাছে!

—আবার কী?

—শুনলাম, আগামী মহালয়ার দিন V. I. P.রা সব আসছেন আপনার রিফিউজী কলোনীতে। দয়া করে refreshment-এর ব্যবস্থাটা যদি আমাকে দেন।

—এরই মধ্যে খবরটা রটে গেছে! হৃদয়গোপাল হেসে বললেন: বেশ, অর্ডারটা আপনিই পাবেন; বিল পেমেণ্টের সময় consider করতে হ'বে কিন্তু!

—অবশ্য, অবশ্য! সোরাবজী সোৎসাহে বললেন: সব শুদ্ধ আসছেন ক'জন? ড্রিঙ্কএর ব্যবস্থাও রাখবো তো?

হৃদয়গোপাল হিসেব করে বললেন: ক্যাবিনেটের দুজন, য্যাসেম্বলীর তিরিশজন, এ ছাড়া আমার হবু বৈবাহিককেও সপরিবারে আনাবো। সাকুল্যে শ' খানেক লোকের ব্যবস্থা করবেন। ড্রিঙ্ক-এর ব্যবস্থাও থাকবে বৈকি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ! সোরাবজী এবার উঠলেন।

আঠার

কথার খেলাপ করা করুণার সহ্য হয়না। তাই, ঠিক পাঁচ দিনের দিন সে রাঙাবৌকে চিঠি পাঠাল নিথর ঠাকরুণ মারফৎ:

ভাই বৌদি, আজ আমার দেখা করবার কথা ছিল আপনার সঙ্গে; কিন্তু পারলাম না। পাছে আপনি চিন্তিত হন, তাই পত্র লিখছি। কোন বিশেষ কারণে, জলসা ক'রে উদ্বাস্তুদের সাহায্য করবার পরিকল্পনা আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। জহরবাবুকে আর বিরক্ত করবার দরকার হ'বেনা। আবার কবে দেখা হ'বে জানিনা। আশা করি ভাল আছেন। ইতি করুণা।

চিঠি পড়ে রাঙাবৌ এক পাশে ফেলে রাখল। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিলনা তার; মন তার অস্থির হয়ে উঠেছিল অন্য কারণে। সুকৃতিকে ভরসা দেবার ভরসা সে আজও পেলনা।

আবদার নয় অনুরোধ নয়, সামান্য একটা ইঙ্গিত মাত্র! তা'তেই সুব্রতর এই পরিবর্ত্তন। গত কয়েকদিন ধরে সে লক্ষ্য করেছে, সুব্রত সকাল ন'টার মধ্যে নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে যায়, বাড়ী ফেরে রাত্রি সাড়ে-দশটা এগারটার পর। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে ঘরে, মোকাবিলার আর সুযোগ ঘটেনা। নেহাৎ যদি চোখাচোখী হয়ে যায়, অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে: 'বড্ড' কাজ পড়েছে। এ ক'দিন তোমার বিশ্রাম রাঙাবৌ। কিন্তু এটা কি সুব্রতর পালিয়ে বেড়াবার অজুহাত নয়!

কেন! তখন রাঙাবৌ কী উত্তর দেবে? তার চাইতেও বড় কথা সুকৃতি হাসবার মেয়ে নয়। হয় তো সে একটা কথাও কইবে না, নীরবেই নিজের কাজ করবে! অর্থাৎ রাঙাবৌকে বিশ্বাস ক'রে যে মহাপাপ সে করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবে আত্মহত্যা ক'রে!

দায়ী হবে রাঙাবৌ

বোঝার ওপর আবার শাকের আঁঠি চাপল! এক ফাঁকে সুকৃতি এসে খবর দিয়ে গেল। গত পরশু থেকে তালুকদার নিখোঁজ! অর্থাৎ কুন্তলার মতো রদ্দি জিনিষকে সুকৃতিদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়েছেন তিনি!

অবশ্য, সুকৃতি নিষ্কৃতি পেল তার হাত থেকে। তাকে আর তালুকদারের প্রয়োজনে ধুয়ে-মুছে নব জীবন লাভ করতে হ'বে না। কিন্তু, রাঙাবৌয়ের জীবনে এ কী অভিশাপ জড়ো হতে আরম্ভ করল! সুকৃতি ছিল; আবার আর একজন বাড়ল! হায় ভগবান, এ ঝঞ্ঝাট থেকে উদ্ধার পাবার সত্যই কি কোন উপায় নেই! অবশ্য নাকে-কানে খৎ, ভবিষ্যতে আর কখনও সে কোন রকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবে না; কিন্তু আপাততঃ সুকৃতির কাছে মান বাঁচানো যায় কী ক'রে! সত্যিই কি কোন উপায় নেই? সুব্রতকে বাদ দিলে থাকে সত্যব্রত! কিন্তু, সে আর আগেকার সেই সতু নেই! কথাবার্ত্তাও এক রকম বন্ধ তার সঙ্গে। তা হ'লে! আর কোন পুরুষকে সে তো চেনে না! তা হ'লে কে আর তাকে উদ্ধার করবে এই বিপদে!

ভাবতে ভাবতে রাঙাবৌ এমনি মুসড়ে পড়ে যে, শরতের

ঔজ্জ্বল্য ঘোলাটে হয়ে গিয়ে, তার মনে ঘনিয়ে আসে শ্রাবণের ঘনঘটা। মধ্যাহ্নের প্রাখর্য্যের মধ্যেও সে যেন অনুভব ক'রে, অমানিশার দুস্তর আঁধার! প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখে বিভ্রান্ত হরিণী যেমন সভয়ে চোখ বোজে, রাঙাবৌও তেমনি অন্ধকার দেখে চতুর্দ্দিকে। ভাবে—

এর চাইতে নিজে আত্মহত্যা করলে কেমন হয়! লোকে যাই বলুক না কেন, সে নিজে তো আর শুনতে আসছে না! এই ভাবে একটা লোকের খেয়াল-খুশীর খেলনা হ'য়ে থাকার চাইতে আত্মহত্যা করা কি ঢের ভাল নয়! কিন্তু—

তবুও, একেবারে নিরাশ হ'তে মন যেন তার চায় না। ভাবে—আঁধারেও তো মানিক জ্বলে।

হঠাৎ দাসী এসে খবর দেয়: তোমার মাষ্টার এসেছে গো বৌদি।

—য়্যাঁ! কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারে না রাঙাবৌ!

দাসী আবার বলল: ডেকে দি ওপরে?

—দে!

দাসী চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কি যে হ'লো রাঙাবৌয়ের—সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। রোমাঞ্চিত কলেবরে আগে গিয়ে দাঁড়াল সে আয়নার সামনে। কিন্তু চুল ঠিক করতে গিয়ে আবার নজর পড়ে গেল পরণের কাপড়খানার দিকে। তিনদিন পূর্ব্বেকার ভাঙ্গা সাদা শাড়ী; তার ওপর আবার হলুদের দাগ লেগেছিল আঁচলে। দেখে, তাড়াতাড়ি সে একখানা রঙ্গীন শাড়ী টেনে নিল আলনা থেকে; কিন্তু কাপড় বদলাবার সুযোগ আর হ'লো না; জহর ঘরে ঢুকল।

—আসুন!

অনেকদিন পরে দেখা; রাঙাবৌয়ের মনে হলো: জহরের ধুতী-পাঞ্জাবী পূর্ব্বের মতো ধোপদস্ত গিলে করা হ'লেও, মুখখানা কেমন যেন শুকনো-শুকনো!

জহরও তাকিয়েছিল তার দিকে। দুজনের চোখাচোখি হ'তেই রাঙাবৌ চোখ নামিয়ে নি'ল। বলল: বসুন! অসুখ করেছিল বুঝি?

—না তো! জহর বলল।

—তবে? রাঙাবৌ আবার জহরের মুখের দিকে তাকাল। বলল: এতদিন আসেন নি যে?

জহর জবাব দিল না। গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

রাঙাবৌ আবার বলল: চুপ করে রইলেন যে? আমি কি কোন দোষ করেছি?

—না না, সে কি কথা!

—তবে?

জহর আবার নিরুত্তর হ'লো।

রাঙাবৌ যেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল: আমাকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে আগে কত বকুনি দিতেন; আর এখন নিজেই আসা বন্ধ করলেন! বেশ যা হোক—

জহর ক্রমশই যেন অভিভূত হ'য়ে পড়ছিল। কী একটা কথাও যেন বলবার চেষ্টা করল সে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারল না।

রাঙাবৌ আবার বলল: আমার শেখা তাহলে বন্ধ থাক?

—না না বন্ধ থাকবে কেন! জহর ব্যস্ত হ'য়ে বলল: যন্তরটা পাড়ুন না—

মনের আগোচরে পাপ নেই! জহরের গাম্ভীর্য্য দেখে রাঙাবৌও উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল মনে মনে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সেতার নিয়ে বসল!

—কী দিয়েছিলাম মনে আছে?

—পটদীপের স্থায়ী আর মান্‌ঝা। অন্তরা পাইনি।

—বেশ। তরফ বেঁধে দিয়ে জহর তবলা টেনে নিল।

শিক্ষা চলল একটানা প্রায় আড়াই ঘণ্টা। অন্তরা ছাড়াও ডজনখানেক ছুট্ তান আয়ত্ব ক'রে ফেলল রাঙাবৌ। তারপর বলল: আজ থাক—আঙ্গুলে লাগছে।

—লাগছে? তবে থাক!—জহর বেলার দিকে তাকিয়ে বলল: সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে, আমিও আজ উঠি। কই, সুব্রতকে দেখলাম না? বেরিয়েছে নাকি?

—কলেজে গেছে।

—কলেজে? জহর আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: কলেজে তো এখন পূজোর ছুটী!

তাও তো বটে! একথাটা তো মনে পড়েনি এতদিন। রাঙাবৌ ভুরু কুঁচকে বলল: তাহলে অন্য কোথাও গেছে!—আপনি আবার পরশু আসছেন তো?

জহর কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল: আপনি ওগুলো তুলুন না ভাল করে—

—ও আবার কি কথা? রাঙাবৌ সন্দিগ্ধ হ'য়ে বলল: আপনি কি আর আগেকার মতো নিয়ম করে আসবেন না?

জহরের মুখ আবার গম্ভীর হ'য়ে উঠল। সে কী যেন একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলনা!

দেখে, রাঙাবৌও সোজা হয়ে বসল। একটা অতি কঠিন, অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য শোনাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো সে। বলল: কী হয়েছে বলুন তো? কেউ কিছু বলেছে আপনাকে?

—না তো।

—বড় রায় সত্যব্রত?

—তাঁকে তো এখনও আমি চোখেই দেখিনি।

সুব্রতর কথাটা রাঙাবৌয়ের মনেই এল না; সে হাঁফ্ ছেড়ে বলল: তবে কেন আপনি আসেন নি এতদিন? কেন এত অনিচ্ছে আপনার....আমাকে শেখাতে?

—অনিচ্ছে? জহর ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল: কী বলছেন আপনি? আপনাকে শেখাতে আমার অনিচ্ছে?

—ঠিকই বলছি—একটু উত্তেজিত ভাবে রাঙাবৌ বলল: আপনার এখন ভয় ঢুকেছে—ঘরোয়ানা বিকিয়ে যাবার ভয়...

জহর যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল: আপনি আমাকে বলতে পারলেন এই কথা! আপনি আর আমার ঘরোয়ানা আলাদা? জানেন আপনি, এ ক'দিন কত কষ্ট পেয়েছি এখানে আসতে না পারার জন্যে?

—থাক্! রাঙাবৌ সবেগে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর আস্তে

আস্তে বলল: কষ্ট পেয়েছেন না হাতি! ইচ্ছে থাকলে, কেউ নাকি না এসে পারে!

—পারে! আচমকা আঘাত পেয়ে জহরেরও মনের সংযম নষ্ট হবার উপক্রম করছিল। বলল: আমার মতো অবস্থায় পড়লে বুঝতে পারতেন—কেন আমি আসা বন্ধ করেছি—

—সেই কথাই তো জানতে চাইছি। রাঙাবৌ এবার বিরক্ত হ'য়ে বলল: আসল কথাটা বলছেন না কেন?

—আমি এলে—জহর কুণ্ঠিতভাবে বলল: আপনার ক্ষতি হ'তে পারে—

—ক্ষতি হ'তে পারে—আমার? তার মানে?

—দেখুন সে অনেক কথা। জহর ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প্রস্থানোদ্যত হলো। অসহায়ের মতো হঠাৎ হাতজোড় করে বলল: আজ আমাকে মাফ্ করুন। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। আমি আসবো···না এসে পারবো না—

জহর চলে যবার পরও রাঙাবৌ কিছুক্ষণ আড়ষ্টভাবে বসে রইল। ঘরময় ছড়ানো, তবলা, হাতুড়ী, খাতা-পত্র, সেতার, মেজরাপ, —ছড়ানোই রইল; তার মাঝখানে বসে রইল সে অভিভূতের মতো! মস্তিষ্ক তার যে পরিমাণে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি যেন নিস্তেজ হ'য়ে গিয়েছিল দেহের প্রতিটি অঙ্গ। সঠিক বুঝতে না পারলেও মেয়েলী মন তার সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। এ হেন অবৈধ ব্যাপারের জন্ত তার আজীবনের সংস্কার চোখ

রাঙিয়ে উঠলনা। জহরের ওপর মন তার বিরূপ তো হলোই না বরং সব কিছু সন্দেহ, সব রকম যুক্তিতর্ক তুচ্ছ হয়ে গিয়ে একটি মাত্র সত্য প্রকট হ'য়ে উঠছিল তার মনে: নিঃশেষে রিক্ত সে আজও হয়নি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে আত্মধিক্কারে উন্মাদ হ'য়ে আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল। মনে করেছিল: কেউ নেই তার এ সংসারে, কারুর নয় সে! খেলার পুতুল সে ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীর! তারই মর্জ্জির ওপর নির্ভর করছে তার জীবন-যাত্রার মান; শিক্ষা দীক্ষার ভাল-মন্দ! কিন্তু, তা তো নয়!

—ওগো বৌদি গো। দাসী হন্তদন্ত হ'য়ে নীচে যাচ্ছিল; হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল: ও পাড়ার বিনু ঠাকুরকে নাকি পুলিশে ধরেছে—

—বিনু ঠাকুর—মানে—বিনুদা? রাঙাবৌ আশ্চর্য্য হয়ে বলল: কী করেছেন তিনি?

—কী জানি! দাসী প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে বলল: নিথর ঠাকরুণ এসে কী সব বলছে বড় রায়ের কাছে!

—তুই আবার চললি কোথায়? রাঙাবৌ ব্যস্ত হ'য়ে বলল: উনুনে আগুন দিয়েছিস? বামুনদি এসেছে?

—সব ঠিক আছে গো ঠিক আছে!—রগড় দেখবার ব্যস্ততায় দাসী ছুটে নীচে নেমে গেল।

রগড়!

তুনিয়ার যে অবজ্ঞার পাত্র, তাকে নিয়ে শুধু রগড়-ই করা

চলে, আর কিছু করা পোষায় না। কিন্তু অবস্থা গতিকে, সত্য-ব্রতকে আলস্য ত্যাগ ক'রে উঠে বসতে হ'লো। নিথর ঠাকরুণ যা বলল : তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে :

বিন্‌দা নিত্যকার মতো স্নানাহ্নিক সেরে ভোর বেলায় পূজো করতে বেরিয়েছিলেন। নৈমিত্তিক পূজো ছাড়াও আজ আবার একটা স্বস্ত্যয়ন ছিল গোঁসাইপাড়ায়; তাই আজ সঙ্গে নারায়ণ নিয়ে বেরিয়েছিলেন; ফেরবার পথে পুলিশে ধরেছে। গোঁসাইপাড়া থেকে গড়বাড়ী আসতে গেলে মধ্যে পড়ে মনসাতলা। জায়গাটা র‍্যাশান এরিয়া। সেখানে আজ যে ওয়াচ-ম্যান ছিল, সে বিনদার কথা বিশ্বাস করেনি। সবশুদ্ধ থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে!

নিথর ঠাকরুণ ঘটনাটা বলে যাচ্ছিল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। শুনতে শুনতে সত্যব্রতও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কর্ত্তব্যের আহ্বানও নয়, পূর্ব্বাপর সংস্কারের বালাইও নয়, যেন, তার চাইতেও বড় কিছু একটার তাড়নায়, সে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল—

—আশ্চর্য্য! সত্যব্রত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল : সব শুনেও তোমাকে তাড়িয়ে দিলে ইজারাদার?

—তবে আর বলছি কি গো!—নিথর ঠাকরুণ সঝঙ্কারে বলে উঠল : পাড়ার ছোঁড়াগুলো সব বারোয়ারী নিয়ে ব্যস্ত,—শুনে, কেউই গা করলে না! আর করবেই বা কোন আক্কেলে বলো! এ ক্যাট্‌ক্যাটে বামুন কখনও কি কারুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে! তাই—কেউ যখন থানায় যেতে রাজী হ'লো নি, তখনই না আমি তোর কাছে গেনু। তুই নতুন বড় মানুষ হয়েছিস,

মানী লোক হ'য়েছিস, বেশ করেছিস, কিন্তু, তাই বলে, বামুনের ছেলে উপোষ ক'রে হাজতে পচছে, তুই একবার দেখবি না? তোর বংশের পুরুত বটে তো সে! তা শুনে যেন একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল: আমার দ্বারা কিছু হ'বে না, যাও।—কিন্তু, যাও বললেই তো আর যাওয়া যায় না বাছা! তাই মান খুইয়ে গেনু করুণাদিদির কাছে! তা বাপু সত্যি কথা বলবো: বাপের মতো মেয়ে অমন চামার নয়। মন দিয়ে সব কথা শুনে বললে: আমি মেয়েছেলে কী করতে পারি বলো। তবে, তুমি একটা কাজ করতে পারো! গড়বাড়ীর বড় রায় ফিরেছেন জান তো! তাঁকে গিয়ে বলো, সব ঠিক করে দেবেন তিনি।—তখন, আমারও মনে পড়ল; ওমা·তাইতো······

—করুণা বললে আমার কাছে আসতে?

—এক কথা; আর কতবার বলবো গো বাবা? দেখা হলে জিগ্যেস করো না।

সত্যব্রত লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। সত্যি, কথাটা ইতিমধ্যে বার পাঁচেক জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলল: আচ্ছা, তুমি এখন এসো, আমি এদিকে দেখছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সত্যব্রত বেরিয়ে পড়ল—সঙ্গে নিল তার শেষ সম্বল এগার টাকা পাঁচ আনা পয়সা। বরাতক্রমে, বড় রাস্তায় পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মিলে গেল একটা বাস্, সে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

মন তার চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল ; কিন্তু বাস্-এর গতি যেন তাল রাখতে পারছিল না তার সঙ্গে : থানায় পৌঁছতেই যদি রাত হ'য়ে যায়, তাহলে কখন সে কী করবে ! হঠাৎ গাড়ীর ঝাঁকুনীতে টাল্ সামলে ওপরকার রড্ ধরে ফেলল সে ! অনভ্যাসের ফোঁটা—

অনভ্যাসের কথায় বিনুদার অবস্থাটাও তখন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে চোখের ওপর। ভদ্রলোকের ভিড়ের চাপে তারই যদি এই অবস্থা হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে, তাহলে সেই সকাল থেকে, এক দঙ্গল চোর ছ্যাঁচোড়ের মধ্যে বসে বিনুদা বেচারা কি করছে !

বেচারা !—কথাটা শুনে আসছে সে জ্ঞান হবার পর থেকে। কিন্তু, কথাটার অর্থ যে এমন সাংঘাতিক হতে পারে তা কে জানতো !

জ্ঞান হবার পর থেকেই সে শুনে আসছে বিনুদার জীবনের বিভিন্ন কাণ্ড। সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের হাতেগড়া শিষ্য ইনি ! কিন্তু, পাণ্ডিত্যের দাপটে নাম কিনলেন—গণ্ডমূর্খ ! কৌমার্য্য ব্রতধারী ব্রাহ্মণ ইনি। অতএব দারিদ্র্যকে ভয় করেন না ; বিন্দুমাত্রও দুর্ব্বলতা নেই তাঁর কামিনী কাঞ্চন বা খ্যাতি প্রতিপত্তির ওপর ! স্বপাক খেয়ে, জীবনের প্রায় পঁয়ষট্টিটা বছর কাটিয়ে দিলেন একলা, একটা খাপ্‌রার ঘরে বাস ক'রে। কিন্তু, বামুনাই দম্ভটা কিছুতেই ছাড়লেন না। ফলে, পরিচিত মহলে খ্যাতি রটল—উন্মাদ। ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হ'চ্ছে পূজা ও পৌরহিত্য। কিন্তু কোন সার্ব্বজনীন্ পূজামণ্ডপের ধার মাড়ালেন না। পাড়ার লোকে হিন্দুধর্ম্মের দোহাই পাড়ল। বিনুদা চোখ্ টিপে প্রশ্ন করলেন : হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে

খবর-টবর কিছু রাখ নাকি তোমরা? বল দেখি কলা-বৌ গণেশের কে হয়?

—গণেশের স্ত্রী হয়!

—দূর হ'—দূর হ'! যারা মা-কে স্ত্রী বানিয়ে দেয় তাদের অসাধ্য কিছু নেই। Clear out, you criminals

তারপর থেকে, প্রতিবেশীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে এড়িয়ে চলতে লাগল —ষ্টুপিড্‌টাকে!—গৃহস্থের ক্রিয়া-কর্ম্মে ব্রাহ্মণরা চিরকালই মেয়েদের মন জুগিয়ে চলে, কিন্তু বিনদার সব উল্টো! গিন্নীদের উদ্দেশে চোখ রাঙ্গিয়ে বলবেন: এ তোমাদের গোবর আর রান্নাঘরের ধর্ম্ম নয়! যা বলছি সেই ব্যবস্থা করো।—অল্পবয়সীদের উদ্দেশে ঘা মারবেন আবার আরও মোক্ষম রকমের: মা লক্ষ্মীরা ভারতীয় সংস্কৃতির শ্লোগান আউড়ে আউড়ে মুখে তো ফ্যানা তুলে ফেললে! তার চাইতে নিজেরা একটু sincere হ'লে কি ভাল হ'তো না? ইংরিজির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ভাঁষাটাও একটু চর্চ্চা করো না। বুঝতে পারবে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্মের মাহাত্ম্য! ফলে, সকলে সর্ব্ব-রকমে বর্জ্জন করল অধার্ম্মিক ভণ্ডটাকে! তারপর, মাঝখানের বছর পাঁচেকের খবর সত্যব্রত জানে না! মনে হয়, পাড়ার লোকে আমল না দিলেও, বে-পাড়া থেকে কিছু কাজকর্ম্ম তাঁর জোটে; কিন্তু এবার তাও যাবে সম্ভবতঃ। স্বাধীন দেশের স্বদেশী পুলিশের কল্যাণে হয়তো, ইতিমধ্যেই খ্যাতি রটে গেছে বিন্‌দার—দাগী আসামী বলে!

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিন্‌দার চেহারাটা! মাথায় কদম-ছাট চুল, পরণে ছেঁড়া থান; পায়ে পুরোণ খড়ম;—এই হ'চ্ছে তাঁর

চিরকেলে চেহারা।—গামছায় বাঁধা নৈবেদ্যর খুঁদ-কুঁড়ো; শৈত্যেয় বাঁধা সিংহাসন-সমেত শালগ্রাম শিলা; কণ্ঠে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে নিশ্চিন্তমনে বাড়ী ফিরছিলেন ব্রাহ্মণ; এমন সময়ে···

আশ্চর্য্য! সুদীর্ঘকালের যাবনিক শাসনেও যে ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্রাহ্মণ! অতি দুর্দ্দান্ত লীগ-মন্ত্রির আইনও যাকে কখনও স্পর্শ করবার দরকার মনে করেনি; মাস্ খানেক বয়সের স্বাধীন পুলিশ তাকে গারদে পুরলো! র‍্যাশানের চালের সঙ্গে কাঁকর-বিহীন খুদ-কুঁড়োর পার্থক্য বুঝলে না; গামছায় বাঁধা ভিজে খুঁদের রহস্যটাও বিবেচনা করলেন না সেক্যুলার ষ্টেটের কোন স্বাধীন মহাত্মা!—মানুষের চাইতেও মর্য্যাদা দিল একটা সাময়িক আইনকে!

—শুনছেন, ও দাদু! টিকিট্‌টা বার করুন!

—আমাকে বলছেন? সত্যব্রত চমকে উঠে কন্‌ডাক্‌টারের দিকে তাকাল: মুখের চেহারা দেখে মনে হয় ভদ্রসন্তান···অথচ,···দাদু···

একী হলো এ জাতের! দাদু কথাটা পিতামহ, মাতামহ বা ক্ষেত্রবিশেষে বড় ভাইয়ের উদ্দেশে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া অন্য অর্থে ভদ্র সমাজ প্রচলিত নয়,—আড্ডা বিশেষের স্যাঙ্গাৎদের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ, কন্‌ডাক্‌টারটা, সম্পূর্ণ অপরিচিত—বাপের বয়সী, হাঁটুর বয়সী ভদ্রলোকদেরকে দাদু সম্বোধনে কৃতার্থ ক'রে দিলে!—দৈনিকের খবরে প্রকাশ বেকারীর তাড়নায় শিক্ষিত ভদ্র সন্তানরা আজকাল কন্‌ডাক্‌টারের চাকুরী নিতে বাধ্য হ'চ্ছে। কিন্তু, কন্‌ডাক্‌টার হ'লেই কি ভুলে যেতে হ'বে ভদ্রতা? বাস্-যাত্রীরা আজ তাদেরকে আপনি সম্বোধনে সম্মান জানাচ্ছে বলেই কি প্রতিদানে

দাদু বলে অপমান করতে হ'বে? অথচ, যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে, যাত্রীরা যখন ওদেরকে তুই তুকারী করতো, তখন তো কোন শ্রীমানের মুখ দিয়ে দাদু বেরুতো না?—সত্যব্রত আশ্চর্য্য হ'য়ে একজন সহযাত্রীকে প্রশ্ন করল: 'মশাই' কথাটা কী অপরাধ করল?

—বোধ হয় পুরোণ হ'য়ে গেছে!

—দাদু কথাটাও তো একদিন পুরোণ হ'য়ে যাবে! তখন কী চলবে? স্লা? সহ্য করতে পারবেন?

—না পেরেই বা উপায় কী বলুন? প্রতিবাদ মানেই তো মারামারি করা। ছেলে পড়িয়ে খাই, গুণ্ডামীর চর্চ্চা তো কখনও করিনি। তাছাড়া, ওদের ইউনিয়ন আছে; আমাদের তো কিছু নেই!

তা বটে! সংঘহীন সংখ্যাগরিষ্ঠদের মান মর্য্যাদা, জীবন মরণ চিরকালই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আসছে সংঘবদ্ধ নগন্য কর্ত্তৃক! এ ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করবে কোন গাড়োল! তার ওপর জাতটা যখন একাধারে আত্মহন্তী, আত্মবিস্মৃত এবং আত্মতুষ্ট!

—একি সতুদা?—থানায় ঢোকবার মুখে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল ঠোঁট-কাটা অজয়ের সঙ্গে। আশ্চর্য্য হ'য়ে সে বলল: ব্যাপার কী? বৈঠকখানা ছেড়ে হঠাৎ থানার দিকে? আবার ফিল্ড এ নামলে নাকি?

—তুই এদিকে?

—এসেছিলাম বারোয়ারীর চাঁদা আদায় করতে। ব্যাটা দেবনাথ ভৌমিকের আক্কেলটা শোন একবার: চিরকাল দশটাকা ক'রে

দিয়ে এসেছে; এ বছর আমরা বেরিয়ে গিয়ে আলাদা একটা করেছি; তা হাফাহাফি কর্ টাকাটা! তা নয়, স্রেফ্ না বলে দিলে!

সত্যব্রত হাসল। বলল: বড্ড অন্যায়, আচ্ছা চলি।

—আহা, যাচ্ছো কোথায়, শুনি না?

—থানায়। বিন্দাকে পুলিশে ধরেছে!

—পাগলাটাকে পুলিশে ধরেছে? কী করেছে ও?

সত্যব্রত ঘটনাটা বলল। শুনে অজয় আবার বলল: তা না হয় বুঝলাম! কিন্তু, তুমি হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লে যে? এতদিন এত করে বললুম, এসো একবার আমাদের ওখানে, গ্রাহ্যই করলে না! আর, আজ কোথাকার কে বিন্দা,—তার জন্যে মাথা খারাপ করছো?

সত্যব্রত এবার সোজা তাকাল অজয়ের মুখের দিকে। তারপর বলল: মাথা খারাপ করছি তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে! সকলেই যদি তোমাদের মতো মূল্যবান মাথার অধিকারী হ'য়ে পড়ে, তাহলে, তোমরাই যে শেষ পর্য্যন্ত বেকার হ'য়ে পড়বে!

—তার মানে? অজয় একটু ভড়্কে গিয়ে বলল: কী বললে আবার বলো তো! যেন একটা খোঁচা দিলে মনে হ'চ্ছে!

—খোঁচা দোব কেন। সত্যব্রত একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল: বলছি, কোথাকার কে বিন্দার জন্যে কোথাকার কে নিথর ঠাকরুণ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে,—তাই ঘাব্ড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়লুম! না হলে, একদিন হয়তো তোরাই বলবি, সতুদার মাথার দাম্ নিথর ঠাকরুণের চাইতেও কম দামী ছিল।

—তুমি অকারণ চটছো সতুদা! অজয় ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলল: আমি বলছিলাম কি,—তুমি নিজে না বেরিয়ে, আমাদেরকে একটা খবর দিলেই তো পারতে!

—কী সর্ব্বনাশ!—সত্যব্রত চোখ বড় বড় ক'রে বলল দুনিয়ার সর্ব্বহারাদের চিন্তায় যাদের মুহূর্ত্তের অবসর নেই,—জীবন কালি করে ফেললে ভেবে ভেবে,—তাদেরকে আমি ডাকবো দুনিয়ার দায়িত্ব ছেড়ে পাশের বাড়ীর বিপদে মাথা গলাতে? আমাকে এমনই অর্ব্বাচীন ঠাওরালি তোরা?—আচ্ছা চলি ভাই—

থানায় গিয়ে ও-সির খোঁজ করতে ছোট দারোগা বললেন: তিনি এখন ওপরে, দেখা হ'বে না!

সত্যব্রত বলল: আপনি খবর পাঠান, গড়বাড়ীর বড় তরফ এক্ষুনি দেখা করতে চান—

—এখন out of the question, আপনার দরকার আমাকে বলে যেতে পারেন!

পেছনে হঠাৎ গলা ঝাড়ার শব্দ হ'লো। দারোগা মুখ তুলে বললেন: অজয় বাবু যে! কী মনে করে? রায় বাহাদুর পাঠিয়েছেন নাকি? বসুন—

অজয় বসল না। বলল: আজ্ঞে না স্যার,—এসেছিলাম একটা অন্য কাজে—

—এখন বড় ব্যস্ত—বসুন একটু—

অজয় তবুও বসল না। সত্যব্রতর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলল: এঁকে চেনেন না বোধহয়?

—না।

—কিন্তু, এঁর পিতামহর কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন! আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বার্ণি সাহেবকে একদিন ল্যাংটো ক'রে, থামে বেঁধে চাব্‌কে দিয়েছিলেন,—বেয়াড়াপনা করার জন্যে!

—বটে! দারোগা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন; কিন্তু, মুখ তুললেন না।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে, অগত্যা, অজয় কাজের কথা পাড়ল: একটা জামিনের জন্যে ইনি এসেছিলেন—

—কিসের জামীন?

—চালের ব্যাপার স্যার!

—Out of the question—

—একটু অনুগ্রহ যদি করেন। এবার সত্যব্রত বলল: Victimকে যদি একবার দেখে যেতে দেন!

দারোগা এইবার ফাইল থেকে মুখ তুললেন। তারপর সত্যব্রতর আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন: কী নাম?

—বিনোদ রায়, সাকিম গড়বাড়ী—

দারোগা আর একটা খাতা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলের; হঠাৎ আবার মুখ তুলে বললেন: আপনার নামটা কী যেন বললেন?

—সত্যব্রত রায়;

—আপনি—দারোগা এবার খাড়া হ'য়ে বসলেন। বললেন: আপনিই কি সতুবাবু? পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট···?

—ছিলাম।

—বুঝেছি, আসুন।

বিনুদার মুখের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর অম্লরসাত্মক নীরব হাসি আর গা জ্বালানো বাক্যবাণ! কিন্তু, সমস্ত দিনের হাজত-বাসের ফলে সে সব একেবারে অন্যরকম হ'য়ে গিয়েছিল। সত্যব্রতর প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাও কইতে পারলেন না তিনি; শুধু, চেয়ে রইলেন উদভ্রান্তের মতো!

সত্যব্রত সন্দিগ্ধ হ'য়ে বলল: আমাদের চিনতে পারছো না বিনুদা?

এবার একটা ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল: আমার নারায়ণ....

সত্যব্রত দারোগার দিকে তাকাল: কী ব্যাপার!

দারোগা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন। বললেন: আমরা চাল পেয়েছি; কিন্তু সেই নুড়িটা বোধ হয় কোথাও পড়ে দিয়েছে ধাক্কাধাক্কিতে।

—কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া চাই-ই!—সত্যব্রত নীরস গলায় বলল: না হ'লে এ ব্রাহ্মণ উন্মাদ হ'য়ে যাবে—

—আর জামীন? অজয় মনে করিয়ে দিল কথাটা: ডেকে আনবো নগেন উকীলকে?

—উকীল-মোক্তারের কম্ম নয়! দারোগা সত্যব্রতর উদ্দেশে বললেন: ওঁকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির হ'তেই হ'বে। বিশ্বাস করুন সতুবাবু, এ ব্যাপারে কিছু করবার নেই আমাদের। ইচ্ছে করলে, আমাদের খাতাপত্র দেখতে পারেন: পূজারী বামুন

সেজে চালের কারবার করতে গিয়ে প্রতিদিন ধরা পড়ছে কত লোক! দুনিয়ার সকলে আমাদের শাপ-শাপান্তর করছে; আড়ালে হারামজাদা ছাড়া কেউ কথা কয় না। অথচ, ওপরওয়ালারা নির্ব্বিকার। ক্রমাগত Stricture ছাড়ছেন! আমরা তো মরে গেলুম মশাই! এই আপনার কেস্‌টাই দেখুন,—লোকটা সমস্ত দিন জলস্পর্শ করেনি! ভুল হ'য়েছে বুঝতে পারছি! অথচ Immediately সংশোধনের কোন উপায় নেই। আমাকে ভুল বুঝবেন না···

সত্যব্রত বলল: আমি জানি মিষ্টার অফিসার। আমি বহুকাল পুলিশের অতিথি ছিলাম। দেখেছি তাদের অসহায় অবস্থা। জানি, কেন তারা মেশিন হয়ে যায় মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে—

বাইরে এসে অজয় বলল: রমেশ দারোগাটা এখনও ঘোড়েল হ'য়ে উঠতে পারেনি; অল্পদিন ঢুকেছে কি না এ লাইনে—

সত্যব্রত অন্য কথা ভাবছিল। বলল: তুই যে বড় বারোয়ারী ছেড়ে এইখানেই রয়ে গেলি?

কথাটা অজয় যেন শুনতেই পেল না; ঘড়ি দেখে বলল: এদিকে তো রাত প্রায় সাড়ে আটটা। কী করবে ঠাণ্ডরালে? আদালত মানে তো আসছে কাল বেলা তিনটে-চারটে—

সত্যব্রত বলল: বিন্দাকে আজই বাড়ী নিয়ে যাব। কিন্তু, নারায়ণের কী হবে? তুই যোগাড় করতে পারবি একটা?

—নারায়ণ তো পরের কথা, আপাততঃ মানুষটার কী করবে তুমি, তাই বলো না?

—এক্ষুণি আমি রঘু বাঁড়ুজ্জের কাছে যাব।

অজয় একবার হাঁ করল। তারপর বলল: ওঃ সতুদা, সাধে কি তোমাকে আমরা লীডার করেছিলাম! আমিও শুনেছি, জেলা হাকিম আগে যেমনি গরু খেতো এখন তেমনি গীতা পড়ে।

—চল্, একটা রিক্সা করি।

—রিক্সা কী হবে? বাস-এ চলো না? অকারণ টাকা ফেড়েক্—

—অকারণ নয়, কারণ আছে। চল্—

ষ্ট্যাণ্ডে এসে অজয় বলল: দাঁড়াও, আগে দেখি কানাই মিত্তিরকে পাওয়া যায় কি না! বেচারা আই, এ, পাশ করে রিক্স। পুলার হয়েছে; হেল্প্ করা উচিত।

কানাইকে পাওয়া গেল না; কিন্তু, ওদের দেখেই একজন বিহারী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সত্যব্রতকে নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে বলল: ম্যালিক কি গাড়ী খুঁজছেন?

বিনয়ের আতিশয্য দেখে সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি আমাকে চেন নাকি?

—মালিককে এ মল্লুকে না চেনে কে? লোকটা বিগলিত হাস্যে বলল: আমি হচ্ছি বিরিজলাল হুজুর! একটানা তিন বর্‌স রাজবাড়ীর নিমক খেয়েছি আমি—

অর্থাৎ এক সময়ে সে সত্যব্রতদের বাড়ীতে চাকরী করেছিল। সুতরাং তারই গাড়ীতে চড়তে হ'লো! বলল: ওতোরপাড়ার দিকে চলো।

—একেবারে উল্টো রাস্তায়? অজয় তিড়বিড়িয়ে উঠল। বলল: ক্ষেপে গেলে নাকি?

—আঃ কেন বক্ বক্ করছিস? একটু ভাবতে দে না আমাকে।

অজয় মিনিট পাঁচেক চুপ ক'রে রইল। তারপর আবার আরম্ভ করল: রঘু বাঁড়ুজ্জে গীতা পাঠ ক'রে বটে, কিন্তু, মেজাজটা বড় সাহেবী। যদি চাপরাসি লেলিয়ে দেয়?

সত্যব্রত কোন উত্তর দিল না। কিন্তু অজয়ের পক্ষেও বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকা যেন সহ্য হচ্ছিল না! কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে!

কিসের অস্বস্তি কে জানে! মাঝখানের বছর পাঁচেকের ইতিহাস ধোঁয়াটে হ'য়ে গিয়ে কেবলি তার মনে পড়ে যাচ্ছিল আগেকার দিনের কথা, যখন, সে ঠোঁট-কাটা হিসাবে অখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল;—অপ্রিয় ভাষণের জন্য ক্রমাগত ধম্‌কানি খেত সতুদার কাছে! সামলাতে না পেরে, শেষে, সে বিরিজকে নিয়ে পড়ল: কিধার্ মুল্লুক ভাই? ছেলে-মেয়ে ক'টি?

আনুসঙ্গিক সেরে, শেষে সে আসল কথা পাড়ল: শীকারপুর শ্রমিক-সঙ্ঘ তো দু'ভাগ হ'য়ে গেছে। এখন তোমাদের ইউনিয়নের কর্ত্তা হ'লো কে? রমনদাস না প্রশান্ত?

বিরিজ বলল: নিমকহারামী করতে মন নারাজ হয় মালিক। শুরুসে রমনদাস বাবুই তো লীডার ছিল, পিছে এলো পরশান্তবাবু। মগর্ ইউনিয়নকে লিয়ে জান দিল কোন? রামজী কো কির্পা। মেম সাহাব আ গইল; খুদ্ পকিট সে ডাক্‌দার ঔর দাওয়াই

মাঙ্গালো; নেহি তো রমণদাসবাবু তো খতম হো গিয়া থা। মগর্ কিসি কো লিয়ে? হাম্‌লোগ্‌ কো লিয়ে।

—ওঃ তোমরা তাহলে রমণদাসকেই ধরে আছো?

—রামজী জানে! মগর্ ইস্ লিয়ে বহুৎ গড়বড় হোতো মালিক! কাহাই মিস্ত্রিরকো লীডার বনাকর বাঙ্গালী পুলার সবকোই পরশান্ত্‌বাবুকো সাথ্ দোস্তি মাঙ্গতে হেঁ। মগর্ রামজী জানে, পরশান্তবাবুকো সব কুচ দরদ জুট মিলকা মজদুর লোক কো লিয়ে।

—এখন বাঙ্গালী পুলার ক'জন আছে?

—কম্‌সে কম বারো চৌদ্দ আদমী হোবে।

—তবে আর কী! ভোটে তোমরা জিতে যাবে।

—রামজীকো কিরপা—

রিক্সা এসে লায়ন সাহেবের বাঙলোয় ঢুকলো! অজয়কে বাইরে রেখে সত্যব্রত ভেতরে গেল এত্তেলা পাঠিয়ে।

সাহেব তাঁর ষ্ট্যাডিতে বসে মদ্যপান করছিলেন; রাত সাড়ে ন'টার সময়ে সত্যব্রতকে হন্তদন্ত হ'য়ে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য্য হলেন কি আনন্দিত হ'লেন ঠিক বোঝা গেল না। বললেন: এসো, বসো। বর্ষণ করো তোমার বাক্যবান, আমি প্রস্তুত।

—তার মানে? সত্যব্রত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

সাহেবও বিস্মিত হলেন। বললেন: তুমি কি আমাকে ধমকাতে আসোনি?

—ধমকাবো কেন? কী করেছো তুমি?

—সে কি? তুমি ওদিক্‌'কার কোন খবর রাখ না?

—না, কী করেছো তুমি?

—করেছি পর্ব্বত প্রমাণ ভুল,—তোমাদের মহাত্মাজী যাকে বলেন, Himalayan Blunder,—সাহেব সবিস্তারে উড়ো চিঠির ব্যাপারটা বললেন।

শুনে সত্যব্রতও তার আসল কাজের কথা ভুলে গিয়ে চেপে বসল।

—ভুল আমি হয়তো করেছি—সাহেব বললেন: কিন্তু, মেনে নিতে পারছিনা। সেদিন লাইব্রেরীতে বসে তোমরা যে রকম কথা কাটাকাটি করলে, শুনে, আমার কেবলি মনে পড়ে যাচ্ছিল নিজের যৌবনে কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—করুণা is in love with you and not with দীপক চৌধুরী। ওয়েল সতু, why don't you marry her? অবশ্য, আমি যুক্তিবাদী হিসাবেই কথা কইছি; materially it is up to you and করুণা।

সত্যব্রত বিমূঢ়ভাবে বলল: তার বাবা রাজি হবে কেন?

—It is simply horrible—সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন: অদ্ভুত; তোমাদের দেশের এই সব man-made বাধা-বিপত্তি, কেচ্ছা-কুসংস্কার। তু'জন সাবালক তরুণ-তরুণী পরস্পরকে ভালবাসে, এর মধ্যে বাবা আসে কোথেকে? করুণা ভালবাসলেই তো যথেষ্ট—

—তুমি তার মনের কথা জানতে পেরেছ নাকি?

—পেরেছি বৈকি! অভিজ্ঞ মনো-বিজ্ঞানীর মতো মাথা নেড়ে

নেড়ে সাহেব বললেন: সেদিন তোমার বাড়ী থেকে ফেরবার পথে লক্ষ্য করলাম, মেয়েটা যেন বড্ড বেশী কথা কইছে! যেন বড্ড চঞ্চল! Why? করুণা আসলে স্বল্পবাক্, গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। তবে? তাহলে? সন্দেহ আমার পূর্ব্বেই হয়েছিল; তাই এক ফাঁকে তোমার কথা পাড়লুম। বললুম: He is a grand fellow—ইচ্ছে করলে, সতু অনেক কিছুই করতে পারে।

করুণা তক্ষুনি বললে: ঘোড়ার ডিম—

আমি বললুম: কেন, যেমন রূপ তেমনি গুণ!

করুণা বললে: হ্যাঁ, একেবারে বুনো মোষের মতো—

সত্যব্রত চম্‌কে উঠল: আমাকে বুনো মোষ বানিয়ে দিলে?

—দিলে বৈকি! কিন্তু, অনুপ্রাসটার আন্তরিক ভাবার্থ কী?

—আন্তরিক ভাবার্থ?

—হ্যাঁ। আমাদের প্রথম সম্রাটকে তাঁর সৈন্যরা Little corporal বল্‌তো। কিন্তু কিসের জন্যে বলতো? আন্তরিক ভালবাসার জন্যে, না অশ্রদ্ধার জন্যে?—অবশ্য, আমি যুক্তিবাদী হিসাবেই এই আলোচনা করছি—

আমাদের প্রথম সম্রাট্ কথাটা খট্ করে সত্যব্রতের কানে লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করল: প্রথম নেপোলিয়ঁর কথা বলছো?

—হ্যাঁ। তুমিই বল না সৈন্যরা তাঁকে···

—আঙ্কল লায়ন! বাধা দিয়ে সত্যব্রত বলল: ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ঁ একজন আমেরিক্যানের সম্রাট হয় কী করে?

সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেলেন।

—উত্তর দাও আঙ্কল।

সাহেব মুষ্‌ড়ে পড়ে বললেন: তোমার অত খোঁজে দরকার কী?

—দরকার আছে। বলো আঙ্কল—

—আসলে আমি একজন ফরাসী! সাহেব অগত্যা বললেন: তৃতীয় সম্রাটের পতনের পর আমার বাবা আমেরিকার নাগরিক হয়েছিলেন।

সত্যব্রত উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল: তাহলে তো তুমি লায়ন হ'তে পারোনা আঙ্কল।

সাহেবের মুখ এবার শুখিয়ে গেল, বললেন: লায়ন হতে পারি না?

সত্যব্রত আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল: কিছুতেই নয়। তোমাকে যতই দেখেছি, ততই সন্দেহ হয়েছে,—এ চরিত্র কিছুতেই ইয়াঙ্কীর হতে পারে না। Now, Uncle Lion, being a ফরাসী তুমি নিশ্চয়ই জান, প্রথম সম্রাট তাঁর এক ছেলেকে নিজের নামের আধখানা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন?

—আঃ সতু—সাহেব এবার বিরক্ত হলেন।—এ যেন সে লায়ন সাহেব নয়, অন্য কেউ; রীতিমত ধমক দিয়ে তিনি বললেন: কী পাগলামী আরম্ভ করলে তুমি?

সত্যব্রত গ্রাহ্য করল না। একটা অদ্ভুত আবিষ্কারের উন্মাদনায় সে যেন তখন স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়েছিল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠল: Your Imperial Highness, আমি যে ভাবতেই পারছি না আঙ্কল, তুমি সেই লীয়নের বংশধর। তোমার শরীরে বইছে নেপোলিয়ঁর রক্ত…

—আঃ সতু! সাহেব ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন: তোমার মতো লোকের এ ছেলেমানুষী মানায় না। বাইরের কেউ যদি শুনে ফেলে, কী ভাববে বল তো? ভাববে, Iron man সতু, বিপ্লবী সতু, নাটকের মহলা দিচ্ছে! ভাবতো কী লজ্জার কথা?

সত্যব্রতও লজ্জিত হয়ে পড়ল।—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কী যে হয়ে গেল; চোখে জল পর্য্যন্ত এসে গেছে। বলল: তুমিই তো দিলে মাথা খারাপ করে! এমন্ রসান দিয়ে করুণার কথা আরম্ভ করলে যে আমার সব গুলিয়ে গেল।

—তার মানে? করুণারও দুর্ব্বলতা আছে নাকি নেপোলিয়ঁ সম্বন্ধে?

—করুণাই তো আমাকে প্রথম পড়িয়েছিল নেপোলিয়ঁ। ছোট বেলায় ওদের বাড়ীতে একটা কোঁদোমারী নেপোলিয়ঁ ছিল; বসুমতীর publication,—আমরা দু'জনে বইখানা মুখস্ত করে ফেলেছিলাম। জোশেফিন্-এর দুঃখে কত কাঁদতুম। দু'জনে কত স্বপ্ন দেখতুম সেদিনকার ফ্রান্সকে। সুখে-দুঃখের সঙ্গী হ'য়ে দু'জনেই বেড়িয়ে বেড়াতাম সম্রাটের সঙ্গে অষ্টারলীজ. ওয়াগ্রামের রণক্ষেত্রে, এল্‌বা সেন্ট হেলেনার অন্ধকূপে। তারপর—

—তারপর?

—সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

উচ্ছ্বাসে হঠাৎ বাধা পড়ল। খিদমদ্‌গার এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল: বাইরে এক বাবু বড্ড গোলমাল করছে।

—ইস্! আসল কথাটাই ভুলে গেছি। সত্যব্রত উঠে পড়ে

বলল: তোমাকে যে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে আমাদের সঙ্গে, ভীষণ ব্যাপার হয়েছে।

—কী হয়েছে?

সত্যব্রত বিনুদা-ঘটিত ব্যাপারটা বলে, নিজের মৎলবের কথাটাও বলল।

শুনে, সাহেব মিনিট খানেক আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। তার পর বললেন: করুণা তোমাকে হুকুম করেছে? এই ব্রাহ্মণ তোমাদের দু'জনেরই শ্রদ্ধার পাত্র?

—নিশ্চয়ই।

—চলো তাহলে। কিন্তু তোমার কার্য্যোদ্ধার হবে কী! তোমাদের হাকীম সাহেব আমাকে খাতির করেন বটে; কিন্তু, খাতির রাখবেন কী! চলো দেখি—

বাইরে আসতেই অজয় হুঙ্কার ছাড়াল: আমাকে এই রাম মশার মুখে রেখে, তুমি কি না—

—তুমিও তো বৎস আমার পরিচিত! পিছন থেকে সাহেব এসে অজয়ের কাঁধে হাত দিলেন। বললেন: ভেতরে যাওনি কেন? এখন এসো—

সাহেব এগিয়ে যেতেই অজয় খপ করে সত্যব্রতর পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল। বলল: ওফ্ সতুদা! তুমি মাইরি জিনিয়াস্! খাঁটি সাহেব দেখলে, কোন ব্যাটা নকল আর না করবে! কার্য্যোদ্ধার নিঃসন্দেহ—

রিক্‌সাকে বিদায় দিয়ে সকলে সাহেবের গাড়ীতে উঠে বসল।

উনিশ

কার্যোদ্ধার ক'রে বাড়ী ফিরতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সত্যব্রতর ইচ্ছা ছিল, একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমের অভাবটা পুষিয়ে নেবে; কিন্তু হলোনা। অজয় এসে হাঁক ডাক শুরু করে দিল।

বেশ বিরক্ত হয়ে, বাসি মুখেই নীচে নেমে এল সে। কিন্তু, অজয়ের চেহারা দেখে বিরক্তি তার লোপ পেল। দেখল, সদ্যস্নাত, খালি পা, গলায় পৈতে, পরণে উত্তরীয় থান এবং হাতে,—বিন্‌দার সেই সিংহাসন শালগ্রাম শিলা সমেত বাগিয়ে ধরে অজয় পায়চারা করছে। অধিকন্তু, সঙ্গে এনেছে আবার একটি ক্ষুদ্র দল।

—এরই মধ্যে ওটা জোগাড় করলি কী করে? সত্যব্রত উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল: কার সর্ব্বনাশ করে এলি?

—ওই তোমার বড় দোষ সতুদা! অজয় ব্যাজার হয়ে বলল: detail-এ যেতে চাও কেন?

—তার ওপর গুলি-সুতোর পৈতে করেছিস কেন? সত্যব্রত বলল: বিনদার মুখের সামনে দাঁড়াতে পারবি?

এইবার অপ্রস্তুত হলো অজয়। বলল: দাও না একটা পুরোণ পৈতে জোগাড়্ করে! আমারটা যে খুঁজে পেলুম না তাড়াতাড়িতে।

—যা ভাগ্ এখন এখান থেকে। সত্যব্রত হাসি চেপে বলল: কিন্তু বিন্‌দা যেন দেখতে না পায় পৈতে।

—তুমি যাবে না?

—আমার এখনও বাসি মুখে জল দেওয়া হয়নি! তোরা এগো—

—তুমিও এসো কিন্তু তাড়াতাড়ি—বলে, অজয় সদলবলে প্রস্থান করল।

পাগলার দল কোন একটা অজুহাত পেলে হয়। ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই সত্যব্রত কলঘরে গিয়ে ঢুকল। মনে মনে একটা অদ্ভুত স্বস্তিবোধ করছিল সে। গতরাত্রের পরিশ্রম, উপবাস, রাত্রি জাগরণের অবসাদ প্রভৃতি সব কিছু ভুলে গিয়ে, সানন্দে গুন গুন করে উঠল সে। কিন্তু মেয়াদটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। আবার একটা গোলমাল শোনা গেল নীচে। এবারকার আওয়াজটা নিথর ঠাকরুণের।

—কী হয়েছে?

—বুড়ো বয়সে আমার এ কী কলঙ্ক বাবা! নিথর ঠাকুরুণ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল: বুড়ো বামুন জেলে পচ্‌বে, তাই না আমি ছুটোছুটি করেছিনু; কিন্তু, তার জন্যে আমার এই কলঙ্ক শুনতে হলো? আমি বিনু বামুনের দরদী, তার দুঃখে আমার বুক ফাটে!

ছিদ্রান্বেষীরা সারা রাত ওৎ পেতে ছিল নাকি! সত্যব্রত উগ্রস্বরে বলল: কে বলেছে এ কথা?

—কে না বলছে বলো! ঢি ঢি পড়ে গেছে—

—তুমি কার কাছে শুনলে, তাই বলো না? সত্যব্রত ধমকে উঠল।

—মোনা মুকুজ্জের ইস্তিরী, দেবা ঘোষের বোন, নব্‌নে পালুধীর শালী—ঘাটে বাসি-পাট সারতে এসে শুনিয়ে দিয়ে গেল: আমরা তো ভেবেছিনু, বামুনের যখন কেউ নেই, তখন ও নির্ঘাৎ জেলে পচেই মরবে। ওমা! তখন কি জানি, ওর জন্যে তোর

এত দরদ! তুই বুক দিয়ে গিয়ে পড়বি! সে যে কত অসৈরণের কথা বললে বাবা—তুমি ছেলের বয়সী—কী আর বলবো তোমাকে!

—শুনে তুমি কী করলে?

—কী আর করবো বাবা! কেঁদে ভগমান্‌কে ডাকনু—

—কেন, পায়ে জুতো ছিল না?—সত্যব্রত সামলে নিয়ে বলল: জুতো না থাক্, বাড়ীতে চ্যালাকাঠ ছিল না?

—তুমি এই কথা বলছো বাবা?—নিথর ঠাকরুণ যেন একটু আশান্বিত হলো।

—হ্যাঁ আমি বলছি। তুমি এখন এসো।

দুত্তোর! মনটা আবার খিঁচ্‌ড়ে গেল সত্যব্রতর। সে বাইরে যাওয়া স্থগিত রেখে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল কাগজ নিয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ টিঁক্‌তে পারল না। বিন্‌দার খবরটা একবার নেওয়া দরকার, অজয়টা হয়তো তার জন্যে অপেক্ষা করছে সেখানে। তা ছাড়া, আরও একটা খবরের জন্যেও ঔৎসুক্য জাগছিল তার মনে। গতরাত্রের ব্যাপারটা শুনে করুণা কি ভাবছে! একবার দেখা করা যায়না তার সঙ্গে! আপাততঃ বিকাশটাকে পেলেও কাজ হ'ত। কিন্তু, তাকেই বা পাওয়া যায় কোথায়!

সত্যব্রত উঠল। কিন্তু, আবার বাধা পড়ল। পিয়ন এসে ঢুকল—রেজিষ্ট্রী চিঠি আছে।

ইংরিজি চিঠি। আসছে দিল্লীর কনোট প্লেস থেকে। লিখছে কমরেড প্রভাতীর দাদা বাদল সেন: প্রধান মন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সে প্রবীরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, তারই কাছে শুনলাম, তুমি বাড়ী

ফিরেছো! আশাকরি বর্ত্তমানে তুমি কুশলেই আছ। দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সুতরাং অকস্মাৎ আমার এই পত্র পেয়ে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হবে। কিন্তু কী করবো ভাই, দাসত্বের শৃঙ্খলে এমনি জড়িয়ে পড়েছি যে,··· (ইত্যাদি ইত্যাদি) বলা বাহুল্য বিশেষভাবে, তোমাকেই এই পত্র লেখবার তাৎপর্য্য এই যে, আপাততঃ আর কোন বাল্য-বন্ধুর কথা মনে পড়ছেনা—যার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। যাই হোক, এইবার আসল কথাটা বলি: কয়েকদিন পূর্ব্বে শীকারপুর নিবাসী জনৈক আত্মগোপন প্রয়াসী ভদ্রলোক আমাকে একখানি চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা প্রভাতীর কেচ্ছায় ভর্ত্তি। সে নাকি ওখানে গিয়ে রমনদা নামক এক লোফারের প্রেমে পড়েছে। এই লোফারটার জন্যে প্রভাতী জলের মতো টাকা খরচ করছে। টাকাটা সে সংগ্রহ করেছে নাকি পৈতৃক যথাসর্ব্বস্ব বক্রী করে, এবং তার মধ্যে থেকে বাবার লাইব্রেরীটা কিনেছে নাকি তোমারই এক ভাই সুব্রত চৌধুরী। যতদূর মনে পড়ে তোমাদের ইনি সেজ সরীক এবং ইনি আবাল্য মাতুলালয়েই থাকতেন। এঁর সঙ্গে আমার কখনও আলাপের সুযোগ ঘটেনি; তাই তাঁর পরিবর্ত্তে তোমাকে লিখছি,—কথাটা সত্যি কিনা জানাবে। যদি সত্যি হয়, তাহলে, ঘরোয়া মীমাংসার দ্বারা তোমার পক্ষে এই সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারটা নাকচ হতে পারে কি না! তুমি বোধ হয় জাননা, শীকারপুরে যা কিছু পৈতৃক স্থাবর-অস্থাবর আছে, তার আইন-সঙ্গত একমাত্র মালিক আমি। প্রভাতীর জন্য বাবা রেখে গিয়েছিলে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। সে

টাকা সে উড়িয়ে দিয়েছে বার দুয়েক বিলেত যাওয়া প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যাপারে। কিন্তু এখন সে যদি আবার আমার সম্পত্তি নষ্ট করবার চেষ্টা করে, তাহলে আমার পক্ষে তা' সহ্য করা সম্ভবপর হবে না; কারণ আমারও সংসার আছে। কিন্তু তার আগে জানা দরকার, এই উড়ো চিঠির কথাগুলো কতখানি সত্য বা আদৌ সত্য কিনা! এই সন্দেহের বশীভূত হয়েই আমি, প্রভাতীর পরিবর্ত্তে, তোমাকে পত্র লিখছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে: ছোট বেলা থেকেই মেয়েটা ভাব-প্রবণ! এই দুর্ব্বলতাটা তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে ক্রমশঃ। শুনলে আশ্চর্য্য হবে,—এখানকার একজন আই-সি-এস-কে সে ভালবেসেই বিবাহ করেছিল; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই mutual understanding-এ বিবাহ-বিচ্ছেদ করে বসল, পলিটিক্যাল মতদ্বৈততার অজুহাতে! এমনই ঠুকনো ওর আত্মসম্মান জ্ঞান যে, আমি এই ডিভোর্সের বিপক্ষে ছিলাম বলে, সে আমার বাড়ী ত্যাগ করে, ওদের পার্টি-অফিসে গিয়ে আস্তানা গাড়ল। দেখা হলে কথা কইতেও নারাজ হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছো, তার মনে ব্যথা দেবার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, উড়ো চিঠিটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পত্র-লেখক যে লোফারের কথা লিখেছেন, তার ওপর কোন গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। প্রভাতীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামানো আমি অনধিকার চর্চ্চা বলেই মনে করি। তা'ছাড়া প্রজাতন্ত্রী দেশের ইতিহাসে দেখা যায়, আজ যে লোফার, আগামী কাল সে দেশের সর্ব্বাধিনায়ক হয়েছে। সুতরাং ওসবের জন্য আমার বিন্দুমাত্রও

দুশ্চিন্তা নেই। প্রভাতী যদি আবার কাউকে ভালবেসে ঘর বাঁধে —ভালই। তবে, এবারকার বিবাহটা যদি সে হিন্দুমতে ক'রে, তাহলে, ভবিষ্যতে, বিবাহ-বিচ্ছেদের উৎকণ্ঠা থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। বোকা মেয়েটা তো এখন এ কথা বুঝতে চাইবে না, যে, চল্লিশ বছরের পর তার দেহ-যৌবনের মূল্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! যাই হোক ভাই, আমার আসল দুশ্চিন্তা পৈত্রিক সম্পত্তির জন্যে। অবশ্য আমার বিমাতা যতদিন জীবিতা থাকবেন ততদিন সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু হস্তান্তরের অধিকার তাঁর বা তাঁর কন্যার নেই, কারণ, আসল মালিক হচ্ছি আমি।...

আবার উড়োচিঠি!

সত্যব্রত গতরাত্রেও একটা উড়োচিঠির কথা শুনে এসেছিল আঙ্কল-এর কাছ থেকে। কিন্তু, ভেবে পেল না, কে এই শুভানুধ্যায়ী, যার প্রাণ একই সঙ্গে করুণা এবং প্রভাতীর জন্য দুঃখে-দরদে আকুল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া—

প্রভাতীর ব্যাপারটাই বা কী! তারই পয়সায় রমণদাস মরতে মরতে বেঁচে উঠেছে, এ খবরটা সত্যি! এ কথা শুনেছে সে খোদ নীরু ডাক্তারের মুখ থেকে। কিন্তু প্রেম?—এতবড় একটা ঘটনা সত্যি হলে, পাড়ার লোকে কি আর ছেড়ে কথা কইতো! কে জানে—

যাই হোক, বাদল যখন চিঠি লিখেছে, তখন এ সম্বন্ধে সুব্রতরই

সঙ্গে কিছু আলোচনা করা দরকার। কিন্তু, সে-ও যে আঙ্কা। কখন বাড়ী আসে আর কখন বেরিয়ে যায়, জানতেই পারা যায়না। যাক্‌গে—বেলার দিকে তাকিয়ে, বাইরে বেরুনো আর হ'ল না; স্নানাহার সেরে সত্যব্রত টানা একটা ঘুম দিল।

বিকেলে, কোলকাতা থেকে এল মেজ সস্ত্রীক বাণীব্রত সপরিবারে। ফলে, বেরুনো হলোনা। পরদিন সকালে সে চলল বিন্‌দার খোঁজ নিতে—

মাঝপথে দেখা হলো অজয়ের দলের সঙ্গে।

এ পাড়ার জুনিয়ার ব্যাচ্‌ এরা। কবির ভাষায় বলতে গেলে, এরাই হচ্ছে সেই অরুণ প্রাতের তরুণদল! কোলকাতার কেরাণী manufacturing institution প্রদত্ত লেজুড় না থাকার জন্য এরা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে বৃথা সময় নষ্ট করেনা। কিন্তু, হৃদয় এদের সমুদ্রের মতই অতলস্পর্শী—কূল-কিনারাহীন। ছোটখাট ব্যাপার এদের নজরেই পড়েনা; অবিরতই এরা ধাবমান বৃহত্তর-মহত্তরর প্রতি। তাই, নিজের বাপ-মার প্রতি এরা যেমনি উদাসীন তেমনি সহানুভূতিশীল পাড়া-প্রতিবেশীর ওপর। বিশেষতঃ, পাড়াতুতো দিদি-বৌদির অনেকরই ভরসাস্থল এরা। কারণ, চাঁদের মতো মুখ করে, এমন চমৎকারভাবে বেগার খাটতে তাঁদের নিজেদের বাড়ীর ছেলেরা সাধারণত রাজি হয়না। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে সত্যব্রত এদের দেখে গিয়েছিল নীল পোষাকপরা এ-আর-পি সেবকরূপে; ফিরে এসে দেখল, কমরেড্‌ প্রভাতীর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে লাল হয়ে নেশার পরিমাণটা এরা বাড়িয়ে ফেলেছিল। বিড়ির বদলে ধরেছিল সিগারেট;

দু' বাটি হাফ-কাপের জায়গায় ফুল কাপ চালিয়েছিল ছ' থেকে আট বাটির উপর! বর্ত্তমানে, যুদ্ধ নেই, কিন্তু নেশাটা ঠিক বজায় আছে। কি করে যে খরচা জোটে কে জানে! জানবার দরকারও মনে করেনি সে কখনও। কিন্তু…

চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বেও যাদের সম্বন্ধে এই ছিল তার ধারণা; যারা ছিল তার একান্ত অবজ্ঞার পাত্র, আজ তাদেরই সঙ্গে সে আলাপ করল উপযাচক হয়ে। সহাস্যে বলল: কী হে, তোমাদের অজয় কোথায়?

—সেই কথাই তো বলতে আসছিলাম আপনাকে। সুশীল এগিয়ে এসে বলল: রায় বাহাদুর এসেছিলেন। বিনুদাকে গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে গেলেন ত্রিবেণীতে। বিনুদা আবার অজয়দাকেও সঙ্গে নিলেন—

—ত্রিবেণীতে? রায় বাহাদুর নিয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ। নারায়ণ নর্দ্দমায় পড়ে গিয়েছিল কিনা, তাই সব শুদ্ধু হ'তে গেল।

খবরটা অদ্ভুত হলেও, সত্যব্রত খুব আশ্চর্য্য হ'তে পারলনা! শীকারপুরের হবু-গণনেতা বুদ্ধিমান লোক! তাই, গত পরশু যেটাকে তিনি গুরুত্বহীন মনে করেছিলেন, আজ সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝতে পেরেছেন সত্যব্রতর মাথা গলানোর জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ভুল সংশোধনের। চমৎকার—

—আমরা আপনার কাছে আসছিলুম আর একটা দরকারে। সুশীল আবার বলল: ফণীদা, অবনীদা, এঁরা সব একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান্। দুপুরবেলা ডেকে আনবো?

—বেশ তো!

খাওয়া দাওয়ার পর সত্যব্রত ছেলের দল নিয়ে পড়ল। ওদের প্রস্তাবটা আশাতীত না হ'লেও কথঞ্চিৎ ঘোলাটে নিঃসন্দেহ: শীকারপুর শ্রমিক-সঙ্ঘ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে প্রশান্তর ডিক্টেটারী আর রমণদাসের অক্ষমতার জন্যে। আর যে সব পার্টি আছে তাদের সংখ্যা অসংখ্য হ'লেও, সদস্যের সংখ্যা, প্রতি পার্টি খাতে নিতান্তই নগণ্য। এই রকম অবস্থায়, সত্যব্রত যদি নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে, তা'হলে, একটা ভাল পার্টি ভাল ভাবেই গড়ে তোলা যেতে পারে—

—কেন, তোমাদের কমরেড্ প্রভাতীর কী হলো?

—সেই কথাই তো বলছি—ফণী বলল: এখানকার ব্যাপার দেখে ঘেন্না ধরে গেছে তাঁর পলিটিক্স্-এর ওপরে।

—পলিটিক্স্-এ ঘেন্না? কবে ধরল?

—সেই শান্তি সম্মেলনের দিন থেকেই। ডাকাতদের মতো মশাল জ্বেলে, লেনিন্ আর ষ্ট্যালিনের দুখানা প্রকাণ্ড ফটো খাড়া ক'রে, শান্তি-বাহিনীর দল গর্জ্জে উঠল: কংগ্রেসরাজ্ মুর্দ্দাবাদ্। দুনিয়ার মজদুর এক হোক!—কেন, ষ্ট্যালিন-লেনিন্ ছাড়া আর কোন শান্তিদূত জন্মায়নি নাকি কোথাও! কংগ্রেসীরা মুর্দ্দা হলেই দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেমে যাবে! এ সব কী কথা? তুমিই বলোনা?

—তা বটে! কিন্তু, প্রভাতী গেলেও, তোমাদের রায় বাহাদুর হৃদয়গোপাল আছেন?

—তুমি যতই চেষ্টা করোনা সতুদা—ফণী ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল: আমাদেরকে খোঁচা দিতে তুমি পারবে না! এ কথা সত্যি যে,

আমরা সকলেই রায় বাহাদুরের ওখানে যাই। কিন্তু এও সত্যি, তাঁকে আমরা বিশ্বাস করিনা। তাঁর মৎলব বোঝা যার তার কম্মো নয়।

—ওঃ, তিনি বুঝি তোমাদের নিয়েও ল্যাজে খেলেন?

—তা খেলেন বৈকি! সুশীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল: এই প্রশান্তর ব্যাপারটাই ধরুন না। আমরা তো জানতুম, তিনি প্যাদায় পড়েই প্রশান্তকে চাকুরী দিয়েছেন; কিন্তু সেদিন তো দেখলুম, রাত দুপুর পর্য্যন্ত, দরজা বন্ধ ক'রে আলাদা মিটিং হ'লো—

—ও সব কথা রাখ্। সুশীলকে থামিয়ে দিয়ে ফণী সত্যব্রতর উদ্দেশে বলল: এখন তুমিই বলো সতুদা, কিসের জন্যে, কেন, তুমি পলিটিক্স্ ছাড়বে? তোমার grievance-এর কথা বলো, আমরাও দেখি, তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি কি না। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, বর্ত্তমান সভ্যতার গোড়ার কথাটাই হ'চ্ছে পলিটিক্স্। একে এড়িয়ে চলার একমাত্র পরিণাম, বনে গিয়ে বাস করা। হয়তো বলবে—একলা চলো রে! কিন্তু, ভেবে চিন্তে বলো তো, এই আদর্শ প্রচার করবার পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা কতখানি সুদৃঢ় হয়েছিল! গীতার কৃষ্ণ কি মহাভারতের ডিক্‌টেটার ছিলেন না! আমাদের সত্যিকার অবস্থাটা একবার বোঝবার চেষ্টা করো সতুদা! আমাদের লীডার হ'য়ে তুমি সাবেক ফরোয়ার্ড ব্লক গড়বে কি নতুন সুহৃদ্-সঙ্ঘ করবে, আমরা তা জানতে চাইনা। আমরা শুধু বলতে চাই, শীকারপুরের মতো একটা ছোট্ট জায়গায়, পার্টি আর লীডারের সংখ্যা বড্ড বেড়ে গিয়েছে। অনেকে এখনও মুকিয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু তুমি যদি

এগিয়ে আসো, তাহলে, অনেকেই পালাবে। ভাবতো একবার আমাদের অবস্থাটা! যে প্রশান্তকে সকলেই একটা born mischief monger বলে জানে, সে কি না আজ একজন লীডার! ছোট বেলায় যার কাজ ছিল, অন্ধকারে অকারণে সাইনবোর্ড বদল ক'রে দোকানীকে নাজেহাল করা, দেওয়ালে খিস্তি লিখে গেরস্থকে লজ্জায় ফেলা, চলন্ত গাড়ীতে ঢিল ছুঁড়ে প্যাসেঞ্জার জখম করা, সে আজ একজন গণনেতা! সতেরো শ' কুলীর strength দেখিয়ে ক্রমাগত হাতে মাথা কাটছে আমাদের। একবার বেয়ে চেয়ে কি দেখা উচিৎ নয়, ওর strengthটা সত্যি কী? এ ছাড়া, আর একটা সুযোগও আমরা পেতে পারি। রায় বাহাদুর একটা দৈনিক বার করবেন শীগ্গীরই—সেটাও আমাদের কাজে লাগতে পারে।

—রায় বাহাদুর কাগজ বার করছেন নাকি?

—হ্যাঁ, প্রবীরদাকে টেলিগ্রাম করেছেন; তিনি এলেই final হ'বে।

—প্রবীর আসছে নাকি? কবে?

—আগামী কাল সকালে। রায় বাহাদুরের খরচে প্লেন-এ আসছে। কালকে'কার publicity-র ভারও তো তাঁর ওপর—

—কিসের publicity?

—তুমি শোন নি? কাল তো এক বিরাট ব্যাপার করছেন রায় বাহাদুর। রিফিউজী কলোনীতে নেতাজী পাঠশালার উদ্বোধন করতে আসছেন V. I. P.-রা—বিরাট ব্যাপার হ'চ্ছে যে হলুদপুরে!

বটে! হৃদয়গোপালের ব্যাপার ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সত্যব্রতর মনে পড়ে গেল—বুড়ী গঙ্গায় মাছ ধরার একটা দৃশ্য।…সে জালের বাঁধন থেকে ছোট-বড় কেউই নিস্তার পায় না!

ফণী আবার বলল: আমাদের কথাটা তুমি একটু ভেবে দেখবে না সতুদা?

—দেখব। কিন্তু, বড় কাজে হাত দেবার পূর্ব্বে দু' একটা ছোট কাজ করে দেখলে হ'তো না?

—বলো কী করতে হবে?

—পাড়ার রক্-ফেলোদের সংখ্যাটা কী রকম বেড়ে গেছে লক্ষ্য করেছিস? মেয়েগুলো বড্ড মুস্কিলে পড়ে যায় রাস্তায় বেরুলে।

—এটা আপনি ঠিক্ বললেন না কিন্তু!—হঠাৎ সুশীল বলে উঠল: ওরা যদি কাজ পেতো, তাহ'লে রক্-এ বসে আড্ডা দিতো না। ওদের চাইতে ঢের বেশী অপরাধী তা'রা—যা'দের পলিসির দোষে দেশে বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে। তাইতো বলছি আপনাকে, একটা স্ট্রং পার্টি গড়ে তুলি আসুন। তাহলে healthy opposition তৈরী হ'বে—চাই কি—agitation-এর গুঁতোয় একদিন গবর্ণমেণ্টও capture করতে পারবো আমরা।

—Shut up!—ফণী আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল: ফের এ বাঁদরামী করলে দূর ক'রে দোব পার্টি থেকে।

তারপর সত্যব্রতর উদ্দেশে বলল: রক্-ফেলোদের ব্যবস্থা আমরা করছি, কিন্তু তোমাকেও, আমাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হ'বে তাড়াতাড়ি—

—দেখা যাক !

প্রলোভন জাগে বটে—সত্যব্রত ভাবে—কিন্তু জল ঘোলা করতে সত্যিই যে আর প্রবৃত্তি হয় না ! এ কথা কি সত্যি নয় যে, গাদ্দি-নশীনদেরকে গালাগালি দি আমরা গদি দখল করতে পারিনি বলেই। কালোবাজারীকে কোতল্ করতে চাই আমরা—নিজেরা ওদের মতো বুদ্ধি ধরি না বলেই। সুযোগ পেলে আমিও যে দুধ চিনিতে ভেজাল মেশাব না তার প্রমান কী ! নেতাদের উদ্দেশে বিষোদ্গার ক'রে আর লাভ কী,—তাঁরা তো আমাদেরই প্রতিনিধি। কিন্তু—

পার্টি-গঠনের চাইতেও বড় সংবাদ—প্রবীর আসছে। ছেলেদের প্রস্তাব আপাততঃ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সত্যব্রত প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করল। ভবিষ্যৎ রুজী রোজগারের জন্য তাকে ঢুকতে হ'বে দৈনিকের জগতে ;—কারণ, এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা আপাততঃ সে দেখতে পাচ্ছেনা। তাকে লিখতে হ'বে রাজনীতি সংক্রান্ত কূট-কৌশলী প্রবন্ধ।—আগেকার মতো সখের সাময়িক লেখা নয় ; নিয়মিত লেখার অভ্যাস করতে হ'বে তাকে, এবং পথও প্রস্তুত করতে হ'বে প্রবীরকেই প্রথ-প্রদর্শক ক'রে। তারপর—চাকরীর বরাৎ তার সরল হ'বে কি পিচ্ছিল হ'বে, অর্থাৎ সে সাংবাদিক হ'বে কি সাহিত্যিক-কেরাণী হ'বে, সে ভাবনা ভবিষ্যতের। আপাততঃ, প্রবীর আসবার পূর্ব্বেই তৈরি হ'য়ে থাকতে হ'বে তাকে। কিন্তু···নিছক অর্থোপার্জ্জনের জন্য পলিটিক্স্ চর্চ্চা ক'রে, কোন পার্টির বাইরে থাকা কি সম্ভবপর কারুর পক্ষে ! মানুষের পক্ষে কি পাঁকাল মাছের সংস্কার আয়ত্ব করা সম্ভবপর !

চিন্তায় ছেদ্ পড়ে। হঠাৎ যেন সুব্রতর সাড়া পাওয়া যায় অন্দরে।—সত্যব্রতও ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে—সঙ্গে নেয় বাদল সেনের চিঠিখানা।

—তুই আজকাল কোথায় থাকিস্ বলতো সমস্তদিন? একটা পরামর্শের জন্যে কাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে!

সুব্রত বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল; সহাস্যে বলল: একটা chance নিচ্ছিলাম, কার্য্যোদ্ধার হ'য়ে গেছে। আজ থেকে আমি free.

—কী chance নিচ্ছিলি?

—প্রভাতী দেবী একটা খবর দিয়েছিলেন: Central Government-এর শিক্ষা বিভাগে খুব ভাল একটা চাকরী···

—তুই দিল্লী যাচ্ছিস নাকি চাকরী নিয়ে?

—হ্যাঁ। সুব্রত দরাজ গলায় হেসে উঠে বলল: তোমাদের বামপন্থী কাগজওয়ালারা বলে মিথ্যে নয়—স্বাধীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোগান—কাকে ধরলে হয়। ধরা ধরিতে ফল্ হয়েছে। আসছে জানুয়ারী থেকেই জয়েন করতে হ'বে।

এ খবরটাও সুখবর বলেই মনে হলো সত্যব্রতর। সুব্রতর আবির্ভাবে ইতিমধ্যে রাঙাবৌয়ের যে ক্ষতি হ'য়েছে, হয়তো সেটা সংশোধন ক'রে নেওয়া যেতে পারবে আস্তে আস্তে। বলল: আমিও তোকে খুঁজছিলাম, ওই প্রভাতী সংক্রান্ত ব্যাপারেই। এই চিঠিখানা পড়।

চিঠি পড়ল সুব্রত। তারপর একটু হেসে বলল: এর জবাবটা তোমায় কাল-পরশু দোব।

—আচ্ছা! বলে সত্যব্রত ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌও চট্ ক'রে সরে গেল দরজার আড়াল থেকে।

এক বাড়ীতে বাস করলেও, দুই ভাইয়ের ঘনিষ্টতা ছিলনা এতটুকুও। তাই, সত্যব্রতকে হঠাৎ সুব্রতর ঘরে ঢুকতে দেখে রাঙাবৌ আড়ি পাততে এসেছিল।—ভাগ্যিস এসেছিল! না হলে, এত বড় একটা খবর তো সে জানতে পারতো না।

সত্যব্রত চলে যেতেই রাঙাবৌ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল: তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছো, আমাকে বলনি তো?

সুব্রত যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। বলল: স্থিরতা তো কিছু ছিলনা! চেষ্টা করছিলাম,—তাই বলিনি—

—আমাকেও নিয়ে যাবে তো?

—যাব বৈকি! মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসবে সেখানে।

মাঝে মাঝে! রাঙাবৌয়ের মাথা ঘুরে গেল। আতঙ্কগ্রস্থের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে সুব্রতর দিকে। তারপর বলল: আমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে যাবে তুমি? এই বাড়ীতে একলা থাকতে হ'বে আমাকে?

—একলা কেন রাঙাবৌ! সুব্রত ভরসা দিয়ে বলল: এখানে সতু রয়েছে। তাছাড়া, এইটেই তো তোমার বাড়ী—

—না না না! আমি পারবো না!—একটা উদ্গত কান্নায় রাঙাবৌয়ের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল। কোন রকমে বলল: এখানে একলা থাকতে আমি কিছুতেই পারবো না! আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—তা কি হয়! সুব্রত বুঝিয়ে বলল: সেখানে একলা থাকবো আমি। ব্যাচিলার্স ডেন-এ কি তোমায় মানায়! লোকে নিন্দে করবে যে—

রাঙাবৌয়ের মুখে আর কথা জোগালনা। সাতঙ্কে, বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে রইল সুব্রতর মুখের দিকে!

সুব্রত এবার বিচলিত হ'লো! এ ক'দিন নিজের কার্যোদ্ধারের খেয়ালেই মেতে ছিল সে, এ-দিককার কথাটা একেবারেই ভেবে দেখেনি। সে তাই সান্ত্বনা দিয়ে বলল: কেন মিথ্যে মন খারাপ করছো! হয়তো তোমাকে আমি শীগ্‌গীরই নিয়ে যাব সেখানে। আমি বোধ হয় শীগ্‌গীরই বিয়ে করবো রাঙাবৌ! তখন আর সেখানে থাকতে তোমার অসুবিধে হ'বেনা।

—শীগ্‌গীরই বিয়ে করবে?—কাকে?

—প্রভাতী দেবী একটু ভরসা দিয়েছেন—

শুনে, রাঙাবৌয়ের বিস্ফারিত চোখ আরও বিস্ফারিত হলো! তারপরই একটা দুর্ব্বোধ্য শব্দ করে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কুড়ি

আবার সেই পূর্ব্ব জীবন!—হেঁসেল পাড়া, বাসন-মাজা,—সুব্রত-শূন্য বাড়ীতে থেকে সত্যব্রতর দাসীবৃত্তি করা। না না না, সে পারবে না, কিছুতেই পারবে না। বিগত দিনের সেই কুৎসিত কালো একঘেয়ে জীবনে আর সে ফিরে যেতে পারবেনা কিছুতেই—গেলে সে মরে যাবে। কিন্তু, এই ছিল যদি তোমার মনে, তবে কেন এসেছিলে তুমি আমার জীবনে! কেন এমন করে ভেঙ্গে দিলে আমার সব স্বপ্ন···সব আনন্দ!—সমস্ত রাত কেঁদে কেঁদে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল রাঙাবৌ! বিকল-মনের অগভীর নিদ্রা, তার মধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে বারবার; অসংখ্যবার চমকে উঠল বিভীষিকা দেখে। তারপর—

কান্না থামিয়ে ভাবতে বসল সে সকাল বেলায়।—সুকৃতির সমস্যা নয়, নিজের আত্মরক্ষায় উপায়! এমন ক'রে তিলে তিলে মরতে পারবে না সে এ বাড়ীতে থেকে। তাকে বাঁচবে হ'বে। বাঁচতে হ'লে পালাতে হ'বে এখান থেকে। পালাতে হ'লে ব্যবস্থা করতে হ'বে নিজেকে!—কেউ নেই তার এ জগতে; তাকে একলা চলতে হ'বে। কিন্তু, চলে সে যাবে কোথায়! চেনেনা সে কাউকে; জানেনা দুনিয়ার কোন হাল চাল; শুধু বোঝে, পেট্ আছে, আবরু আছে...আর...আর আছে এই অত্যাশ্চর্য্য দেহটার সমস্যা—

দুপুর বেলায় জহর এল। ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল সে। বলল: আপনার অসুখ করেছে? চোখ মুখ অত ফুলল কী করে?

—ও কিছু নয়, বসুন।

জহর বসল। কিন্তু তারপরও রাঙাবৌকে চুপচাপ দেখে বলল: শরীর যদি খারাপ লাগে, তাহলে, আজ না হয় আমি উঠি—

—না, উঠ্‌তে হ'বেনা, বসুন।—রাঙাবৌ এবার জহরের দিকে তাকাল। বলল: আচ্ছা, আমি যতটুকু শিখেছি. তাতে ছোটদের শেখানো যায়না?

—নিশ্চয়ই যায়।

—ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, দু-একটা?

—কিন্তু, আমি তো এখানে কাউকে চিনি না।

—এখানকার কথা হ'চ্ছে না, কোলকাতায় পারেন?

—বোধ হয় পারি। একটা সুযোগও এসেছে। কিন্তু···জহর একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল: হঠাৎ কোলকাতায়?

রাঙাবৌ বলল: সে অনেক কথা, আপনাকে পরে বলবো'খন। কিন্তু, কী সুযোগের কথা বলছিলেন?

জহর বলল: একজন মাড়োয়ারী তাঁর মায়ের নামে একটা বড় সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান—যেমন, বিড়লা করেছেন। এঁর সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের আলাপ। আমাদের দেশে এঁর পাটের কারবার ছিল। তাই, আমার ওরপই সব ভার দিতে চান। টাকাও অনেক খরচ করবেন—

—তাহলে, আমারও তো একটা উপায় আপনি ক'রে দিতে পারেন।—রাঙাবৌ সাগ্রহে বলল: দেবেন করে, অ্যাঁ?

রাঙাবৌয়ের আগ্রহ দেখে জহর হাসল। বলল: সে জন্যে

আটকাবে না। কিন্তু হঠাৎ আপনার হ'লো কী? ট্যুইশানির কথা সুব্রত জানে তো?

রাঙাবৌ গম্ভীর হ'য়ে বলল: আমি কোলকাতায় গিয়ে রোজগার করতে চাই, তার সঙ্গে সুব্রতর কী সম্পর্ক! আমি আর এদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো না—মরে গেলেও না! আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কি না বলুন?

—কিন্তু, হঠাৎ হ'লো কী?

—বললুম তো সে অনেক কথা!—রাঙাবৌ ব্যস্ত হ'য়ে বলল: এখন আপনি বলুন, কবে আমাকে নিয়ে যাবেন? কাল?

ব্যাপার দেখে জহরের মুখও এবার গম্ভীর হ'লো।—রাঙাবৌ তাকে সঙ্গী ক'রে একলা যেতে চায় কোলকাতায়!—ব্যাপারটা কল্পনা করতে গায়ে কাঁটা দেয় তার। বিমূঢ় ভাবে বলে: আমার সঙ্গে গেলে এঁরা হয়তো আপত্তি করবেন—

—হয়তো নয়, নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু, আমাকে বাধা দেবার অধিকার তো কারুর নেই। আপনি আমাকে সাহায্য না করলেও আমি এ বাড়ীতে আর থাকবো না, নিশ্চয়ই জানবেন।

রাঙাবৌয়ের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে, ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে জহরের আর সন্দেহমাত্রও রইল না। আস্তে আস্তে বলল: আপনার এ ইচ্ছার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিন্তু এ সবের অনেক বিপদও আছে। ধরুন, পুলিশ—

পুলিশ! পুলিশের নামে রাঙাবৌ যেন একটু মুষড়ে পড়ে। কিন্তু, পরক্ষণেই মুখ তুলে বলে: আমি সেচ্ছায় যদি চলে যেতে চাই,

পুলিশ বাধা দেবে কোন আইনে? আমি তো কচি খুকী নই!

—কিন্তু, লোক নিন্দা?

আবার মিনিট খানেকের জন্যে মুখ নীচু ক'রে রাঙাবৌ। তার-পর একটু মলিন হেসে বলে: ও আমার সয়ে গেছে! তবু, আপনার যদি আপত্তি থাকে, আমি বিরক্ত করবো না। আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন।

রাঙাবৌ তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে গেল; কিন্তু জহর হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে তার আঁচল চেপে ধরল।

—ও কি! রাঙাবৌয়ের চোখে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল!

—রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন—জহর তাড়াতাড়ি আঁচল ছেড়ে দিয়ে বলল: আমার কথাটা শুনবেন না···?

—কী কথা?

জহর কিন্তু চট্ ক'রে জবাব দিতে পারল না। তার বলতে ইচ্ছে করছিল অনেক কথা, কিন্তু তার চাইতে বেশী হচ্ছিল ভয়।—এই অনন্যসাধারণ ছাত্রীটিকে নিয়ে এতদিন সে অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সে স্বপ্ন যে এত শীঘ্র বাস্তব হ'য়ে দেখা দেবে—এমন করে প্রলোভিত করবে তাকে—এ যে সে ভাবতেও পারেনি! —কথা কইতে তার ভয় করছিল: যদি তার সুর-বাঁধা তার ছিঁড়ে যায়।—শেষে, অনেক চেষ্টা ক'রে সে বলে ফেলল: সব কিছু নিন্দেকেই আমি জয় করতে পারি, যদি আপনি আমার পাশে থাকেন—

—তার মানে?—রাঙাবৌ যেন একটু বিরক্ত হ'য়েই বলল: হেঁয়ালী ছেড়ে কথাটা খুলেই বলুন না?

জহর আরও সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ল রাঙাবৌয়ের বিরক্তি লক্ষ্য করে; কিন্তু আবেগও দমন করতে পারল না। বলল: বলবো,...কিন্তু, আপনি যে রাগ করছেন—

—এই কি আমার অ-রাগ করবার সময়? বলুন না কী বলছিলেন?

—বলছিলাম কি, সুব্রত কিছু বলে নি আপনাকে—আমার এতদিন না আসার জন্যে?

—কই না তো! কেন, আসেন নি এতদিন?

—সুব্রতই আমাকে বারন করেছিল—প্রকারান্তরে—

খবরটা দু'দিন পূর্ব্বে শুনলে রাঙাবৌ বিশ্বাস করতো কি না সন্দেহ! কিন্তু এখন কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে বলল: কেন, মাইনে দেবার ভয়ে?

—না। জহর আড়ষ্টভাবে বলল: কথাটা বলতে আমার সঙ্কোচ হ'চ্ছে। আপনি বরং তাকেই জিগ্‌গ্যেস করবেন।

—বললুম না আপনাকে—রাঙাবৌ এবার ধমক্ দিয়ে বলল: তার সঙ্গে আমি কথা কই না!—আর, আপনারই বা এত লজ্জা কিসের শুনি? পুরুষ মানুষ না আপনি?

এততেও জহরের মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরুল না।

—তবে থাকুন আপনি আপনার সঙ্কোচ নিয়ে। বলে, রাঙাবৌ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে সোজা গেল খিড়কীর্ ঘাটে। তারপর, ঘাটের রাণার ওপরে বসে আবার নতুন ক'রে ভাবতে আরম্ভ করল: তার যখন কেউ নেই, তখন, একলাই পথ চলবে সে। এ নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে যাবে সে একলা।—

চমক ভাঙল দাসীর ডাকে: তোমার কী আক্কেল বৌদি! নিঃসাড়ে এই এঁদো ঘাটে এসে বসে আছো, আর আমরা খুঁজে মরছি সাত পাড়া। সন্ধ্যে উৎরে গেল, তবুও তোমার খেয়াল হয়না, বাড়ীর লোকেরা খাবে কী?

—তোদের বাড়ীর কে কী খাবে তার আমি কী জানি! আমি কি তোদের কেনা বাঁদী?—রাঙাবৌ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল; কিন্তু, উঠে আবার বাড়ীর দিকেই চলল।

সিঁড়ির মুখে দেখা হ'লো সুব্রতর সঙ্গে। রাঙাবৌ কপাল কুঁচ্‌কে পাশ কাটাতে যাচ্ছিল—কিন্তু তার পূর্ব্বেই সুব্রত বলল: জহরকে বসিয়ে রেখে কোথায় গিয়েছিলে?

নিদারুণ বিরক্তিতে জহরের কথাটা মনেই ছিলনা রাঙাবৌ-য়ের। সে থমকে দাঁড়াল।

সুব্রত বলল: আবার দাঁড়ালে কেন? জহর চলে গেছে।

রাঙাবৌ নড়ল না। জহরের উল্লেখে, তার শেষ কথাটাও মনে পড়ে গিয়েছিল তার। বলল: তুমি ওঁকে আসতে বারন করেছিলে? কেন?

সুব্রত বলল: সেই কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ তার সঙ্গে। সব বলছি, ভেতরে চল।

ঘরে এসে সুব্রত বলল : জহরকে আমি ঠিক্ আসতে বারণ করি নি, তবে, তোমার মঙ্গলের জন্যে তাকে গোটা কতক কথা বলেছিলাম।

—আমার মঙ্গলের জন্যে?—রাঙাবৌ ভ্রূ কুঁচ্‌কে বলল : কী কথা, শুনি?

সুব্রত বলল : তুমিই একদিন আমাকে বলেছিলে, লোকটা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে তোমার মুখের দিকে। সেই কথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই আমি জানতে পারি,—জহরের দুর্ব্বলতা জেগেছে তোমার প্রতি। তা'তে, আমি তা'কে গোটাকতক কথা বলেছিলাম। কথাগুলো হ'চ্ছে : সম্ভব হলে যাকে বিবাহ করা যেতে পারে, দুর্ব্বলতা বা প্রেম পোষণ করা মানায় শুধু সেই নারীর প্রতিই। এইটাই ভদ্রজনোচিত কাজ। না হ'লে, ও ধরনের দুর্ব্বলতা অপরাধ···

একটু থেমে সুব্রত আবার বলল : আজ, তার কাছে শুনলাম, তুমিই তাকে ডেকে এনেছো চিঠি লিখে। প্রস্তাব করেছো তার সঙ্গে কোলকাতায় গিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার। কিন্তু, এর ভবিষ্যতটা ভেবে দেখেছো কী? পাগলামী না করে একবার ভাল করে ভেবে দেখো তো—

—পাগলামী আমি মোটেই করিনি। রাঙাবৌ দৃঢ়স্বরে বলল : ও সব করবার দিনও আমার নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার ভবিষ্যতের বালাই নিয়ে আমি একলাই মরতে পারবো,—তোমাকে বা তোমার বন্ধুকে জড়াব না।

সুব্রত বলল: আমার ওপর অভিমান করে—এভাবে মরতে যাওয়াটা কি পাগলামী নয়?…

—আমি সে মরার কথা বলিনি!—বলেই, রাঙাবৌ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুব্রতও একটা নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল। কথা ছিল, সন্ধ্যার সময়ে প্রভাতীর কাছে যাবার, কিন্তু, মনের এ অবস্থায় যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করল না। সত্যিই সে চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিল রাঙাবৌ-য়ের জন্য! অবশ্য রাঙাবৌ একটু উচ্ছ্বাস-প্রবণ! মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে;—আবার ঠাণ্ডাও হ'য়ে যায় কিছুক্ষণ পরে। কিন্তু, আজকের ব্যাপার দেখে অনুরূপ ভরসা সে যেন তার মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলনা। তাকে না জানিয়ে রাঙাবৌ যখন জহরকে চিঠি লিখে ডেকে আনতে পেরেছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করতে পেরেছে গৃহত্যাগ করার, তখন সে সাধারণ উত্তেজনার বশে কাজ করেছে বলে তো মনে হয়না! সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অতিরিক্ত রকমের স্পষ্ট বলেই যেন মনে হচ্ছে। অথচ অজুহাতটা সে তুলনায় কতই না তুচ্ছ! ডিসেম্বরের শেষে দিল্লী যেতে হ'বে তাকে; কিন্তু, বিবাহ সম্পন্ন করতে সময় লাগবে আরও অন্ততঃ পক্ষে তিন চার মাস! এই আইন ছাড়া ডিভোর্সড্ গার্লকে বিবাহ করবার উপায় নেই। অথচ, রাঙাবৌ এক্ষুনি গিয়ে উঠ্‌তে চায় তার ব্যাচিলার্স ডেন্‌-এ। কী যে ছেলে মানুষী ক'রে মেয়েটা!

রাত্রে খেতে যাবার আগে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা

করল সে: কেন মিছি মিছি রাগ ক'রে বেড়াচ্ছো বলতো? কথা শোন আমার!

রাঙাবৌ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল: তোমার কথা আর নতুন ক'রে কিছু শোনবার নেই। বরং তুমিই শোন আমার কথা,—তোমার খেলার পুতুল হ'য়ে থাকবো, এমন সস্তা মেয়ে আমি নই।

সুব্রত যেন একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল! খেলার পুতুল! সস্তা মেয়ে! এ সব কী কথা!

খেতে বসে আরও একটা খবর পাওয়া গেল পাচিকার মুখে, রাঙাবৌ আজ সমস্ত দিন উপবাসী। এ বাড়ীতে আর নাকি সে জলস্পর্শ করবে না।

বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে! সুব্রতর বিরক্তিও এবার চরমে উঠল। নিঃশব্দে শয্যা গ্রহণ করে সেও মনে মনে বলল: যা ই'চ্ছে করুক গে যাক, আমিও আর কথা কইতে যাচ্ছিনা—

কিন্তু, কথা কইতেই হ'লো পরদিন ভোরে।—সমস্তদিনের উপবাস আর একটানা অনিদ্রার ফলে রাঙাবৌয়ের শরীর যেন আর বইছিল না। আস্তে আস্তে চলেছিল সে কলঘরের দিকে; হঠাৎ সত্যব্রতর ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুব্রত।

—পথ ছাড়ো আমার—রাঙাবৌ ধমকে উঠল।

—তোমার পথ আটকাতে আমি আসিনি রাঙা'বৌ! রাত্রি জাগরণের জন্য সুব্রতর কণ্ঠস্বরও যেন অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর শোনাল: জিগ্গ্যেস করছি, সতু কাল বিকেল থেকে বাড়ী নেই —তুমি কিছু খবর রাখো?

—না !—রাঙাবৌ এগোল। কিন্তু এগোতে গিয়ে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিল।

দেখে কষ্ট হ'লো সুব্রতর: এ কী ছেলেমানুষী! উপবাস ছাড়া কি রাগ অভিমান প্রকাশ করবার আর কোন উপায় নেই! এগিয়ে গিয়ে বলল: কী পাগলামী করছো বলতো? শোন—

—তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি ঠাকুরপো,—রাঙাবৌ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল: আর না শুনতে হ'লেই আমি সুখী হ'বো।

ঠাকুরপো!—কথাটা যেন খট্‌ ক'রে কাণে লাগল সুব্রতর। সে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হ'য়েই বলল: কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন করছো? আমি কী করেছি তোমার?

—কী করেছি তোমার!—রাঙাবৌ আপন মনেই বলে উঠল: কিছু জানেন না উনি।—

তারপরই হঠাৎ আবার চেঁচিয়ে উঠল: আঃ পথ ছাড়োনা আমার—

—যাচ্ছি! সরে দাঁড়িয়ে সুব্রত বলল: কিন্তু তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি রাঙাবৌ—বেশী বাড়াবাড়ি করোনা। মনে রেখো, দুনিয়ার কোথাও, কখনও কোন স্বেচ্ছাচারিণী নারী সম্মান পায়নি—কখন পাবেও না! জহর শিক্ষিত ভদ্রলোক। তাই, সে তোমার মতলব শুনে, তোমাকে ধর্ম্মপত্নীর মর্য্যাদা দিতে চায়। কিন্তু সে দিতে চাইলেও তুমি কি তা নিতে পারবে এতদিনকার অন্ধ-বিশ্বাস ত্যাগ করে?—আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো,—তোমার ভাল হবে।

সুব্রত চলে গেল। রাঙাবৌও কলঘরে গিয়ে ঢুকল আরও একটা নতুন সমস্যার বোঝা নিয়ে!—স্বেচ্ছাচারিতার নয়, ধর্ম্মপত্নীত্বের সমস্যা...

অবশ্য, সমস্যা মনে করলেই সমস্যা! না হ'লে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই—নেশাচ্ছন্নের মতো মাথায় জল থাবড়াতে থাবড়াতে, রাঙাবৌ সুব্রতর মুখে শোনা পুরোণ কথাগুলোকেই যেন আঁকড়ে ধরছিল: ফুলের মতো সুন্দর একটা বাচ্চা মেয়েকে, তার বাপের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে বলি দেওয়া হ'লো একটা চরিত্রহীন শয়তানের হাতে! মেয়েটার তখনও ভাল করে জ্ঞান হয়নি—খুন ক'রে স্বামীদেবতা হ'লেন নিরুদ্দেশ! আরম্ভ হ'লো শুভাকাঙ্খীদের কৃপা-বর্ষণের পালা! এই বলিদান যজ্ঞের যিনি আসল হোতা, সেই বড় সরীক, কৃপা ক'রে বাড়ীতে স্থান দিলেন মেয়েটিকে। কায়েম হ'লো তার ক্রীতদাসীর জীবন শাশুড়ীর মেট্-গিরিতে। সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত আইন অনুযায়ী অসহায়াকে সৎপথে রাখবার অজুহাতে, আরম্ভ হ'লো শাশুড়ী ঠাকরুণের পন্থা-নির্দ্দেশ, অর্থাৎ, নিদারুণ নির্য্যাতন। এই ভাবে, মহান হিন্দু-ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে মেয়েটি জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিলে মুখ বুজে। এই সমাজের নরক কুণ্ডে বাস ক'রে সে নির্ব্বিবাদেই মেনে নিলে—সে মানুষ নয়, মেয়েমানুষ। অর্থাৎ রাস্তার কুকুর বেড়ালের চাইতেও সে অসহায়, অক্ষম, ঘৃণিত! কিন্তু সত্যিই কি সে তাই? তাই যদি হয়,—অমন ধর্ম্মের মুখে, সমাজের মাথায়, লাথি মেরে তার প্রমান করা উচিৎ,—সে তাই নয়!

ভারতীয় আদর্শের ঐতিহ্য? হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্য? সংযত জীবন যাপনের

পবিত্রতা?—সে পবিত্রতার স্বরূপ তো সে দু'বেলাই দেখতে পাচ্ছে এ পাড়া ও পাড়ায়! সধবা জননী বা শাশুড়ী, এগারো মাস অরন্ত আঁতুড়ে ঢোকেন নিঃসঙ্কোচে; আর তাঁর বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূ তাঁরই জন্যে মাছের ঝোল রাঁধতে রাঁধতে ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য শোনে, পূজনীয় পিতৃদেব বা জিতেন্দ্রিয় শ্বশুরের মুখ থেকে। স্বামী পরিত্যক্তা পিসী-মাসীরা নিত্য এয়োতীর ধর্ম্ম বজায় করেন সিঁদুর পরে। কিন্তু তাঁদের বৈধব্যের নিষ্ঠার মধ্যে যদি একচুল এদিক ওদিক হয়, অমনি গালাগালি বেরোয় পরম পূজনীয় শ্বশুর-শাশুড়ী বা বাপ-মার শ্রীমুখ থেকে: গেরস্থ বাড়ীতে ও সব চলবে না বাছা, বাজারের পথ দেখ।

এই তো এদের ধর্ম্মের আদর্শ, সমাজের স্বরূপ, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি! কিন্তু, কেউ যদি ওই মেয়েগুলোকে বিদ্রোহের পথ দেখায়?—বুঝিয়ে দেয়, দাবীর যৌক্তিকতা? রাঙাবৌয়ের কাণ্ড দেখে তারাও যদি বিদ্রোহ করে বলে: আমাদেরকে দিয়ে আর নিখরচায় দাসীবৃত্তি করানো চলবেনা! বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করেছেন মা হওয়ার জন্যে—পুরুষের হাতের খেলার পুতুল হবার জন্যে নয়!—দেবীগিরির ধাপ্পা দিয়ে আর আমাদেরকে জানোয়ার ক'রে রাখা চলবেনা...

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজে চমক ভাঙে রাঙাবৌয়ের। দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে সুব্রত বলে: কী করছো এতক্ষণ ধরে? শীগগীর বেরোও, সতু যে রাত জেগে উপোষ ক'রে রয়েছে ....

একুশ

গতদিন বিকালে, সুব্রতকে চিঠি দিয়ে সত্যব্রত বিনদার বাড়ীর দিকে বেরিয়ে পড়েছিল।

বিনদা বাড়ী ছিলনা। ফিরতি মুখে দেখা হ'লো নীরু ডাক্তারের সঙ্গে। গাড়ী থামিয়ে সে বলল: বিনদার ব্যাপারটা শুনলাম। শেষ পর্যান্ত আবার তাহলে ফিল্ডে নামলি?

সত্যব্রত এগিয়ে এসে বলল: তুই এদিকে?

—এসেছিলাম প্রভাতী দেবীর মাকে দেখতে।

—ভাল কথা মনে পড়েছে—সত্যব্রত আরও ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল: ও মেয়েটার ব্যাপার কি বলতো? আগেকার মতো হৈ-হুল্লোড় তো আর শুনতে পাইনা?

নীরু বলল: তুই-ই তো সেদিন বললি—সব বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে। এখানে লীডারী করবার মৎলব যখন নেই, তখন আর হৈ হুল্লোড় ক'রে লাভ কী!

—কিন্তু মৎলবটা হঠাৎ বদলে গেল কেন?

—সেইটেই তো দুর্ব্বোধ্য! এখানে এসে প্রথমে রমণদাসকে নিয়ে পড়ল। তার চিকিৎসার জন্যে Blank Cheque দিয়ে দিলে আমাকে। তার পার্টি ঠিক রাখবার জন্যে, গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার মতো কী একটা করলে নিজের বাড়ীতে। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই, কোথায় গেল পার্টি আর কোথায় গেল পলিটিক্স্! অবশ্য, এখনও বাড়ীতে রোজ সম্মেলন হয়, তবে, সে সম্মেলন বিলেৎ-ফেরৎ

য্যারিষ্টোক্র্যাট্‌দের। তোমার ভায়ার গাড়ীটাও তো দেখি দাঁড়িয়ে থাকে গেট-এর কাছে।

সত্যব্রতর জিভের আগায় বাদল সেন-এর বক্তব্যটাও এসে পড়েছিল, কিন্তু প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করল না। সংক্ষেপে বলল: অদ্ভুত!

— মেয়ে জাত্‌টাই অদ্ভুত!

—মেয়েটার আরও একটা ব্যাপার আমাকে আশ্চর্য্য করেছে! আগে, যখন সাহিত্য চর্চ্চার ব্যায়রাম ধরেছিল, তখন তো সতুদা বলতে অজ্ঞান হ'য়ে যেতো। কিন্তু, এবারে এসে, একদিন দেখা পর্য্যন্ত করলে না রে!

—Now She is a big gun—তোর মতো হেজি-পেঁজির সঙ্গে দেখা করলে তার ইজ্জৎ যাবে না? নীরেন মুচ্‌কে হেসে বলল: এ ছাড়াও, বোধ হয় আর একটা কারণ আছে। ঘটনাটা আমার গিন্নীর মুখে শুনলাম: মেয়েলি কাণ্ড।

—মেয়েলি কাণ্ড?

—হ্যাঁ। প্রভাতী নাকি গিয়েছিল তোদের বাড়ী। কিন্তু তোদের রাঙাবৌ নাকি,—কী সব খোঁটা দিয়েছিল, স্বামী ত্যাগ করার জন্মে…

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। মোল্লাগুলোর কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। —নীরেন গীয়ার টেনে বলল: তুই যাবি নাকি কোথাও? যাস্ তো চল, লিফ্‌ট দিয়ে দি—

—তুই কোনদিকে যাবি?

—ওতোরপাড়ার দিকে। নীরু হঠাৎ বিরক্ত হ'য়ে বলল: এ এক ফ্যাসাদ হ'য়েছে আমার। তোদের ইজারাদারের কথা বলছি! একটা monthly allowance দেন বলে, তাঁর পরিচিত লোককেও বিনা ফিস্-এ দেখে আসতে হবে?

—হলো কি?

—তোমাদের করুণা ঠাকরুণ চিরকূট পাঠিয়েছেন,—এক্ষুনি গিয়ে একবার লায়ন্ সাহেবকে দেখে আসতে হ'বে। ছেড়ে দোব ঘোড়ার ডিমের allowance.

—কী হ'য়েছে তাঁর? সত্যব্রত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল।

—কে জানে কী হ'য়েছে।

—চল্, আমিও যাব।

সাহেবের বাঙ্গলোয় ঢুকে প্রথমেই দেখা হ'লো অজয়ের সঙ্গে। সত্যব্রত বলল: তুই এখানে?

অজয় খিঁচিয়ে উঠল: আর বলো কেন, বিনদার্ কাণ্ড। ধাতস্থ হয়েই খেয়াল দেখলে, সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। বেশ, জানাও কৃতজ্ঞতা। কিন্তু, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা! আমার যে প্রাণ যায়। বুড়োর কাছে ভাল ছেলে হওয়ার বিপদ দেখছি ঢের বেশী—

—কোথায় বিন্‌দা?

—ড্রইংরুমে বসে লেক্‌চার ঝাড়ছে—

—সাহেবের কী হ'য়েছে জানিস্?

—কী আবার হ'বে! বুড়ো মানুষ, রাত জেগে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে, তাই ঝেড়ে ঘুমোচ্ছে—

যাক্! কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে সত্যব্রত এগোল। ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল, সত্যিই বিনদা দরাজ গলায় উপদেশ বর্ষণ করছেন—করুণার উদ্দেশে।

স-সঙ্গী সত্যব্রতকে দেখেই দেখেই করুণা প্রস্থানোদ্যত হ'য়েছিল, কিন্তু বিন্‌দা বাধা দিলেন। বললেন: আহা, চললে কোথায়?

বাধা পেয়ে করুণা ভ্রূকুঞ্চিত করল!

বিন্‌দা বললেন: চোখের সামনে প্রমাণ রয়েছে, এবার আমার কথাটা বিশ্বাস হ'লো তো? আমি বলিনি? তুমিই বলো, বলিনি?

করুণা কিছু বুঝতে না পেরে বলল: কী?

—না, কিস্যু মনে থাকেনা তোমার। বিন্‌দা বিরক্ত হ'য়ে বললেন: এই বয়সেই এত স্মরণশক্তি কম্ কেন তোমার? তোমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ!

বাইরের লোকের সুমুখে করুণা অত্যন্ত বিব্রতবোধ করছিল। সেও বিরক্ত হ'য়ে বলল: কী বলতে চাইছেন আপনি?

—আমি বলিনি, দেশ উচ্ছন্নয় গেছে?

—সে তো চিরদিনই বলে আসছেন।

—বলিনি, দেশের লোকগুলো সব খারাপ হ'য়ে গেছে?

—সেও তো বরাবর শুনে আসছি।

—সব খারাপ হ'য়ে গেছে, সব বদলে গেছে, কিন্তু বদলায়নি

একটি জিনিষ, ভগবানের আইন।—বিনূদা উত্তেজিতভাবে বললেন: সেখানে নিক্তির ওজনে বিচার হ'চ্ছে। দুনিয়ার সব কিছু বদলে যেতে পারে, কিন্তু, ভগবানের আইন কখনও বদলাবে না। আমি বলিনি?—ঈশ্বর কখনও সতুর মতো ছেলেকে অপঘাতে মরতে দিতে পারেন না! বুঝলি সতু, দ্বিজব্রতর খুন হওয়ার কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম; কিন্তু তোর মৃত্যু আমাকে বিচলিত করতে পারেনি—

—আমি মরেছিলাম নাকি?—সত্যব্রত হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না।

—শুধু মরেছিলি? বিনূদা সবেগে বললেন: তোকে গাদায় পোড়ান হয়েছিল পর্য্যন্ত, তা জানিস্?

—কে বললে?

—তোমার গুনধর ভাই শ্রীমান শিবব্রত! তিনদিন পরে, সে-ই তো খবর নিয়ে এলো, দ্বিজব্রতর সঙ্গে তোকেও গাদায় পুড়িয়ে ফেলেছে গবর্ণমেন্ট—

খবরটা সত্যিই অদ্ভুত! সত্যব্রত বিমূঢ় ভাবে করুণার দিকে তাকাল।—চোখাচোখি হ'তেই করুণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—তা না হয় হ'লো! কিন্তু,—নীরু কাজের কথা পাড়ল: আমাকে ডাকা হ'লো কেন তা তো বুঝতে পারছিনা! উনি তো চলে গেলেন। কিন্তু, আমারও তো সময়ের দাম আছে।

—দাঁড়া, আমি দেখছি। সত্যব্রত ভেতরে গেল।

সাহেবের শোবার ঘরটা সত্যব্রতর জানা ছিলনা; ভেতরে গিয়ে

এদিকে ওদিকে তাকাতেই দেখল, সেদিনকার সেই খিদ্‌মদ্‌গারটা একটা ঘরের সামনে বসে আছে। সে তাকেই জিজ্ঞাসা করল: মিসিবাবা কী ধ্যর্?

—ভিতর গিয়া।

সত্যব্রত এইবার মুস্কিলে পড়ল।—সাহেব নিজে অবশ্য অতিরিক্ত রকমের নেটিভ্ ঘেঁষা; কিন্তু, অনুচরদের ডিসিপ্লীন্‌টা কী রকম তা কে জানে! ইতস্ততঃ ক'রে বলল: হাম্ উস্‌কো মাঙ্গতা হ্যায়—

—নক্ কিজিয়ে।

সত্যব্রত আস্তে আস্তে টোকা মারল। পর-মূহূর্ত্তেই দরজা ফাঁক ক'রে মুখ বাড়াল করুণা।

—আঙ্কল-এর কী হ'য়েছে? নীরুকে ডেকে পাঠিয়েছিস কেন?

করুণা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল: কী হ'য়েছে, তা তুমিই জান!

—তার মানে?

—মানে আবার কী!—করুণা বলল: তুমিই তো তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছো সারা রাত। অসুখ করবে না?

—আঃ কী অসুখ, সেইটে আগে বলনা?

—সে আমি কী ক'রে জানবো। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা; তার ওপর জরও হ'য়েছে বেশ। তাই তো নীরেনবাবুকে খবর পাঠালাম।

সত্যব্রত বলল: ওঁর ভাইপো কোথায়?

—তিনি কাল হাজারীবাগ্ গেছেন B. I. C.র কাজে—

—বিকাশ টিকাশ কেউ নেই এখানে ?

—বিকাশদা বাবার সঙ্গে নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে গেছে সেই ভোরে—

—নেমন্তন্ন ! কিসের ?—সত্যব্রত যেন একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল।

করুণা বলল : আস্‌ছে কাল V. I. P-রা আস্‌ছেন রিফিউজী কলোনীতে....কিন্তু, তোমার কী আক্কেল ! বুড়ো মানুষকে সারা রাত....

—দাঁড়া, নীরুকে ডাকি।—সত্যব্রত এ ঘরের এসে নীরেনকে ডেকে নিয়ে গেল।

সাহেব আচ্ছন্নর মতো পড়েছিলেন। বুকের ওপর নল বসাবার সময়ে একবার যেন চোখ চাইলেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না।

পরীক্ষা শেষ ক'রে নীরু মুখ বেঁকাল। বলল : ইনি কি খুব ড্রিঙ্ক করেন ?

করুণা আস্তে আস্তে বলল : এদানী ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে শুনেছি, মেয়ে মারা যাবার পর খুব বাড়িয়েছিলেন।

—ছেড়ে দিয়েছিলেন ? সত্যব্রত ঘাবড়ে গিয়ে বলল : কিন্তু, আমি যে সেদিন ওঁকে এক আসনে বসে এক বোতল শেষ করতে দেখেছি।

আরও মারাত্মক খবর দিল সেই খিদ্‌মদ্‌গারটা। এ দুদিনে সাহেব ভাইপোর সেলার ফাঁক ক'রে দিয়েছেন।

—হুঁ। নীরু ব্যবস্থার পত্র লিখে ফেলল। তারপর বলল : আমার মতে এক্ষুনি এই Course নেওয়া উচিৎ ! মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার—

বাইরে এসে সত্যব্রত বলল : ব্যাপার কী রে ?

নীরু বলল : বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে! তোমাদের ডাক্তার ডাকা উচিৎ ছিল গত কাল—নিদেন পক্ষে আজ সকালে। এ এক রকমের সাংঘাতিক নিউমোনিয়া--

—তাহলে?

—নাঃ এক্ষুনি ঘাবড়াবার কিছু নেই—এটা পেনিসিলিনের যুগ! তবে বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে—

—তাহলে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর—

—আমিই করবো?

—হ্যাঁ, সঙ্গে অজয়কে নিয়ে যা। বরফ, আইস্ ব্যাগ, পেনিসিলিন্—যা কিছু তোর দরকার, নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি—

—বিল্‌টা তোর নামেই করবো তো?

—তাই করিস্।

নীরু অজয়কে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'লো। সত্যব্রত আবার ডেকে বলল : বিনুদাকেও অমনি একটা লিফ্‌ট্ দিয়ে দে। সাহেবের সঙ্গে দেখা করা এখন উচিৎ হ'বেনা।

সকলকে রওনা করিয়ে দিয়ে সত্যব্রত আবার রুগীর ঘরে এল। বলল : ওষুধ-পত্র নিয়ে নীরু এক্ষুনি আসছে।

করুণা আঙ্কল-এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল; উঠে এসে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল : কী বললেন উনি? ভয়ের কিছু আছে নাকি?

সত্যব্রত একটা কৌচে বসে পড়ে বলল : ঠিক্ বুঝতে পারলুম না।

বল্‌লে,—বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে। তুই খবর পেয়েছিলি কখন? কে খবর দিলে?

—আঙ্কল-এর শোফার সকালে গিয়েছিল।

—তবে তক্ষুনি ডাক্তার ডাক্‌লি না কেন?

—আমি কি তখন জানি যে, এত বাড়াবাড়ি হয়েছে! দুপুরে এসে দেখলাম—

—তুই দুপুরে এসেছিলি? সত্যব্রত আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: কেন, অত দেরী করলি কেন?

করুণা উত্তর দিল না। একটা তীব্র অনুশোচনায় কণ্ঠ যেন তার রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল।

সত্যব্রত আবার বলল: জুনিয়ার লায়ন্‌ এখানে নেই শুনেও সমস্ত সকালটা চুপ ক'রে বসে রইলি তুই? নিজে বেরুতে না পারিস, আমাকেও তো একটা খবর পাঠাতে পারতিস্‌! আঙ্কল-এর অবস্থাটা কি বিন্‌দার হাজত বাসের চাইতেও serious নয়? কী যে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হ'চ্ছে দিন দিন্‌—

—তুমি থাম তো! —করুণা আরক্ত চোখে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল: তোমার আর কি...আমার মতো তো কথা শুন্‌তে হয় না তোমাকে!

—কে আবার তোকে কী কথা শোনালে?

কথা শোনায় নি,—কিন্তু শোনাবে,—তার বাবা। —সমস্ত সকাল অপেক্ষা ক'রে, শেষে, পিতার বিনানুমতিতেই সে এখানে এসেছে। এর পরিণাম যে কি হ'বে, তা সে ভাল করেই জানে।—কিন্তু, ও

গোঁয়ারটাকে সে কথা বলারও বিপদ আছে যে! —করুণা চুপ করেই রইল!

—তবু চুপ ক'রে রইল! সত্যব্রত এবার উত্তেজিত হ'য়ে বলল: কী হয়েছে খুলে বলনা আমাকে; আমি টিট করে দিচ্ছি।

—থাক্, আর বীরত্ব করতে হ'বেনা!

—তবে চুলোয় যা!—সত্যব্রতও বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে বসল।

করুণাও আবার গিয়ে সাহেবের শিয়রে বসেছিল; কিন্তু মিনিট্ দু'য়েক পরেই উঠে এল। বলল: শুনছো, জ্বরটা যেন বাড়ছে বলে মনে হ'চ্ছে···ডাক্তার এত দেরী করছে কেন?

এ ছেলেমানুষী উৎকণ্ঠার কী উত্তর দেবে সত্যব্রত! সে চুপ ক'রে রইল।

করুণার উৎকণ্ঠার কিন্তু আরও কারণ ছিল। বলল: নীরেনবাবু আসবেন তো ঠিক? উনি আবার যে রকম চষম্-খোর লোক—

—আশ্চর্য্য!—নীরুর বিল পাঠাবার প্রস্তাবটা সত্যব্রতকেও ক্ষুণ্ণ করেছিল। বলল: লোকটা যে এত ইতর হ'য়ে গেছে বিশ্বাস হয়না। স্বচ্ছন্দে আমাকে বললে, বিল্‌টা তোর নামেই পাঠাব তো! অথচ, আমি এক সময়ে কত সাহায্য করেছি ওকে—

—তাই তো বলছি—করুণা বলল: টাকা-কড়ি কিছু দিয়েছো তো ওঁকে?

সত্যব্রত বলল: টাকা এখন আমি কোথায় পাবো? কিন্তু,—নীরু যদি কাল সকালেই টাকা চেয়ে বসে? তোর ট্যাকের অবস্থা কী রকম?

করুণা মুখ নীচু ক'রে হাসি চাপল। তারপর বলল: টাকা আমার অনেক; কিন্তু চেক্ বই বাবার কাছে। কেন,—তোমার টাকা কী হ'লো?

সত্যব্রত বলল: আমার এখন টাকা কোথায়? প্রকাশক পত্রিকাওয়ালা সকলেই এখন পূজোর হিড়িকে ব্যস্ত। নাঃ সকালে উঠেই দেখছি ধার করতে বেরুতে হবে।

করুণা বলল: ধার করতে হবে কেন; বাবার কাছে গেলেই তো হয়?

—তোর বাবার কাছে যাবো আমি? সত্যব্রত সবিস্ময়ে বলল: তুই আমাকে বলতে পারলি এই কথা?

—কেন, দোষ কী?

সত্যব্রত মিনিটখানেক নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। তারপর বলল: কী আর বলবো তোকে বল! শাস্ত্রে বলেছে: তোরা কাদার ঢেলা—মন বলে তোদের কোন পদার্থই নেই—দেবতারাও জানেনা তোরা আসলে কী!

করুণা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল: তার মানে?

সত্যব্রত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলল: তোর বাবার যে অনেক টাকা সে কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু তুই কি করে ভুলে গেলি—তাঁর টাকার গরমের জন্যেই আজ আমার এই সর্ব্বনাশ? তিনি যদি সেদিন আমার বাবাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার যৌতুক না দেখাতেন, তাহ'লে তুই আজ আমার হতিস্, সে খেয়াল আছে?

কোথা থেকে কী কথা এসে পড়ল।—করুণা বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল সাহেবের শিয়রে। কিন্তু সত্যব্রত থামল না, বলে চলল : তোর বাবা সেদিন আমার বাবাকে টাকা দেখিয়ে অপমান করেছিলেন, তার কারণ ছিল। তিনি ভুলতে পারেননি তাঁর অতীতের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা। তাই, জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, আমার বাবাকে দুঃখ দিয়ে ফেলেছিলেন তিনি! কিন্তু তুই? তুই নিঃশেষে ভুলে গেছিস সব। ভুলতে পেরেছিস বলেই তো হাসিমুখে দিন গুনছিস্ আর একজনের ফিরে আসার। দু'দিন পরে পরস্ত্রী হ'য়ে যাবি তুই—ভুলেও একবার মনে পড়বেনা আমার কথা। কিন্তু, তবুও কেন তোর এত রাগ আমার ওপর, যে, এইভাবে আমাকে অপমান করছিস? আমি গিয়ে হাত পাত্‌বো তোর বাবার কাছে? আমাকে এমনি অপদার্থ অমানুষ ঠাওরালি তুই?

—জল। শ্লেষ্মাজড়িত ঘড়ঘড়ে গলায় জল চেয়ে সাহেব করুণার একটা হাত মুঠো ক'রে ধরলেন।

করুণা মুস্কিলে পড়ল!—সত্যব্রতর ওপর খুব রাগ হচ্ছিল তার; কিন্তু তাকেই আবার ইসারা করতে হ'লো জল আনবার জন্যে।

সাহেবকে জল খাইয়ে দিয়ে সত্যব্রত আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ্ কেটে গেল। তারপর করুণা আর একবার উঠল জ্বর দেখবার জন্যে! কাছে আসতেই সত্যব্রত চাপা গলায় বলল : এমন গা জ্বালানে কথা তুললি তুই, যে, আঙ্কল-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল—

করুণাও ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে জবাব দিল: কথা আমি কিছুই বলিনি।

—তুই তো বললি—বাবার কাছে যাও—

—হ্যাঁ। অপরের কাছে ধার করার চাইতে, তাঁর কাছে গিয়ে পাওনা টাকা চেয়ে নিতে বলেছিলাম আমি!...আমার অপরাধ হয়েছিল—

—আমার পাওনা টাকা? —সত্যব্রত আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: কিসের পাওনা? উত্তর দেনা?

সত্যব্রতর উত্তেজনা দেখে করুণা অগত্যা বলল: চেঁচিও না! তখন শুনলে তো সব কথা বিনুদার কাছে!

—কী কথা? আমি মরে গিয়েছিলাম?

করুণা ইতস্ততঃ করে বলল: হ্যাঁ।

সত্যব্রত তবুও কিছু বুঝতে পারলনা। শেষে সন্দিগ্ধ হ'য়ে বলল: তুই কি আমার মাসোহারার কথা বলছিস নাকি?

—হ্যাঁ। সে টাকা তো আজ পাঁচ বছর ধরে জমা হ'চ্ছে।

—কী সর্ব্বনাশ! সে টাকা যে আমি রাঙাবৌয়ের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিলাম।

—জানি। কিন্তু, আইনে বেধে ছিল। তোমার অন্যান্য সরিক্‌রা বাবাকে আইন দেখিয়েছিল—তোমার অবর্ত্তমানে ওয়ারীসন্‌ তারা, রাঙাবৌ নয়। তাই, বাবাও তাদেরকে আদালত দেখিয়ে দিয়ে তোমার বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এত বড় একটা খবর এতদিন কেউ জানায়নি তাকে। সত্যব্রত

মিনিট খানেক ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল; তারপর বলল: কিন্তু, আসল খবরটা তো বেশীদিন চাপা থাকেনি! তবুও, কেন তিনি রাঙাবৌকে উপোষ করিয়ে মারলেন?

করুণা বলল: সে সম্ভাবনা থাকলে, বাবা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতেন। ইতিমধ্যে স্বব্রতবাবু এসে রাঙাবৌয়ের ভার নিয়েছিলেন।

—বেশ, আমি ফিরে আসবার পরও টাকাটা আমাকে দেওয়া হ'লো না কেন, শুনি?

—গোটাকতক official formalityর জন্যে। তোমাকে officially ডাকা হয়েছিল; কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করোনি।

অর্থাৎ সেই চিঠি!—কালোবাজারী হৃদয়গোপালের কারবারী চালের কথা ভেবে সত্যব্রতর ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে যাচ্ছিল; অথচ, এই কার্য্যবিধির বৈধতার বিপক্ষে কোন যুক্তিও মাথায় আসছিল না তার। শেষে বে-সামাল হ'য়ে সে রেগে উঠল করুণার ওপর। এ কী মারাত্মক পিতৃভক্তি মেয়েটার। কিছুতেই দোষ দেখবে না বাপের···

সত্যব্রতর মুখের অবস্থা দেখে করুণা কী বুঝল, সেই জানে; হঠাৎ ফিক্ ক'রে একটু হেসে বলল: আখেরে তোমারই তো মজা হ'লো! আচমকা অতগুলো টাকা পেয়ে যাবে,—আবার মজা ক'রে লীডার-ই ক'রতে পারবে—

বটে! সত্যব্রত উত্তেজিতভাবে বলতে গেল—

কিন্তু, তার পূর্ব্বেই কথা ক'য়ে উঠ্লেন লায়ন সাহেব: কে ওখানে? সতু···করুণা?

সত্যব্রত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাহেবের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বলল: এখন কেমন বোধ করছো আঙ্কল?

সাহেব আরক্ত চোখে এদিকে ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন: ওঃ তাই,...সতু এ্যাণ্ড করুণা... কিন্তু, তোরা যদি আমার ছেলে-মেয়ে হতিস্, তাহলে কী মজাটাই না হতো......

—আমরা তো তোমারই আঙ্কল!—সত্যব্রত কথাটা শেষ করবার পূর্ব্বেই আঙ্কল চোখ বুজলেন; তখন, সে করুণার একটা হাত মুঠো ক'রে ধরে বলল:

বলা কিন্তু হ'লনা, বাইরে মোটর গর্জ্জে উঠল। পরক্ষণেই অজয়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকল নীরু। করুণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

রোগীকে আর একবার পরীক্ষা ক'রে নীরু চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। অজয়ের জিম্মায় পেনিসিলিনের বরফ্ কেস্ পূর্ব্বে থেকেই ছিল; সত্যব্রত খিদ্‌মদ্ খাটতে লাগল; করুণা আঙ্কল-এর মাথার কাছে বসল আইস ব্যাগ নিয়ে।

একটা ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে নীরু বলল: সমস্ত রাত পেনিসিলিন্ চালাতে হ'বে। তোরা কে কখন রাত জাগ্‌বি ঠিক ক'রে ফেল। সকলের এক সঙ্গে জাগবার কোন মানে হয় না। করুণাদেবী বাড়ী যাবেন তো?

করুণা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

সত্যব্রত বলল: না না তুই বাড়ী চলে যা করুণা। নাহলে, ইজারাদার হয়তো চট্‌বে।

করুণা আর মাথা নাড়ারও দরকার মনে করল না।

নীরু তখন সমস্যার সমাধান ক'রে দিল। বলল: তাহলে, আপনি আমাদের জন্যে একটু গরম জলের ব্যবস্থা করুণ,—বড্ড ছুটোছুটি হ'য়েছে।

করুণা চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। তখন অজয় আরম্ভ করল: এদিকে আর এক কাণ্ড হ'য়েছে সতুদা। এইমাত্র শুনে এলাম, কাল সকাল থেকে বাস্ ষ্ট্রাইক্ করবে।

—হঠাৎ?

—সেইটেই তো বোঝা যাচ্ছেনা। অবশ্য পারেসেন্‌টেজ্ আর বোনাস্ নিয়ে, কিছুদিন ধরে ওদের আলোচনা চলছিল সিণ্ডিকেট্-এর সঙ্গে। আজও একটা মিটিং ছিল। কিন্তু সে মিটিং বয়কট্ ক'রে ইউনিয়ান একেবারে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। কাণ্ডটা এবার বোঝ—

—এর আর বোঝাবুঝি কী! সত্যব্রত তাচ্ছিল্যভরে বলল: এত এখনকার দৈনন্দিন ঘটনা—

—উহুঁ—অজয় মাথা নেড়ে বলল: এবারকার ব্যাপারটা বোধহয় অত সোজা নয়। এই পূজোর মরশুমে, ইউনিয়ন সেক্রেটারীটা এত ভরসা পেল কোত্থেকে! আমার তো সন্দেহ হয়—

—আচ্ছা অজয়। নীরু বিরক্ত হ'য়ে বলল: এই সব দলাদলি কাটাকাটির কথা ছাড়া, তোর কি আর কোন কাজ নেই? যা, বরফ ভেঙ্গে ব্যাগে পুরে আন্……

অজয় মাথা চুলকে বেরিয়ে গেল।

পূর্ব্বাপর

হৃদয় গোপাল এলেন রাত এগারটার পর—বিকাশের সঙ্গে।

—কী ব্যাপার? সতু কোত্থেকে এলে? করুণা এখানে কেন? হ'য়েছে কী লায়নের?—এক সঙ্গে অনেক কথা জানতে চাইলেন তিনি।

—ব্যস্ত হ'বেন না! নীরু সাহেবের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলল। শুনে, হৃদয়গোপাল আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন: লায়নের দেখছি দিন বুঝে অসুখ করে। কিন্তু তোমাদের এ কী বুদ্ধি? যখন বুঝতেই পেরেছো রোগটা বেয়াড়া, তখন নার্সিং হোমে পাঠাওনি কেন? সাহেব মানুষ কবে আবার ঘরে শুয়ে চিকিৎসা করায়? সামান্য সর্দ্দি হ'লে যারা নার্সিং হোমে যায়—

—শুনুন, শুনুন! নীরু বাধা দিয়ে বলল: এ অবস্থায় নাড়া-চাড়া করাটা উচিৎ হ'বেনা—

—উচিৎ হ'বেনা তো যা খুসী করো তোমরা। কিন্তু, করুণা এখানে কেন?

—উনি সময় মতো এসে পড়েছিলেন বলেই তো—

—তা হোক—বাধা দিয়ে হৃদয়গোপাল বললেন: তোমার এখানে আসা অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে! এক্ষুনি বাড়ী চলে যাও বিকাশের সঙ্গে।

করুণা সন্ত্রস্তভাবে বলল: আমি আজ থাকি না আঙ্কল-এর কাছে—

—অবাধ্য হয়ো না!—হৃদয়গোপাল দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন!

করুণা মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল; হঠাৎ মুখ তুলে একবার সত্যব্রতর দিকে তাকাল—তারপর সোজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—একটু দাঁড়া! বিকাশের উদ্দেশে একটা হাঁক দিয়ে হৃদয়গোপাল নীরুকে বললেন: আমারও একটু ঘুমোন দরকার, বড্ড খাটুনী যাচ্ছে।

অবশ্য, নার্স-এর জন্যে আমি এক্ষুনি ফোন ক'রে দিচ্ছি হাওড়ায়, তোমাদের আর কিছু দরকার থাকে তো বলো?

—কিছু না, কিছু না। হৃদয়গোপালের ব্যবহারে নীরুর মতো লোকও আত্মদমন করতে পারলনা। বলল: আপনি এখন আসুন তাড়াতাড়ি—

হৃদয়গোপাল চলে যাবার পর অজয় বলল: ব্যাপারটা যেন কী রকম হ'লো! রায়বাহাদুরের মতো লোক—সব দিক বিবেচনা না করে যে কোন কাজ করেনা—হঠাৎ এ রকম নির্লজ্জের মতো ব্যবহার ক'রে গেল! ব্যাপার কী?

নীরু সিরিঞ্জ পরিষ্কার করছিল। বলল: এক্ষেত্রে নির্লজ্জ না হ'য়েই বা উপায় কী! গেরস্থ ঘরের আইবুড়ো মেয়ে,—অগ্রাণের প্রথম লগ্নেই বিয়ে—একটু সামলে চলতে হ'বে বৈকি এ সময়! সতু কী বলিস?

সত্যব্রত গুম্ খেয়ে বসেছিল, কথা কইল না।

অজয় বলল: মেয়ের কথা হ'চ্ছেনা, বাপের কথা বলছি! ওঁর মতো খলিফা লোক ··

এই সময়ে আবার মোটর গর্জ্জে উঠল সদরে।

—এরই মধ্যে নার্স এলো নাকি?—অজয় ছুটে বাইরে গেল।

নার্স নয়, অফিসের বড়বাবু। তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা যা শোনা গেল, তা'তে, সকলেই মনে মনে ধন্যবাদ দিল করুণাকে।

করুণা শুধু নীরুকেই খবর পাঠায়নি; কোলকাতার অফিসেও খবর দিয়েছিল সাহেবের শোফারকে দিয়ে। ফলে, বড়বাবু তক্ষুনি টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন ছোট সাহেবকে হাজারীবাগে। অধিকন্তু, খবর দিয়েছেন

সাহেবের আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে কোলকাতার আশে পাশে। সম্ভবতঃ দু' একজন এক্ষুনি এসে পড়বেন ডাক্তার নিয়ে।

এলেনও একদল ভোরের দিকে বড় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। রুগী দেখে, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান্‌ পড়ে, বড় ডাক্তারের গম্ভীর মুখ উজ্জ্বল হ'লো। নীরুকে বললেন: Strange! আপনি এই নগণ্য জায়গায় পড়ে আছেন কেন? আপনার উচিৎ City Centre-এ গিয়ে বসা!

নীরু বিনয়ে বিগলিত হ'য়ে পড়ল। অতঃপর স্থির হ'লো—আগামী বারো ঘণ্টার জন্যে, নতুনদলের হাতে সাহেবের ভার দিয়ে, নীরুর দল বিশ্রাম নেবে।

বাইশ

রাস্তায় বেরিয়ে সত্যব্রত আবার নতুন ফ্যাঁকড়া বাধাল। বলল : আমাকে গোঁসাইদের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে তোরা বাড়ী যা।

—এখন আবার গঙ্গার ঘাটে কী দরকার পড়ল তোর?

—আজ যে মহালয়া! পিতৃ-তর্পণ করতে হ'বে না?

নীরু বিরক্ত হ'য়ে বলল : তোর কি সবই বিদ্‌ঘুটে? ও সব তো বুড়োদের ভীমরথী! আজকালকার দিনে ও সব কেউ করে নাকি?

সত্যব্রত সংক্ষেপে বলল : গাড়ী দাঁড় করা।

নীরু বলল : পাগলামী করিস নি সতু! সমস্ত রাত জেগেছিস্, পেটেও কিছু পড়েনি ; এর ওপর সকাল বেলায় গঙ্গাস্নান করলে, তোর অবস্থাও লায়নের মতো হ'বে।

—তখন ঝেড়ে চিকিৎসা করিস্। আপাততঃ গাড়ী থামা!

—রাবিস্! —অগত্যা গাড়ী থামাল নীরু। সত্যব্রত নামল। সঙ্গে সঙ্গে অজয়ও নেমে পড়ল।

—তোর আবার কী হলো? নীরু জিজ্ঞাসা করল।

অজয় মাথা চুলকে বলল : কথাটা যখন মনেই করিয়ে দিলে সতুদা, তখন.......

—যত্তো সব গ্যাঁজা! ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে নীরু সবেগে বেরিয়ে গেল।

দু'জনে সর্টকাটে গোঁসাই ঘাটের রাস্তা ধরল। অজয় আরম্ভ করল : সত্যি, আমরা কী হ'য়ে যাচ্ছি বলতো? না হিন্দু, না মোচরমান, না ক্রীশ্চান, না ইহুদী, না পার্শি—আমরা আসলে কী?

—তোর আজ হ'লো কী রে ? —সত্যব্রত হেসে বলল : অন্য রকম কথা কইছিস যে ?

—সত্যি, বলনা এর ওষুধ কী ?

—সাপের বিষ মাথায় চড়ে গেলে, ওষুধ কী করবে ? কিন্তু, তোর ব্যাপারখানাই বা কী ? গত পরশু থেকে তো দেখছি আমার সঙ্গে লেগে রইছিস ; ও দিকে তোর বারোয়ারী ভেস্তে যাবে না তো ?

অজয় বলল : বারোয়ারী রেখে একটা কাজের কথা কও দেখি ! তোমার ট্যাঁকে কিছু আছে ? আমার তো গড়ের মাঠ—

—ঘাবড়াচ্ছিস কেন ! সতু ট্যাঁকে হাত দিয়ে বলল : ন'টাকার ওপর আছে।

কিন্তু, ঘাটে এসে তোড়জোড় করতে গিয়ে আবার নতুন ফ্যাঁকড়া বেরুল। —বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে সকাল থেকে ; আবার সাইকেল-রিকসারও দেখা মিলছে না। গুজব—মওকা বুঝে রিক্স-পুলার এ্যাসোসিয়েসানও সিম্প্যাথেটিক্ ষ্ট্রাইক্ করেছে। অর্থাৎ গঙ্গার ঘাট থেকে মাইলখানেক পথ হেঁটেই বাড়ী ফিরতে হবে,—এদিকে কাপড়-গামছা নেই। এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকলে যদি অসুখ করে ?

—তা'হলে তর্পণ করিসনি।

—ড্যাম ইট ! অজয় বলল : মনে ভক্তি থাকলে ওসব স্রেফ্ হাওয়া হয়ে যাবে। বুঝলে কিনা—

ভক্তির ফলটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল। সগর্জ্জনে নীরুর গাড়ী এসে থামল ঘাটের ওধারে।

—একি, তুমি আবার ?

—যত্তো সব রাবিস!—বগলদাবায় তিন জোড়া কাপড়-গামছা নিয়ে ব্যাজার মুখে এগিয়ে আসছিল নীরু: এমন সব খুঁতখুঁতুনি ধরিয়ে দেয় মনে—

তর্পণ সেরে বাড়ী ফিরতে বেলা প্রায় ন'টা হলো সত্যব্রতর। কথা রইল, ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিয়ে, আবার সকলে যাবে লায়ন সাহেবের বাঙলোয়। নীরুই তুলে নিয়ে যাবে সকলকে।

অন্দরে ঢুকে প্রথমেই দেখা হলো সুব্রতর সঙ্গে। সত্যব্রত বলল: তুই তো আচ্ছা লোক রে! ইজারাদার যে আমার বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে, সে কথা বলিস নি এতদিন?

জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে সুব্রত বলল: তোমার ব্যাপার কী? কোথায় ছিলে সারা রাত?

—আঙ্কল লায়নের বড় অসুখ রে!—সমস্ত ঘটনা খুলে বলে সত্যব্রত বলল: এর জন্যে আমিই দায়ী প্রত্যক্ষভাবে।

—তাহলে তো একবার দেখে আসা উচিৎ!

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যে একেবারে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছি! তোদের গিন্নীকে বল, এক্ষুনি আমাকে খেতে দিক্ কিছু।

সুব্রত ভেতরে গিয়ে রাঙা বৌয়ের খোঁজ করল।

দাসী বলল: সেই যে কলঘরে ঢুকেছে, এখনও বেরোয় নি।

সুব্রত গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারল সজোরে। বলল: কী করছো এতক্ষণ ধরে? শীগ্গীর বেরোও। সতু যে রাত্ জেগে উপোষ করে রয়েছে।

দরজা খুলল রাঙাবৌ। তারপর, সোজা নিজের ঘরে ঢুকে আবার খিল বন্ধ করল।

এ কী আরম্ভ করলে রাঙাবৌ! সুব্রত এবার ভয় পেল; কিন্তু সময় নষ্ট না করে আগে সে ব্যবস্থা করল সত্যব্রতর জলযোগের। পাচিকা-পরিচারিকার দল হতভম্ব হয়ে দেখল, যে লোক কখনও এদিক মাড়ায় না, সেই বিলেত-ফেরৎ সেজ রায় ভাঁড়ারে ঢুকে, নিজের হাতে রুটি মাখম্ তৈরী করছে।

কিন্তু খাবারটা পাঠিয়ে দিল সে পাচিকার হাত দিয়েই। সত্যব্রতর সামনে যেতে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অস্বস্তি—রাঙাবৌয়ের জন্য সত্যব্রতর কাছে কৈফিয়ৎ দেবার আশঙ্কা! তার শিক্ষা দীক্ষা, জীবন-দর্শনের অতি আধুনিক যৌক্তিকতা প্রভৃতি সব কিছুই যে সত্যব্রত অপছন্দ করে,—একথা তার অজানা নয়। এ এ নিয়ে অবশ্য দু'জনের মধ্যে কখনও প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা হয়নি, কিন্তু সত্যব্রতর মনের কথা সে ভালো করেই জানে! এতদিন এই জানাটাকে সে অবজ্ঞার হাসি হেসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছিল; কিন্তু আজ যেন তার সত্যাসত্যের উপলব্ধিটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল রাঙা-বৌয়ের কাণ্ড দেখে। ঘুরে ফিরে কেবলই তার মনে পড়ে যাচ্ছিল ত্যব্রতর মুখে শোনা নীরস মন্তব্যগুলো:

যস্মিনদেশে যদাচার! কদাচারকে সদাচার মনে করে বাহাদুরী করাটাই হচ্ছে আমাদের জাতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজকে তাড়িয়েছি আমরা ভারতীয় হিসাবে বেঁচে থাকবার জন্যে নয়,—দাস্য-বৃত্তির পরিবর্ত্তে খাঁটি সাহেব সাজবার আকাঙ্ক্ষায়! আমাদের

স্বাধীনতার সাধনা মনে প্রাণে ইংরেজ সাজবারই সাধনা ! প্রমাণ পাওয়া যাবে দিল্লীর V. I. P.-বৃন্দ থেকে আরম্ভ করে এই নগণ্য গড়বাড়ীর জন-সাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করলে ! সাময়িক পত্র-পত্রিকা সাক্ষী, ভারতীয় সংস্কৃতির জিগীর তু'লে যে ক'জন মহাপ্রভু সব চাইতে বেশী বক্তৃতা করছেন, তাঁদের অধিকাংশই, ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণ স্থাপন করে, ততই বেশী করে প্রমাণ করছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির সরল অর্থ, সাহেবীয়ানার সেঁকো বিষ নির্ব্বিচারে হজম করে ফেলা ! পরাধীন ভারতের সে সব মহীয়সী সব চাইতে বেশী বিষোদ্গার করেছিলেন মিস্ ক্যাথারাইন মেয়োকে মিথ্যাবাদিণী প্রমাণ করবার জন্যে, স্বাধীনতা পাবার পর তাঁদেরই অনেকে, নিজেদের বয়সের কথা ভুলে গিয়ে, এমন সব ইতিহাস সৃষ্টি করছেন, যাতে উত্তরকালের ইতিহাস বলবে : মাদার ইণ্ডিয়ার লেখিকা সত্যবাদিনী তো ছিলেনই অধিকন্তু ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা !···রাঙাবৌ জহরকে চায় তার পথের সঙ্গী হিসাবে,—বৈধ স্বামীরূপে নয় ! যুক্তিতর্কের কোনরকম বাধাবিঘ্নই সহ্য করতে রাজী নয় সে। সে সবজান্তা সাবালিকা ! ওদিকে জহরটাও রাঙাবৌয়ের রূপের আগুনে আধমরা হ'য়ে আছে,—অবস্থা বিপর্য্যয়ে নিঃশেষে পুড়ে মরাও অসম্ভব নয় তার পক্ষে। সে নিজেও পুড়বে, মেয়েটাকেও পোড়াবে। অথচ এতবড় অঘটনের কার্য্য কারণ সম্পর্কটা কতই না তুচ্ছ। কিন্তু—

সত্যব্রত যদি তাকে বলে : এ সবের জন্য দায়ী একমাত্র তুমি। তুমিই রাঙাবৌকে স্বাধীনতার নামে শিখিয়েছ স্বেচ্ছাচার। তাকে স্বাবলম্বী করার অজুহাতে প্ররোচিত করেছো কুলত্যাগ করতে।

দুদিনের জন্যে পৈত্রিক ভিটেতে বাস করতে এসে, তুমিই কলঙ্কিত করে গেলে পিতৃবংশের সুনাম।—তখন কী উত্তর দেবে সে। একটা অসহায় মেয়ের উপকার করতে গিয়ে, এ কী বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চলেছে সে।....ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই পালানো যায়না এখান থেকে?

কিন্তু ভাগ্যক্রমে ব্যাপারটা নজরেই পড়লনা সত্যব্রতর। সে অন্যমনস্ক ছিল আঙ্কল-এর চিন্তায়! বেলা একটা বেজে যাওয়ার পরও নীরুকে আসতে না দেখে, সে একলাই বেরিয়ে পড়ল!

ধর্ম্মঘটের কথাটা খেয়াল ছিল না সত্যব্রতর, মনে পড়ল বাস-ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে। অতদূর যাবে কী করে সে! হেঁটে? না,—বাড়ী ফিরে গিয়ে সুব্রতকে গাড়ী বার করবার জন্যে অনুরোধ করবে।

—নমস্তে মালিক! একদল বিহারী উল্টোদিক থেকে আসছিল; তাদের মধ্যে থেকে বিরিজলাল এগিয়ে এসে সত্যব্রতকে নমস্কার করল।

সত্যব্রত বলল: কী হে, এই পূজার মরশুমেই তোমরা ধর্ম্মঘট করে বসলে?

—কী করবো মালিক! এ সময়ে গাড়ী চালু রাখলে তিন-চারগুণ কামাই হতো। কিন্তু ইউনিয়নের হুকুম—

—কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে আছে বলেই তো ইউনিয়ান এই হুকুম জারী করেছে।

—এই বাৎ ঠিক না বাবুজী। ষ্ট্রাইকের নুটিস পেয়ে কালই আমরা গিয়েছিলাম রম্মণদাস বাবুর কাছে। মগর্...

—কালই নোটিস্ পেয়েছিলে তোমরা? সত্যব্রত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: তা, কী বললে রমণদাস?

—তিনি এ ষ্ট্রাইকে নারাজ। মগর্ ইউনিয়ান প্রেসিডেণ্ট পরশান্ত বাবু ইস্তাহার ছেড়েছে। এই দেখুন না—

বিরিজলাল তার গামছার ভেতর থেকে এক গাদা ইস্তাহার বার করে, দু'খানা সত্যব্রতর হাতে দিল। হিন্দি ও বাংলায় ছাপানো দু' রকমের ইস্তাহার। মর্ম্মার্থ হচ্ছে:

কমরেড্গণ,

বাস-শ্রমিকদের এই ধর্ম্মঘট সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বিধান-সম্মত। দীর্ঘকাল যাবৎ আবেদন নিবেদন করেও বাস-শ্রমিকেরা যখন তাদের দাবী-দাওয়া আদায় করতে পারল না মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে এবং যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারল, মালিকশ্রেণী শুধু কালহরণ করতে চান্ বিচার-বিবেচনার অজুহাতে, তখনই তারা শেষ উপায় হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হ'য়েছে! ইত্যাদি ইত্যাদি···

ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ্

—বাঃ বেশ!—ইস্তাহার দু'খানা পকেটস্থ করে সত্যব্রত বলল: তা, তোমরা এখন কি করবে?

—রামজী জানে! কান্হাই মিস্তির তো বলেছে, দুগ্গা মাঈকী মরশুম একদম বরবাদ যাবেনা। পরশান্তবাবু খুদ পকিট-সে কুছ্ খয়রাৎ করবেন। মগর, ও তো ভিখ্ আছে। হাম্লোগ লিবো কেন? এখন, ওহি বাৎ জানাতে যাচ্ছি।

—বেশ বেশ! সত্যব্রত রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। গতরাত্রে

সে অজয়ের মুখে শুনেছিল, মীটিং বয়কট করে বাস ইউনিয়ন ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আজ সকাল থেকে। কিন্তু তাই যদি হয়,—রিক্‌স্‌পুলাররা আগে থেকেই সিম্প্যাথেটিক ষ্ট্রাইকের ইস্তাহার পায় কী করে? ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হ'চ্ছে—

কিন্তু আপাততঃ ও পাড়ায় যাবার উপায় কী! নীরুর পাত্তা নেই। এদিকে যানবাহন সব বন্ধ।—বাড়ী ফিরে গিয়ে সুব্রতর গাড়ীটা চাইবে নাকি?—ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। অতি প্রয়োজনেও, আজ পর্য্যন্ত সে সুব্রতর গাড়ী চড়েনি! অথচ, আঙ্কল-এর অবস্থাটাও জানা দরকার!

হঠাৎ যেন এক টা মোটর গর্জ্জনের আওয়াজ শোনা যায়। সত্যব্রত আশান্বিত হ'য়ে পিছনে তাকায়—এতক্ষণে মনে পড়েছে নীরুর—

নীরু নয় বিকাশ! সত্যব্রতকে দেখে সে গাড়ীর মেশিন বন্ধ করল; কিন্তু নামল না। সহাস্যে বলল: কদ্দুর চলেছো?

সত্যব্রত ব্যস্ত হ'য়ে বলল: মহামুস্কিলে পড়েছি। এদিকে সব বন্ধ, ওদিকে নীরুর পাত্তা নেই। আমাকে কোন রকমে লায়নের বাঙ্গলোয় পৌছে দিতে পারিস?

বিকাশ একটু ভাবল; তারপর বলল: এসো—

পাশে বসে সত্যব্রত বলল: তুই কোথায় যাচ্ছিলি?

—নেমন্তন্ন করতে।

—কিসের নেমন্তন্ন?

—আজ রাত্রে করুণার হাফ্-আশীর্ব্বাদ।

—কই, আমাকে তো নেমন্তন্ন করলি না?

—তোমার কথা বোধহয় ভুলে গেছেন মামা!

—ভুলে যাবার নিশ্চয় কোন কারণ আছে?

—জাহাজের খবর গাধা-বোটের জানা উচিত নয়।

সত্যব্রত মিনিটখানেক কী যেন ভাবল। তারপর বলল: বিকাশ চন্দর তোমাকে যে ভাই খানিকটা ঘুরে যেতে হবে! গোঁসাইপাড়া থেকে অজয়টাকে সঙ্গে নিতে হবে—

বিকাশ সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ব্রেক্ কষল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল: এ অনুরোধ তুমি আমাকে নিশ্চয়ই করতে পার না সতুদা। আমি বেরিয়েছি মামার গাড়ী নিয়ে মামারই কাজে; মাঝপথে, তোমার উপকার করেছি, তার সাক্ষী থাকা উচিত নয়!

সত্যব্রত একটু হেসে বলল: সময় বিশেষে সাক্ষী-সাবুদ থাকা না থাকা দুইই সমান হ'য়ে যায়। কৈফিয়ৎ চাইলে বলিস— সত্যব্রত রায় রাস্তার মাঝখানে গুণ্ডামী করেছিল। এখন যা বলছি, শোন!

বিকাশ মিনিটখানেক সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার-পর গীয়ার টেনে বলল: তোমার উৎকণ্ঠাটা যে শুধু আঙ্কল-এর জন্যে, তা তো মনে হ'চ্ছে না। এরই মধ্যে অজয়টার মাথা খেলে কী করে?

—মাথা খেলুম মানে?

—মানে, রাতারাতি বদলে গেল তার—মতটা! গত পরশুদিন পর্য্যন্ত এ পাড়ার বারোয়ারীর মোড়ল ছিল সে। আজ সকালে শুনলুম ultimatum দিয়েছে সেক্রেটারীকে—ইচ্ছে মতো নিরঞ্জন চলবে না; বাইরের লোক দিয়ে চাঁদার পরিমাণ অডিট করাতে হবে; বিসর্জ্জনের

প্রসেশানে ইনক্লাব চলবে না।—এই ধরণের যত সব বেয়াড়া আবদার।
সেক্রেটারী রাজী হতে পারেনি; সঙ্গে সঙ্গে অজয়ও সদলবলে
রিজাইন্ করে পূজো লাটে তুলে দিয়েছে! ···লোকে বলছে: অজয়
কিস্যু নয়, আসল পালের-গোদা নাকি তুমি! ব্যাপারটা কী খুলেই
বলো না?

—খুলবো আমার কী! এ সবের কিস্যু জানিনা আমি।

গাড়ী এসে যথাস্থানে থামল। অজয় সম্ভবতঃ নারুর জন্যই ঘর-
বার করছিল; ওদের দেখেই ছুটে এল।

সত্যব্রত বলল: তোর এখন আমার সঙ্গে গেলে চলবেনা অজয়!
এদিক্‌কার একটু কাজ সেরে ফেলতে হ'বে—

—কী কাজ?

সত্যব্রত পকেট থেকে ইস্তাহার দুখানা বার ক'রে, অজয়কে তার
কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিল: কাগজ ছেপেছে ষ্টেশন রোডের আজাদ-হিন্দ
প্রেস। প্রেসে গিয়ে জানতে হবে, অর্ডারটা তারা পেয়েছিল কার কাছ
থেকে, কবে এবং কখন। একলা গেলে হ'বে না, দল নিয়ে যেতে হবে।
সম্ভব হলে, ইস্তাহারের পাণ্ডুলিপিটাও খুঁজে বার করতে হবে। দেখতে
হবে, হাতের লেখাটা কার—

—অতদূর যাবার দরকার কী? বিকাশ ফুট্ কাটল: খোদ
প্রশান্তকে চেপে ধরলেই তো হয়।

সত্যব্রত বলল: প্রশান্তকে বাগানো যাবে কী!

—যাওয়াই তো স্বাভাবিক! বাক্য-বাগীশ বীর পুরুষরা প্যাদায়
পড়লে, অনেক সময়েই বীরত্ব ঠিক্ রাখতে পারে না।

—Exactly—অজয় বলল : morally ওরা বড্ড কাওয়ার্ড হয়।

সত্যব্রত বলল : বেশ তো, প্রশান্তর দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয় ভালই; না হলে প্রেস raid করতে হবে। মোদ্দা কথাটা হ'চ্ছে এই যে, ব্যাপারটা pre-arranged.—এই রায়টের হিড়িকে, হয়তো. কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বেরিয়ে যেতে পারে।—বুঝতে পারছিস, আমি কী বলতে চাই?

—বুঝিছি বৈকি!

—কিন্তু. এ সব করবি কী করে? পাড়ায় সাইকেল আছে কটা?

—ওসব কিছু ভেবনা তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে। সাইকেল তো আছেই,—অবনীদের জীপ্‌টাও জোগাড়্‌ করছি আমি।

—কিন্তু, টাকাকড়ি আজ আমি কিছু দিতে পারব না।—সত্যব্রত বলল : আমি এখন যাচ্ছি আঙ্কলকে দেখতে। সেখান থেকে সটান চলে যাবো হলুদপুর। ইজারাদার আমার পাঁচ বছরের মাসোহারা বন্ধ করে রেখেছে। সেটার হেস্ত-নেস্ত আজই হবে বলে মনে হয় না—

—আচ্ছা সে ব্যবস্থাও আমি করছি! সত্যব্রতকে আশ্বস্ত ক'রে অজয় বলল : তুমি এগোও—

বিকাশ গাড়ী ছাড়ল।

নীরু আঙ্কল-এর ওখানেই ছিল; সত্যব্রতকে দেখে বলল : তোদের তখন আর খবর দেওয়ার সময় পেলাম না। বারোটার

সময়ে এরা খবর পাঠালে, ছোট সাহেব এসে পৌঁছেছেন, ডাক্তার সেন-গুপ্তও আসছেন……

—আঙ্কল-এর অবস্থা তা'হলে…?

—এক্ষুনি অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন তুই! যুদ্ধের কল্যাণে মানুষ বাঁচাবার অনেক ওষুধ পেয়ে গেছি আমরা। এরই মধ্যে অত নিরাশ হচ্ছিস্ কেন!

রুগী দেখে সত্যব্রত তেমন কিছু বুঝতে পারল না। ভরসা, একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের উপস্থিতি!

বাইরে এসে নীরু বলল: অমাবস্যা না পড়া পর্য্যন্ত রুগীর কোন ভয় নেই। আমি বরং এই ফাঁকে ওদিক্‌কার formality গুলো সেরে আসি—

—কিসের formality?

—রায়বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধ, হলুদপুরের মীটিংএ আমাকে উপস্থিত থাকিতেই হবে—

—ভালই হলো; আমাকেও যেতে হবে সেখানে— চল্—

তেইশ

হলুদপুর জায়গাটা সহর থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক পশ্চিমে,—পরগণা রাণীক্ষেতের অন্তর্গত তেঁতুলবেড়ে মৌজার একটা অতি নগণ্য গ্রাম। জমীদারীটা রায়বংশেরই। তাই, সত্যব্রত কল্পনা করবার চেষ্টা করতে লাগল,—উদ্বাস্তুদের আবির্ভাবে, অতি নগণ্য সেই হলুদ-পুরের রূপান্তরটা কেমন হতে পারে!

রূপান্তরের কিছু কিছু ইতিমধ্যেই চোখে পড়তে আরম্ভ করেছিল। সহরের ঘন বসতি ছাড়িয়ে গাড়ী যত এগোচ্ছিল সহরতলীর দিকে, ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল পরিবর্ত্তনটা! রাজপথকে কেন্দ্র ক'রে এ অঞ্চলে যেখানে যত বাসোপযোগী আস্তানা আছে কোথাও যেন তিল-ধারণেরও স্থান নেই! মাড়োয়ারীদের পাটের গুদামগুলো আজ যেন প্রাসাদের মর্য্যাদা পেয়েছে বিত্তশালী উদ্বাস্তুদের কাছে। মধ্যবিত্তরা নিশ্চিন্ত হয়েছে এমন জায়গার সন্ধান পেয়ে, পূর্ব্বে যেখানে কুকুর-বেড়ালও মাথা গুঁজতে নারাজ হতো।......গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দেয় সত্যব্রতের কল্পনা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দরিদ্র চাষাভুষোদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুঁড়েগুলো; তাদের অতীব সঙ্কীর্ণ গোশালা; অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন উঠান-অলিন্দ ঢেঁকিশালা! সম্ভবতঃ, পূর্ব্ববঙ্গীয় পলাতকদের দৃষ্টি থেকে সেগুলোও বাদ পড়েনি। হয়তো, কুঁড়ে সংলগ্ন আঁস্তাকুড়ের খানায় রান্না চাপিয়েছে কোন প্রাচীন জমিদার বংশের কুলবধূ! চাষীদের ঘরে ধান সেদ্ধ করবার জন্য যা দু'চারটে বড় বড় খোলা আছে, তার মধ্যে হয়ত কুঁকড়ে শুয়ে

নিদ্রা যাচ্ছে এমন সব শিশু,—যাদের বংশ পরিচয় জানতে গেলে বেরিয়ে পড়বে দু'চারজন রাজা মহারাজার নাম! কিন্তু—

এ বিড়ম্বনার কি শেষ নেই? একই জাতীর জীবনে কেন বার বার দেখা দেয় একই ধরণের উন্মত্ততা? হয় হত্যা, না হয় আত্মহত্যা —এ ছাড়া কি এ জাতের আর কোন ইতিহাস রচিত হবেনা?— আশাবাদী সত্যব্রত স্বপ্ন দেখতে চায় মহিমান্বিত ভবিষ্যতের; কিন্তু পারে না। বাধা দেয় পুনরুক্তির ইতিহাস—

বর্ত্তমানের মতো সেদিনও প্রত্যক্ষ করেছিল সে মৃত্যুর রূপ—কঙ্কালের শোভাযাত্রা—গলিত শবের বিরাট প্রদর্শনী। আজকেকার মতো সেদিনকার হত্যাকাণ্ডেরও মূল কারণ ছিল: একের বিলাশের জন্য বহুর বিনাশ! তবুও, পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষর সঙ্গে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কিছু তফাৎ আছে বৈকি!

দল-বিশেষের রাজনীতি সেদিনও যেমন দেশবাসীকে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করেছিল, আজও তেমনি করেছে; শুধু তফাৎ এই যে, সেদিন যারা মেতে উঠেছিল আত্মহত্যার নেশায়, আজ তারা ক্ষেপে উঠেছে স্বজন-হত্যার বিভৎসতায়!—সমগ্র পৃথিবী সকৌতুকে প্রত্যক্ষ করছে,—প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলাফল—অহিংসাপন্থী ভারতীয়দের সার্দ্ধ শতাব্দীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণাম!—আশ্চর্য্য! এই অহিংসার আদর্শ নিষ্ঠাকে কেউ যে কোনদিন স্বজাতী-নিধন-যজ্ঞের প্রধান অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাবে,—এমন ভয়ঙ্কর আশঙ্কা কে কবে করতে পেরেছিল!

পেরেছিলেন কয়েকজনের অতি-মানব—যাঁদের প্রতি অতি-ভক্তি

বশতই বিশেষ এক শ্রেণীর গণদেবতা আজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে! জেগে উঠেই প্রমাণ করেছে—পঞ্চাশ সনের ব্যাপারটা নিতান্তই একটা দুঃস্বপ্ন—এবং নিছক বাস্তব হ'চ্ছে, তাদের ধর্ম্ম আজ বিপন্ন ও অস্তিত্ব-লুপ্তি আসন্নপ্রায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম ব্যতীত, তাদের ধর্ম্মীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় একতা রক্ষা করা অসম্ভব। ফলে—

ঘোষিত হ'লো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তৈরী হ'লো দ্বিজাতী-তত্ত্বের নতুন নজীর! ভাইয়ের বুকের কালো রক্ত দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হলো ধর্ম্মের নাম!—এ ধর্ম্মের চেহারাও আলাদা। বিগত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নানা সাহেবের প্রধান সহকারী আজিমুল্লার যে ধর্ম্ম ছিল—এ ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম নয়। যে ধর্ম্মধ্বজীদের উদ্দেশে ক্যাপ্টেন রবার্টস্ সেদিন হুঙ্কার ছেড়েছিলেন: পাজী…দের বুঝিয়ে দাও আমরাই ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতা—বর্ত্তমানের সংগ্রামীরা সে ধর্ম্মেরও ধারে না কোন্ ধার্! এরা নিতান্তই নতুন দেশের নতুন জাতীর নবারুণ!…তাই, নতুন পিতৃভূমির প্রলোভনে পিতামহদের মৎলব নিষ্ঠার ইতিহাসটা এরা নিঃশেষে বিস্মৃত; বিস্মৃতির-সাগর মন্থণ ক'রে উপভোগ করছে এরা সন্ত-শোনা ঐতিহ্যের অমৃত—সন্ত-দত্তক প্রাপ্ত পিতৃদেবদের শ্রীমুখ থেকে!…পিতৃ-আজ্ঞার আদর্শ রক্ষার জন্যই এই নতুন সন্তানরা আজ সহিংস্র সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলেছে, যেমন, স্বার্থক করে তুলে-ছিল কয়েক বছর পূর্ব্বে,—উক্ত পিতৃদেবদেরই সৃষ্ট এক মহামন্বন্তরকে কিন্তু, ততঃ কিম?

—এসে পড়েছি!—নীরু বলল।

পূর্ব্বাপর

কলোনীতে পৌঁছে সত্যব্রতর প্রথমেই নজর পড়ল একটা মোটর প্রদর্শনীর ওপর। নীরু বুঝিয়ে দিল—প্রদর্শনী নয়, ওঁরা সব কোলকাতা থেকে মীটিং করতে এসেছেন।

সত্যব্রতও ঘুরে ফিরে দেখল, ব্যবস্থাটা বেশ বিরাটই বটে! মাঝারী সাইজের একখানা টিনের ঘর তৈরি হবে; তারই ভিত্তি স্থাপনের জন্য এসেছেন দু'জন মাননীয় মন্ত্রী, তিরিশ চল্লিশ জন সঙ্গী পরিবৃত হয়ে। মন্ত্রীদের একজন করবেন ভিত্তি স্থাপন ও মীটিংএর প্রেসিডেন্টগিরি; অপরজন অলঙ্কৃত করবেন প্রধান অতিথির আসন। ভিত্তি স্থাপনের জায়গাটাকে কেন্দ্র ক'রে চক্রাকারে সাজানো হয়েছে, প্রায় তিন-চারশ' দর্শকের উপযুক্ত প্লাইউডের চেয়ার। ওধারে, একটা ঝালর দেওয়া বাহারে তাঁবুর তলায় বক্তাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে প্ল্যাটফরম পেতে। তার ওপরে, মাইক শোভিত লাল শালু ঢাকা এক বিরাট টেবিল। টেবিলের তিনধারে লাল মখমল মোড়া মূল্যবান আসনে বসে আছেন যথাক্রমে, সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বাস্তুদের প্রেসিডেন্ট হৃদয়গোপাল, তস্য ভাইস্ ভগবানদাস আগরওয়াল, সম্পাদক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁর সহকারী দেবনাথ ভৌমিক, নেতাজী পাঠ-শালার প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রাণ-স্বরূপা কুমারী করুণা মজুমদার ও নিখুঁত সাহেবী পোষাকে সজ্জিত আর একজন সুদর্শন প্রৌঢ়। নীরু পরিচয় করিয়ে দিল ফিস্ ফিস্ করে: উনি হচ্ছেন করুণা দেবীর হবু শ্বশুর হীরক চৌধুরী।

মীটিং ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শেষ বক্তা হিসাবে সভাপতি মহাশয় তখন মহাত্মাজীর বাণী কোট্ ক'রে হিন্দু-মুসলমান

সম্প্রীতির সার্থকতা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সমবেত গণদেবতাকে। ভিড়ও হয়েছিল আশাতিরিক্ত। জনতার অধিকাংশই চেয়ারে স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। নীরুর সঙ্গে সত্যব্রতও ঢুকেছিল পদাতিকদের মধ্যে। কিন্তু বেশীক্ষণ সহ্য করতে না পেরে, প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে পড়ল।

প্যাণ্ডেলের কিছু উত্তরে, একটা আটচালার পাশে নেতাজী পাঠশালার অস্তিত্বও চোখে পড়ল তার। মোটা দড়ি দিয়ে ঘেরা একটা চতুষ্কোণ জায়গার মধ্যে রাখা ছিল, ঘট, কচি কলাগাছ প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মের আনুসঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী। ঘটের পাশেই একটা ছোট গর্ত্ত। তার মধ্যে দেখা গেল, শক্ত গাঁথা একখানা ইটের ওপর মাননীয় মন্ত্রী-মহাশয়ের শুভ-করস্পর্শধন্য একখানা কন্নিক; আর, তার পাশে সাজানো রয়েছে, মানুষ-প্রমাণ উঁচু কয়েক বাণ্ডিল করুগেটেড্ সীট্—প্রস্তাবিত পাঠশালা আর উদ্বাস্তুদের দাদন দেবার মাল।

করুগেটেড সীট্ দেখে সত্যব্রত এগিয়ে গেল। এইগুলোই কি সেইগুলো, বিকাশ তাকে সেদিন যা দেখিয়েছিল?

—সতুদা নাকি? বিকাশ এদিক-ওদিক্ কাজে-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল; কিন্তু সত্যব্রতর মনে হ'ল, সে যেন যথা সময়ে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যই ওৎ পেতে ছিল। বলল: কী খবর রে—

বিকাশ বলল: খবর বড় খারাপ। তোমার বন্ধু, প্রবীরদা মামাকে একেবারে ডুবিয়েছে।

—কী রকম?

—মামা একখানা দৈনিক বার করবার মৎলব করেছেন, জান তো?

তাই প্রবীরদাকে প্রস্তাব করেছিলেন সব ভার নেবার জন্যে,—তাছাড়া আজকের publicity সংক্রান্ত ব্যাপারটাও তার ওপর ছিল। কিন্তু প্রবীরদা ডবল্ এয়ার প্যাসেজ্ ট্যাকস্থ ক'রে কেবল্ করেছে: ছুটি অসম্ভব, তাই আজ আসতে পারলুম না। তা ছাড়া, নতুন কাগজের ব্যাপারেও, আমি ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবর পেছনে ছুট্‌তে রাজি নই। মামার লোকসান্‌টা একবার বোঝো—

শুধু হৃদয়গোপালকেই নয়—খবর শুনে সত্যব্রতও চিন্তিত হয়ে পড়ল—প্রবীর তাকেও ডুবিয়েছে। অতঃপর লেখাগুলো নিয়ে হন্যে কুকুরের মত্তো ছুটে বেড়াতে হ'বে তাকেই—স-নমস্কারী প্রকাশনের জন্যে।

—কেবল্ পেয়ে মামার মুখের অবস্থাটা যা হলো—বিকাশ ব'লে চলল: যদি দেখতে, তোমারও কষ্ট হ'তো—

—না দেখেই কষ্ট হচ্ছে আমার—

—অ্যাঁ—

সত্যব্রত বলল: তোর মামা ভাগ্যবান নিঃসন্দেহ, কিন্তু বুদ্ধিমান বোধ হয় নন। ভদ্রলোক জানেন না, তাঁর সৌভাগ্য যেমন একা আসেনি, তেমনি দুর্ভাগ্যও একা আসবে না। ভগবান তাঁকে সাবধান হবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু তিনি নিতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত অতি লোভে তাঁতী নষ্ট হ'ল।

—কী সব বলছো আবোল-তাবোল ?

—বলছি—সত্যব্রত সামলে নিয়ে বলল: তোমাকে একটি কাজ করতে হ'বে বিকাশচন্দর! করুণার সঙ্গে আমার একবার দেখা করার দরকার। —একটু নির্জ্জন হ'লেই ভাল হয়।

বিকাশ সন্ত্রস্তভাবে একটা ঢোক্ গিলল—তারপর বলল: পাগল হ'লে নাকি? আমি কী ব্যবস্থা করবো!

—বাক্‌তাল্লা ছেড়ে, ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি—সত্যব্রত গম্ভীরভাবে বলল: আমি আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

—আর দেখা ক'রে লাভ কী?

—লাভ?—দাঁতে দাঁত চেপে সত্যব্রত একটা করুগেটেড্ সীটের কোন্ বেঁকিয়ে ফেলল। বলল: সেইটেই আজ শুনতে চাই তার মুখ থেকে।

বিকাশ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলল: কিন্তু, এতে যে আমার বিপদ হ'তে পারে। তুমি নিশ্চয়ই আমার ক্ষতি করতে চাওনা—

—কেন অকারণ ঘাবড়াচ্ছিস!—সত্যব্রত ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলল: আমাকে চিনিস না তুই?

—আচ্ছা, তাহলে, এসো আমার সঙ্গে!

পাশের সেই আটচালাটার মধ্যেই ঢুকল দু'জনে। বিকাশ বলল: এটা হ'চ্ছে নেতাজী পাঠশালার অফিস। মীটিং ভাঙ্গলে, কাগজ-পত্র নেবার জন্যে করুণাকে একবার এখানে আসতেই হ'বে। বুঝেছো, সঙ্গী কেউ থাকলে, আমি আটকাবার চেষ্টা করবো'খন।

—হুঁ।-বলে, সত্যব্রত একটা চেয়ারের উপর চেপে বসল। বিকাশ বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি!

মিনিট দশেক পরেই করুণার সাড়া পাওয়া গেল। সমস্তদিনের পরিশ্রমে মুখ তার শুকিয়ে গিয়েছিল; তার ওপর, ঘরের মধ্যে

সত্যব্রতকে একলা বসে থাকতে দেখে, কালো মুখ তার আরও কালী হ'য়ে গেল।

—তুমি ?—

—একটা কথা জান্‌তে এলাম—

—ওঃ কথা !—করুণা সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানোদ্যত হ'লো ; সত্যব্রতও তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে দরজা আটকাল।

—পথ ছাড়ো লক্ষ্মীটী—হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ল করুণা : বাবা জানতে পারলে বড্ড কষ্ট পাবেন—

—তোর বাবা-ই সব—আমি কেউ নই ?—বাকিটা বলা হলোনা, করুণা ধাক্কা মেরে নিজের পথ পরিষ্কার ক'রে নিল।

সত্যব্রতর মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মিনিটখানেক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর বেরিয়ে এল।

অদূরে হৃদয়গোপাল সদলবলে এগোচ্ছিলেন মোটর প্রদর্শনীর দিকে ; হঠাৎ দেখলেন, ভিড় ঠেলে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে সত্যব্রত। বলে উঠলেন : একি সতু যে ! বড় খুশী হলুম বাবা তোমাকে দেখে। একে বোধ হয় আপনারা চেনেন না ?—

অভ্যাগতদের উদ্দেশে তিনি সোচ্ছ্বাসে সত্যব্রতর গুণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। ব্যাপার দেখে সত্যব্রতও তার মাসোহারা দাবীর কথা ভুলে গেল !

—বাই জোভ্ !—সত্যব্রতর অতীত পরিচয় শুনে, প্রধান অতিথি বললেন : এতদিন ষ্ট্রাগল্ করে, আপনি পলিটিক্‌স্ থেকে সরে দাঁড়ালেন ? কেন বলুন তো ?

সত্যব্রত বিনীতভাবে বলল: দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, আপনারা সব এগিয়ে এসেছেন, আর আমাদের থাক্‌বার দরকার কী!

উত্তরটাকে খোঁচা অনুমান করে প্রধান অতিথি মহাশয় মুখ গম্ভীর করলেন। তখন অপরজন বললেন: কথাটা বোধ হয় ঠিক্ হ'লোনা। আমাদের স্বাধীনতা যেমন এসেছে, তেমনি দেখা দিয়েছে রিফিউজী প্রব্‌লেম্-এর মতো অসংখ্য সমস্যা! এ সময়ে আপনাদের মতো লোকেরই তো দরকার—

—আজ্ঞে না। সত্যব্রত তাড়াতাড়ি বলল: আমরা এলে অনেক অসুবিধে হ'বে আপনাদের। পলিসীতে বন্‌বে না।

—পলিসী? আমাদের পলিসীর মধ্যে খুঁত্ দেখলে, আপনাদেরই তো উচিৎ সংশোধন ক'রে দেওয়া।

—সংশোধন করতে হ'লে—সত্যব্রত তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠল। বলল: আগে তো আমাকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভোটে নেমে জিত্‌তে হবে! তার পরে তো সংশোধন করবো য়্যাসেম্লীতে গিয়ে। কোথায় পাবো অত টাকা? চুরী করতেও যে শিখিনি!

—নাঃ, আপনার সঙ্গে কথা কওয়াও তো দেখছি বিড়ম্বনা!—

—বিড়ম্বনাই বটে!—সত্যব্রত আবার হেসে উঠল। বলল: তা হোক, আপনাকে সামনে যখন পেয়েছি, তখন বিড়ম্বিত একটু করবোই। আসুন আমার সঙ্গে। ভাই সব তোমরাও দেখ বিড়-ম্বনাটা কী—

জনতার উদ্দেশে একটা হুঙ্কার দিয়ে সত্যব্রত ওধারে রাখা করুগে-টেড্ শীটের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল:

আসুন, দেখুন, দেখে বলুন, এই ঠুন্‌কো টিন্ দিয়ে ঘর করলে, সে ঘর ক'দিন টি`কবে! আপনিই অনুমান করুন, আপনাদেরকে এখানে আনবার জন্যে যে টাকা খরচ হ'য়েছে, তার সিকির সিকি দিলে... কত ভাল টিন্ মিলতো!—ভাল টিনের ঘর হ'লে উদ্বাস্তুদের কত উপকার হ'তো...

লোকটা পাগল নাকি! মন্ত্রীমহাশয় একটু ইতস্তত: করে টিন্ পরীক্ষা করলেন; তারপর আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকালেন হৃদয়গোপালের দিকে। বললেন: গবর্ণমেণ্ট কি এই মাল্ পাঠিয়েছিল এখানে? কাগজ-পত্র আছে আপনার কাছে?

হৃদয়গোপাল বললেন: আছে, কিন্তু এখানে তো নেই। তাছাড়া এখন তো scrutiny করা চল্‌তে পারেনা! ও সব পরে হ'বেখ'ন এখন আসুন, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—

কিন্তু অঘটন যা ঘটবার তা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। ব্যাপাটার অভিনবত্বে, জনতা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেই চতুষ্কোনে দড়িটার ওপরে। বেড়া ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিত গুঞ্জনও উঠ্‌ছিল আস্তে আস্তে।

পরিস্থিতির পরিণাম সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয়ের সম্ভবতঃ কিছু পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা ছিল; তাই, তিনি সত্যব্রতর হাতটা বাগিয়ে ধরে এগোবার চেষ্টা করলেন ভিড় ঠেলে। বললেন: এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন, চলুন ওদিকে যাওয়া যাক্—

—আজ্ঞে আমি রবাহূত! সবিনয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যব্রত বলল: যত্রতত্র যাবার হক্ আমার নেই। আপনারা আসুন—

কিন্তু আসুন বললেই আসা যায়না। জনতার রসনা মুখর হ'য়ে উঠ্‌ছিল ক্রমে ক্রমে। ও হালারা, ও দরদী…মৎলব তোমাগোর বুঝবার পারি—

সবান্ধব হৃদয়গোপাল উৎকণ্ঠিতভাবে এধার ওধার তাকালেন। দেখলেন: বিপদ একা আসেনি—

আচ্‌মকা পিছন দিক্‌ থেকে ছুটে এল ফণী সুশীল প্রমুখ জন. চারেক ছেলে। সত্যব্রতকে ঘিরে ফেলে তারা এলোপাথাড়ী হাত পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু বক্তব্য জানাল অপরের কান বাঁচিয়ে: কার্য্য ফতে সতুদা…কম্‌রেড্‌ প্রশান্ত কুপোকাৎ…সব কথা স্বীকার করে সে এখন আমাদের শরণাগত…everything pre-arranged… বাস প্লাস্‌ রিক্‌স ষ্ট্রাইক…রাত্তিরে আসছে বাঙ্গালী প্লাস্‌ বেহারী পুলারদের টেন্‌সন্‌….কালকের মধ্যেই দেখা দেবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম… তারপর as usual শান্তি সম্মেলনের বিরাট programme….অজয়দা বললে, এক্ষুনি তোমাকে যেতে হ'বে জেলা হাকীমের কাছে…আমরা জীপ্‌ এনেছি…

বিভিন্ন কণ্ঠের বিচিত্র কলরবের মধ্যে কে যে কী বলছিল, কিছুই শোনা যাচ্ছিল না; কিন্তু সকলেরই চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল সন্ত্রাস্‌। কেন্দ্রীভূত জনতার মধ্যে দিয়ে কেউ চেষ্টা করছিল অভ্যাগত -দের রাস্তা সাফ্‌ করবার; কেউ সচীৎকারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল অনাগত দুর্ঘটনার কবল থেকে। যেন, বিরাট একটা ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সর্ব্বত্র। এই বিশৃঙ্খ- -লার মাঝে, হঠাৎ দেখা গেল সত্যব্রতকে মধ্যবর্ত্তী ক'রে ছেলের দল জীপস্থ হ'লো। তারপরই, দেখা দিল ব্যাটন্‌ধারী লাল পাগড়ী!

পুলিশ এসেছিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের নিরাপত্তার জন্যে। আড়ালে বসে এতক্ষণ তারা খোস্ গল্পে ব্যস্ত ছিল; পথ দেখিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে এল বিকাশ।

সেইদিনই—

রাত্ প্রায় আট্টার সময়ে অবন-এর জীপ্ এসে থামল লায়ন সাহেবের বাঙ্গলোর সুমুখে। জন পাঁচেকের বসবার উপযুক্ত একটা সাধারণ জীপ্ থেকে আরোহী নামল মাত্র এগার জন!

—করেছিস্ কী?—নীরু বাইরেই ছিল। বলল: অপঘাতে মরবি নাকি? সতু কই?

সত্যব্রত তখনও নামবার অবকাশ পায়নি। অনিদ্রা, উৎকণ্ঠা আর অত্যধিক ছোটাছুটির জন্য বেশ ক্লান্ত বোধ করছিল সে; আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বলল: এদিক'কার খবর কী?

—অক্সিজেন সিলিণ্ডার আনতে পাঠিয়েছি—

—অ্যাঁ—

—ওই তোর বড় দোষ সতু! নীরু ব্যস্ত হ'য়ে বলল: একটুতেই অত ঘাবড়ে যাস্ কেন? অক্সিজেন ব্যবহার করি আমরা রুগীকে রিলিফ্ দেবার জন্যে,—বুঝিছিস?

—বুঝিছি। সত্যব্রত নীরুর সঙ্গে ভেতরে গেল। ছেলের দলও জমে বসল গেটের রোয়াকে।

ওদিকে রুগীর ঘরে ভিড় বেশ বেড়েছিল। বেশীর ভাগই অপরিচিত সাহেব-মেম! সত্যব্রতও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। লক্ষ্য করল: ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে আঙ্কল-এর। পূর্ব্বেকার সেই

নিস্তেজভাব একেবারেই নেই ; ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করবার চেষ্টা করছেন ; হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কী যেন খুঁজছেন বিছানার মধ্যে ; আর শ্লেষ্মা-জড়িত ঘড়ঘড়ে আওয়াজে কী যেন বলছেন মাঝে মাঝে। —নীরু বুঝিয়ে দিল : প্রলাপ বকছেন—য্যান্·· ডারলিং···তোর বুড়ো বাবাকে ক্ষমা ক'রে যা মা···

আঙ্কল আরক্ত চোখে সকলের দিকেই তাকাচ্ছিলেন মধ্যে মধ্যে—দৃষ্টি অর্থহীন। কিন্তু, সত্যব্রত যেন একবার স্পষ্ট দেখল সে দৃষ্টি বারেকের জন্যে নিবদ্ধ হ'লো তারই মুখের ওপর। আঙ্কল যেন তার উদ্দেশে স্পষ্ট বললেন : ওয়েল Why don't you···

সত্যব্রত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। ঘরের বাইরে ছিল চক্রাকার চওড়া করিডর। কিন্তু, যথোচিত আলোর ব্যবস্থা না থাকার জন্যে লোকজনের যাতায়াত ছিলনা সেখানে। তাই, সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।—এইভাবে মুখ লুকোন ছাড়া আর কী করতে পারে সে!···করুণার মতো তার তো আর বাবা নেই! বাবার মনে কষ্ট দেবার অজুহাতে আত্মতুষ্টির উপায় নেই···নেই কোন হৃদয়ের বালাই····

কিন্তু, মেয়েটা কী সত্যিই কাদার ডেলা ?

উদগ্র উৎকণ্ঠায় মিনিটের পর মিনিট্ কেটে যাচ্ছিল ; কিন্তু সত্যব্রত নড়তে পারছিল না। ঊর্দ্ধে, অমানিশার আঁধারেও নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করছিল সে ; কিন্তু মনের আঁধার তার একেবারে যেন নিশ্ছিদ্র!—একটি মাত্রও জোনাকীর স্ফুলিঙ্গ জ্বলছিল না সেখানে।

হঠাৎ লাইটের তীব্রতায়, এতক্ষণ পরে যেন সত্যব্রতর আড়ষ্টতা ঘুচল। সরে এসে দেখল সুব্রত। বলল: এতক্ষণে সময় হ'লো তোর? এদিকে কিন্তু সময় ঘনিয়ে এসেছে!

—তাই নাকি! সুব্রত উৎকণ্ঠিত মুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল: সেই দুপুর থেকে চেষ্টা করছি আসবার জন্যে; কিন্তু রাঙাবৌ ওদিকে এমন কাণ্ড আরম্ভ করেছে যে, তাকে একলা রেখে আসতেও ভয় করছিল—

—কী করছে রাঙাবৌ?

—ব্যাপারটা একটু ইয়ে—সুব্রত ইতস্তত ক'রে বলল: তুমি যদি মেজাজ্ খারাপ না ক'রে একটা পরামর্শ দাও তো ভাল হয়। মেয়েদের এ সব ব্যাপার আমি ঠিক্…

—কিন্তু, ব্যাপারখানা কী?

সুব্রত সব কথাই খুলে বলল।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার!—তবুও বিশ্বাস করতে হবে সত্যব্রতকে!

সত্যব্রতকে বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সুব্রত আবার বলল: পাছে জহর এসে পড়ে, আর তার সঙ্গে বেরিয়ে যায় রাঙাবৌ,—এই ভয়ে এতক্ষণ আমি বাড়ী থেকে বেরুতে ভরসা পাইনি। তার ওপর,—চব্বিশ ঘণ্টার ওপর আবার জলস্পর্শ করেনি। কিন্তু, এভাবে ক'দিন চলতে পারে বলো?

—আমি কী বলবো?—সত্যব্রত উদাসীনভাবে বলল: অনধিকার চর্চ্চা তো আমি করিনা!

—এই কী তোমার রাগ করবার সময়···অদূরে নীরুকে আসতে দেখে সুব্রত থেমে গেল।

—আর কত দেরি?—সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল নীরুকে।

—তুই অত ঘাবড়াস্ কেন বলতো?—নীরু বিরক্ত হ'য়ে বলল: বললুম না অক্সিজেন আন্‌তে পাঠিয়েছি—

—নাঃ ঘাবড়াবো কেন! জিগ্‌গ্যেস করছি. আঙ্কল এখন কী করছে?

—বিপদ বাধিয়েছে ডিলিরিয়ামটা! খালি য়্যান য়্যান ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে আর পালস্ ওদিকে···আমি এখন য়্যান পাই কোথায়?

—য়্যান! য়্যানকে দেখতে চাইছে আঙ্কল?

—হ্যাঁ। কিন্তু · নীরু প্রস্থানোদ্যত হ'য়েও হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। তারপর বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল সত্যব্রতর আপাদ-মস্তক। সবিস্ময়ে বলল: তু যে খাড়া রয়েছিস্? আমাবস্যের কটাল আসছে, তোর তো এখন বিছানায় ফ্ল্যাট্ হ'বার কথা!

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! পূর্ব্বাপর অসুস্থতার কথা স্মরণ ক'রে সত্যব্রত সত্যিই আশ্চর্য্য হয়: মন অবশ্য তার বিচলিত হ'য়েছে, দেহও শ্রান্ত, কিন্তু, পায়ের বেদনার লক্ষণ তো কিছুমাত্রও প্রকাশ পায়নি এখনও! এ আবার কী হ'লো?—সে ব্যস্ত হ'য়ে গেটের দিকে অগ্রসর হ'লো।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল: বাড়ী যাচ্ছো নাকি?

—না, অন্য কাজে যাচ্ছি।

—কিন্তু, ও ব্যাপারটার কী হ'বে?

সত্যব্রত থমকে দাঁড়াল। তারপর চাপা গলায় বলল: আমি সোজা কথা বুঝি, সোজা পথেই চলি, 'যুক্তির নামে বিলিতী বাক্‌তাল্লা ভাল লাগেনা আমার!—কোন হিঁদু ঘরের বৌ কুলত্যাগ করতে চাইলে, তার চুলের মুঠি ধরে চাবুকের ব্যবস্থা করাটাই সমীচীন মনে করি আমি—

—এটা কী একটা কথা হ'লো?

সত্যব্রত আর জবাব দিলনা; এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

গেটের অদূরেই, ছিল প্রকাণ্ড একটা পাকুড় গাছ। জায়গাটা যেমনি অন্ধকার তেমনি নির্জ্জন। সত্যব্রত সেখানে দাঁড়িয়ে আরও মিনিট পাঁচেক চিন্তা করল; তারপর গিয়ে ছেলেদের দলকে বুঝিয়ে দিল তার মৎলব....

আবার একটা মোটর এসে ঢুকল।—অক্সিজেন নয়—বিকাশ। বলল: মামা পাঠালেন আঙ্কল-এর খবর নিতে—

—রাস্তায় রিক্‌স বেরিয়েছে, দেখলি?

—বেরিছে!

—তাহলে,—সত্যব্রত অজয়ের উদ্দেশে বলল: প্রশান্তের মীটিং এতক্ষণে শেষ হ'য়ে গেছে। তাকেও তুলে নিতে হ'বে গাড়ীতে—

—সেটাকে আবার কেন? অজয় বলল।

—প্রশান্তর ডিগ্‌বাজীটা কাজে লাগালে—কাজ হাসিল করা খুব সোজা হ'বে আমাদের পক্ষে—

—এত রাত্রে তোমরা আবার চললে কোথায়?—বিকাশ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল: আবার কী কাজ হাসিলের দরকার পড়ল তোমাদের?

—চলেছি একটা রোমাঞ্চকর কাজে।—অজয় সত্যব্রতর মৎলবটা খুলেই বলল বিকাশকে।

শুনে, বিকাশ যেন একেবারে আঁৎকে উঠল। বলল: এ কাজ তুমি নিশ্চয়ই করতে পারনা সতুদা। এর পরিণাম কী সাংঘাতিক হ'তে পারে, ভেবে দেখেছো?

সত্যব্রত বলল: পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে পরিনাম চিন্তা করবার অবসর নেই।

—তোমার প্রতিপক্ষ বিত্তবান্ ··

—আমার পকেটও নিঃস্ব নয়,—অনেক মূল্যবান ডকুমেণ্ট আছে—

—দোহাই তোমার, একটু ভেবে দেখো সতুদা! বিকাশ অনুনয় ক'রে বলল: লোকে বলবে, সত্যব্রত রায় সুযোগবাদী। সুযোগ নেয়নি, এতদিন দল জোটেনি বলে। সুযোগ পাওয়া মাত্রেই উল্টো কথা, উল্টো কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে! তোমার এত দিনকার সুনাম, sacrifice, প্রতিষ্ঠা, সব নষ্ট হ'য়ে যাবে! ভেবে দেখ—

—ভাববার আর সময় নেই—বলে, সত্যব্রত সদলবলে জীপে উঠে বসল।

আরও আধঘণ্টা পরে—

মাঝপথে প্রশান্তকে তুলে নিয়ে, জীপ্ সটান এসে থামল হৃদয়গোপালের গাড়ী বারান্দার তলায়। তারপর স-সঙ্গী নেমে পড়ে সত্যব্রত বলল: আমার সঙ্গে আসবে শুধু অজয় আর প্রশান্ত। বাকী সকলে এইখানেই থাকবে।

প্রশান্ত মিনমিনে গলায় বলল: আমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি! সত্যব্রত খোঁচা দিয়ে বলল : এখনও চাকরীর ভয় রাখিস নাকি রে গর্দ্দভ?

বাড়ীতে লোকজনের অভাব ছিলনা; কিন্তু যা'রা দু'বেলা এসে মিটিং ক'রে খোদ্ কর্ত্তার সঙ্গে, তাদের মৎলব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! ওরা নির্ব্বিবাদে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল সেই নাচ্ ঘরটায়।

ঘরে ছিলেন সকন্যা হৃদয়গোপাল আর তাঁর হবু-বৈবাহিক হীরক চৌধুরী। ডিনার শেষে, সম্ভবতঃ বিশ্রাম্ভালাপ চলছিল তখন; এমন সময় মূর্ত্তিমান যমদূতের মতো তিন মূর্ত্তি গিয়ে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে।

সত্যব্রতর সঙ্গে প্রশান্ত—তার সঙ্গে আবার ঠোঁটকাটা অজয়কে দেখে হৃদয়গোপাল হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন।

সত্যব্রত সোজা এগিয়ে গিয়ে করুণার কৌচের পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল। বলল : আমার সঙ্গে চল্—আঙ্কল তোকে দেখতে চাইছে—

করুণার কথা কইবার মতো অবস্থা ছিলনা; সে যেন একবার কেঁপে উঠল।

—একি ব্যাপার?—গৃহস্বামীর অবস্থা দেখে, শেষে হীরক চৌধুরীই বললেন; কে এরা? কী চায়?

—আমি সত্যব্রত রায়,—এই বাড়ীর মালিক—আপনার বন্ধুর জমীদার।—হীরক চৌধুরীকে জবাব দিয়েই সত্যব্রত আবার করুণাকে নিয়ে পড়ল :

—ওরে পোড়ারমুখী, বাবা-ভক্তির ঢের সময় পাবি এর পরে—কিন্তু এদিকে যে আর সময় নেই।—বলে, করুণাকে এক হ্যাঁচ্কা টানে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত।

—শেষ—